মর্নিং নুন নাইট

সিডনি সেলডন

সূচিপত্র

সকাল.....2

দুপুর.....68

রাত্রি.....88

চেক অ্যান্ড চেকমেট.....131

সকাল

০১.

দিমিত্রি বলল–মিঃ স্ট্যানফোর্ড আপনি কি বুঝতে পারছেন আমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে?

হ্যাঁ জানি। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরেই ব্যাপারটি তিনি লক্ষ্য করছেন। দুজন পুরুষ এবং একটি মহিলা। অতি সাধারণ পোশাক। ঘরোয়া ধরনের। পর্যটকদের ভীড়ে মিশে যাবার চেষ্টা করছে তারা। কিন্তু সকালের হালকা আলগা ভীড়ে ব্যাপারটা কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর এ জায়গাটা এমনিতেও তেমন কিছু পর্যটকসঙ্কুল নয়। হ্যারী স্ট্যানফোর্ড ওদের সহজেই খেয়াল করতে বা ধরে ফেলতে পেরেছিলেন। কারণটা হয়ত ওদের অতি বেশি রকম ক্যাজুয়াল থাকার আপ্রাণ চেষ্টা। সেটাই নজর কেড়ে নেয়। বড় বেশি রকম ছিল ওদের ওর দিকে না দেখার চেষ্টাটা। অথচ যতবারই তিনি মাথা ঘুরিয়েছেন বা আলতো তাকিয়েছেন, ওদের একজন না একজন কেউ ওঁর দিকেই তাকিয়েছিল। অনুসরণ করার পক্ষে হ্যারী স্ট্যানফোর্ড সহজ শিকার। তার ছয়ফুট উচ্চতার দীর্ঘ চেহারা। মাথা ভরা শুভ্র চুলের ঢেউ। আভিজাত্যময়, এবং প্রায় উদ্ধত দাম্ভিক প্রভুত্ব ব্যাঞ্জক শরীরী ভাষা। সবার নজর কাড়বার পক্ষে যথেষ্ট। এবং এর পরও তার সঙ্গী হিসেবে রয়েছে বিদ্যুত চমকময় এক রক্তকেশী সুন্দরী যুবতী। একটি ব্যাঘ্র সদৃশ জার্মান শেফার্ড এবং দিমিত্রি কামিনস্কি। সাড়ে ছয়ফুট লম্বা, পেশীময়। নাহ, সত্যিই চেষ্টা করলেও হারিয়ে ফেলা সম্ভব নয় এই দলটাকে। স্ট্যানফোর্ড ভাবলেন।

উনি জানে কে ওদের পাঠিয়েছে এবং তিনি আগত প্রায় এক ভয়ঙ্কর বিপদের গন্ধ স্পষ্ট টের পাচ্ছেন। বহুদিন ধরেই, নিজের সপ্তম ইন্দ্রিয়, লোকে যাকে বলে ইনসটিঙ্কট, তার ওপর প্রবল আস্থা তার। এই আঁচ করবার বহু আগে থেকে গন্ধ পাবার বিশেষ ক্ষমতাটিই তাকে সর্বশেষ্ঠ ধনীদের একজন বানিয়েছে। ফোর্বস ম্যাগাজিন তার সম্পত্তির আনুমানিক হিসাব দিয়েছে সত্তর বিলিয়ন ডলার।

ফরচুন-এর মতে এটা নব্বই বিলিয়ন। হ্যারী স্ট্যানফোর্ড জানেন দুটোর কোনটাই সঠিক নয়। তার সম্পত্তির আসল হিসাব অনেক অনেক বেশি। প্রকাশিত হিসাবগুলো হিমশৈলের চুড়োটুকুই শুধু। নিত্য দিনই দি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ব্যারনস, দি ফিনানসিয়াল টাইমস কাগজপত্রপত্রিকা গুলোয় তাকে নিয়ে ও তার কর্মজীবন নিয়ে অবিশ্বাস্য উত্থান বিষয়ে লেখা এবং ছবি প্রকাশিত হয়। বাণিজ্য জগতে হ্যারী স্ট্যানফোর্ড এক চূড়ান্ত বিস্ময়। তিনিই বাণিজ্য দৈত্য স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজ-এর একচ্ছত্র মালিক। বাণিজ্য জগতের কাছে নিজের কর্মদক্ষতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে তিনি এক বিস্ময়কর কিংবদন্তী। লার্জার দেন লাইফ হয়ে ওঠা চরিত্র।

হ্যারী স্ট্যানফোর্ড যেহেতু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, সংবাদ মাধ্যম তাই তার সব কিছুই জানে এবং জনগণকে জানায়। আবার সেই পাবলিক ফীগার ব্যবসায়ী হ্যারী স্ট্যনফোর্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে এক অন্যতর ঘরোয়া পারিবারিক হ্যারী স্ট্যানফোর্ড। সংবাদ মাধ্যম যাকে ছুঁতে পারে না। জনগণ সে হ্যারী স্ট্যানফোর্ড এর জীবন যাপন সম্পর্কে কিছুই। জানতে পারে না, জানে না, সেই স্ট্যানফোর্ডই আসল। যার সবটুকুই আড়ালে গোপনে।

তোমরা কোথায় যাচ্ছ? সুন্দরী লালচুল যুবতীটি প্রশ্ন করে। হ্যারী উত্তর দেবার অবস্থায় ছিলেন না। তিনি তখন এক অন্য জগতে। রাস্তার অপর দিকের ফুটপাথে তখন অনুসরণকারী জুটিটির ওপর তার মনোনিবেশ। সারা শরীর জুড়ে থমকে রয়েছে এক রুদ্ধ বিরক্তি, বিপদের অনুভূতিটার সাথে সাথে তার মন জুড়ে এই যে ওরা তার পারিবারিক জীবনে নাক গলাচ্ছে। তিনি যেখানে যাচ্ছেন, তার ব্যক্তিগত স্বর্গোদ্যান, সেখানেও ওরা পিছন ধরে এসে হাজির হয়েছে। এর বিরুদ্ধেই প্রচণ্ডতর এক রাগে সোচ্চার হয়ে উঠতে চাইছিলেন তিনি। কান আর নিসের মধ্যে আল্পস পর্বত চূড়ার পথে অবস্থিত সেন্ট পলস ডি ভেনস এর মন জুড়াননা প্রকৃতিক নৈসর্গিক দৃশ্যবলী সত্যিই মননামুগ্ধকর। উচ্চতর অবস্থান থেকে চারপাশে যে দিকে তাকানো যায় রক্তবেরঙের ফুল আর বিভিন্নতর অর্কিড। পাইন সারির বন। সেন্ট পল-ডি ভেনস যেন কোন প্রাকৃতিক শিল্পীর স্টুডিও। নাকি ভোলা ক্যানভাস? যে রঙীনতর ক্যানভাসের উচ্ছল চুম্বক টানে সারা পৃথিবী থেকে ছুটে আসেন পর্যটকের দল।

এখন স্ট্যানফোর্ড এবং তার দলবল দাঁড়িয়ে আছেন রু গ্র্যান্ডে। স্ট্যানফোর্ড তার সঙ্গিনীর দিকে ফিরে তাকালেন। সোফিয়া তুমি কি মিউজিয়াম পছন্দ করো? হা নিশ্চয়ই। যুবতীটি হ্যারীর পছন্দে বা যে কোন কথায় সায় দিয়ে তাকে খুশি করতেই সদা উৎসুক। তার জীবনে সে আগে কখনো হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের মত কোন পুরুষের সাথে মিলিত হয়নি, আলাপ করেনি। কথা বলার সুযোগ পায়নি। দীর্ঘযাত্রার সঙ্গিনী হওয়া তো অনেক দূরের কথা। আমি ভাবতাম যৌনতার ব্যাপারে সবকিছুই আমি জেনে ফেলেছি। আর কিছু বাকি নেই। হে ভগবান, হারীর সাথে বিছানায় না গেলে আমি কোনদিন জানতেই পারতাম না

যে আমিও কতটা নবিশ, এখনো যৌনতার বিস্তৃত চরাচরে। আহ, ও যেন এক শিল্পী। যার সৃজনী শক্তি কোন নারীর পক্ষে কল্পনাতীত। নারীকে সমস্তটুকু নিংড়ে বের করে।

পাহাড়ের উচ্চতর অংশে ফাউন্ডেশন মায়েঘট আর্ট মিউজিয়ামে গিয়ে পৌঁছল। সারা মিউজিয়াম জুড়ে শিল্পের অনন্য সাধারণ সব সংগ্রহের মাঝে ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগল। একসময় হ্যারী স্ট্যানফোর্ড যখন চোখ বোলালেন শিল্প সংগ্রহের গ্যালারীর শেষ প্রান্তে তখন তিনি অনুসরণকারীর একজনকে দেখতে পেলেন। খুব যেন মনোযোগ দিয়ে মিনোর একটা ছবিকে খুঁটিয়ে দেখতে ব্যস্ত। স্ট্যানফোর্ড সোফিয়ার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকালেন। ক্ষিধে পেয়েছে? হ্যাঁ যদি তোমারও পেয়ে থাকে। সে হাসে। ঠিক আছে চলো, লা–কলম্বো ডি ওর-তে আমরা দুপুরের খাবার খেতে যাবো। লা-কলম্বো ডি ওর স্ট্যানফোর্ডের অত্যন্ত পছন্দের জায়গা। এটা আসলে একটি ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন বাড়ী। যার প্রাচীনতর ঐতিহ্যকে ধরে রেখেই একটি আধুনিক খাদ্যশালা তৈরি করা হয়েছে। এখানকার খাবারও অত্যন্ত সুস্বাদু। উপাদেয় স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে তৈরি। গ্রামে ঢোকার মুখেই হোটেল তথা রেস্তোরাঁটা। ওরা সাঁতারের জলাশয়ের পাশে বাগানে ছাতাওয়ালা আসনে গিয়ে বসল। প্রিন্স নামের জার্মান শেফার্ডটি প্রভুর পায়ের কাছে এসে জড়িয়ে বসল। প্রিন্স তার প্রভুর সর্বক্ষণের সঙ্গী। বলা যায় হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের যেন ট্রেড মার্ক এই প্রিন্স। গুজব শোনা যায় অত্যন্ত রকম প্রভুভক্ত প্রিন্স নাকি একবার তার মনিবের নির্দেশে জনৈক ব্যক্তি টুটি কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছিল। যদিও এটা শুধুই গুজব কিনা তা পরীক্ষা করার সাহস কারোরই হয়নি। দিমিত্রি রেস্তোরাঁর ঠিক প্রবেশ পথের সামনে একটি আলাদা চেয়ারে বসে সদা সতর্ক চোখে চলমান প্রতিটি মানুষ এবং আশেপাশের সবকিছু লক্ষ্য করছিল। নজর রাখছিল।

.

সুস্বাদু, দামী, উপাদেয় খাবারের মহার্ঘ্য স্বাদ নিতে নিতে সোফিয়া মুখ তুলল, আমি আগে এখানে কখনো আসিনি। আসতে পারব ভাবিও নি। স্ট্যানফোর্ডের মনোযোগ এবার সোফিয়ার দিকে ফিরল। এই যুবতীটিকে দিমিত্রি দিন কয়েক আগে নিসের এক হোটেলে প্রথমবার দেখতে পায়। এবং সেখান থেকেই মনিবের জন্য তাকে সংগ্রহ করে দিমিত্রি। প্রথম আলাপেই দিমিত্রি যখন তাকে মনিবের হয়ে রাতের খাবারের আমন্ত্রণ জানায়, যুবতীটি জানিয়ে দেয় সে কোন হেজি বেজি নয়। একজন অভিনেত্রী। এবং বাস্তবিকই পিউপি আভাতির শেষ ছবিতে, ভীড়ের দৃশ্য বলা যায় না, ঠিক এরকম একটি প্রায় না একস্ট্রা চরিত্রে অভিনয় করেছে। এবং গিউশিপ্পে টরনাতোরের ছবিতেও দুলাইনের সংলাপ সহ একটি চরিত্রে অভিনয় করেছে সে। একজন অপরিচিতের সাথে কেন আমি রাতের খাওয়া খেতে যাবো? বিরক্তি মেশা, বাঁকা ভূ সহকারে প্রশ্ন করেছিল সে। দিমিত্রি একটা পাঁচশো ডলারের নোট মেয়েটির হাতে গুঁজে দেয়।

আমার মনিব অত্যন্ত দয়াপরাবশ, ভদ্র, বিনয়ী। সবচেয়ে বড় কথা বাড়াবাড়ি রকমের অতি ধনবান। তাঁর নিজের ইয়ট আছে। বিনোদন বাস আছে কয়েক ডজন-সমুদ্র পাড়ে শৈলশিখরে মিলিয়ে। কিন্তু তবু তিনি বড় নিঃসঙ্গ। পুরো কথা শেষ হবার আগে থেকেই, তার বক্তব্যের মাঝপর্ব থেকেই মেয়েটির মুখের তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি পরিবর্তিত নরম হতে লক্ষ্য করে দিমিত্রি। কথা শেষ হতে না হতেই বাঁকা ভুরু সোজা। সে হাসে–ছবির শুটিংয়ের ফাঁকে যদি আপনার বন্ধুর নিমন্ত্রণটা হয় তাহলে তা রাখা যেতে পারে। বিরক্তির পারদ তখন বদলে গেছে, কৌতূহল আর আগ্রহে।

মানতেই হবে, দিমিত্রির পছন্দ, রুচিজ্ঞান অতি চমঙ্কার। ইতালিয়ান মধ্য কুড়ির যুবতীটি আবেদনময়ী, পুর্ণস্তনী, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। এ মুহূর্তে সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে গেল। সোফিয়া তুমি বেড়াতে ভালোবাসো? দারুণ, দারুণ ভাল লাগে আমার ঘুরে বেড়াতে। স্ট্যানফোর্ড হাসেন, চমৎকার। তাহলে একটা ছোট্ট অথচ দারুণ সফরের ব্যবস্থা করা যাক। এক মিনিট বসো। সোজা উঠে গিয়ে সাঁতারের জায়গাটার পাশে, জনগণের ফোনটায় গিয়ে ঢোকেন। একটা মুদ্রা ফেলে অক্ষর সংখ্যা ঘোরাতেই অপর প্রান্তে সাড়া পেলেন আমি কী কথা বলবো, স্ট্যানফোর্ড সাথে সাথে বললেন, আমি নীল আকাশ ইয়টে যোগাযোগ করতে চাই হুইস্কি ব্র্যাভো লিমা নয় আট শূন্যকথা শেষ হবার পর ফোন রেখে দিয়ে স্ট্যানফোর্ড আরো একটা ফোন করলেন। নিসে বিমানবন্দরে। মিনিট দুয়েক পরই আবার খাবার টেবিলে যোগ দিলেন তিনি। খাবার শেষ হলো, তখন তিনি সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলো এবার একটু হেঁটে আসা যাক। তার প্রখর মস্তিষ্কে তখন ধীরে ধীরে আদল নিতে শুরু করেছে একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা। যাকে এবার তিনি কাজে পরিণত করতে চলেছেন। আজকের দিনটা সত্যিই দারুণ। ঝকঝকে সুর্যের নরম রোদ ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্তরেখা জুড়ে। উজ্জ্বলতর রুপোর রঙ চারপাশে। ওরা হেঁটে বেড়ালো রু গ্ল্যান্ডের পথ ধরে। বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছে একটা দোকান থেকে তাজা সদ্য সেঁকা রুটি কিনলেন স্ট্যানফোর্ড কিছুটা। রুটির টুকরোর প্যাকেটটা সোফিয়ার হাতে দিয়ে বললেন, তুমি বাড়ীর দিকে এগোও। আমি একটু পরে আসছি। সোফিয়া মাথা নেড়ে হেসে এগিয়ে যায়। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে, বেশ কিছুটা দূরে চলে যাবার পর স্ট্যানফোর্ড দিমিত্রির দিকে ফিরলেন। হ্যাঁ বলো। কি খবর? দিমিত্রি চাপা গলায় বলে, মেয়েটা আর লোক দুজনের একজন থাকছে লা কললে রাস্তার ওপর লা হোমেউ

হোস্টেলে। স্ট্যানফোর্ড মাথা নাড়লেন। তিনি জায়গাটাকে চেনেন। আর অন্যজন? সে থাকছে লা মাস ডি. আটিগনিতে। এটা একটা প্রাসাদোপম বাড়ী। বাড়ীটা কার জানতে পারিনি। কথা শেষ করে কয়েক মুহূর্ত মনিবের দিকে তাকিয়ে থেকে দিমিত্রি প্রশ্ন করে, এদের কি ব্যবস্থা করব? কিছু না। এদের আমি দেখছি।

স্ট্যানফোর্ড যখন ভিলায় ফিরলেন, সোফিয়া তার জন্যে শোবার ঘরে অপেক্ষা করছিল। বেঁচে থাকার জন্য, জীবন ধারনের চাহিদা মেটাতেই ফিল্মের কাজের পাশে পাশে সোফিয়াকে কলগার্ল হিসেবে পুরুষকে সঙ্গ দিতে হয়। তাদের খুশি করতে হয়, সোফিয়াকে চরম তৃপ্ত হবার অভিনয় করতে হয়। কিন্তু এই পুরুষটির সঙ্গে সে সবের কোন প্রয়োজনই হয় না। ও অপ্রতিবোধ্য। এবং প্রতিবারই চরম যৌনসুখের শীর্ষতৃপ্তিতে ভরে ওঠে সোফিয়া।

লা কাফে ডি লা পেলেসে রাতের খাওয়া সেরে ওরা যখন ফিরছে, স্ট্যানফোর্ড ইচ্ছাকৃত ভাবেই আয়েসী ধীর পায়ে হাঁটছিলেন। সঙ্গে পাশে সোফিয়া, পেছনে দিমিত্রি। তার মাথায় একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা কাজ করছে। এবং তিনি তার অনুসরণকারীদের সুযোগ করে দিতে চান। রাত একটায় তার ভিলার উল্টো দিকের ফুটপাথে পথবাতির নিচে দাঁড়িয়ে অনুসরণকারীদের একজন দেখল ভিলার ঘরগুলোর আলো একটা একটা করে ক্রমে নিভে যাচ্ছে। যতক্ষণ না সবগুলো ঘরের শেষ আলোটাও নিভে গিয়ে পুরো বাড়ীটা অন্ধকার আর নৈঃশব্দে ডুবে না গেল সে নড়ল না। রাত চারটে। স্ট্যানফোর্ড সোফিয়াকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। সোফিয়া, সোফিয়া, গাঢ় ঘুম ভাঙা ঘোর চোখে সোফিয়া তাকাতেই তিনি বললেন, ওঠো সোনা, বলেছিলাম না আমরা বেড়াতে যাবো? তৈরি হয়ে নাও। আমরা বের হবো। সোফিয়া অবাক গলায় বলে

এখন? হ্যাঁ সোনা। তাড়াতাড়ি করো। হাতে সময় খুব কম! এর পনের মিনিট পর, হ্যারী স্ট্যানফোর্ড সোফিয়া দিমিত্রি এবং প্রিন্সকে নিয়ে বাদামী রেনল্ট গাড়ীটা রাস্তায় নামল। চালকের আসনে বসা দিমিত্রির দিকে তাকিয়ে হ্যারী স্ট্যানফোর্ড বললেন, নিস বিমানবন্দর জলদি।

.

০২.

চল্লিশ মিনিট পর নিস বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা বোয়িং ৭২৭ বিমানটি প্রথমে রানওয়ে ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। তারপর আকাশে উড়ল। এটি হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের ব্যক্তিগত বিমান। এবং বিমানটি যখন আকাশে উড়ল হ্যারী জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। তিনি নিশ্চিত। তার এই ধোঁকাটি বেশিক্ষণ গোপন থাকবে না তার ধূর্ততর প্রতিপক্ষের কাছে। এবং তার অনুমান ভুল ছিল না। বোয়িংটি সবে আকাশে উড়তে না উড়তেই নিস বিমান বন্দরে কনট্রোল রুমের ফোন বাজল। হ্যালো নিস বিমানবন্দর কনট্রোল রুম? হ্যালো মঁসিয়ে স্ট্যানফোর্ডের বিমানটি কি আছে? না মঁসিয়ে ওরা এইমাত্র আকাশে উড়েছে। অন্য প্রান্তে সাময়িক স্তব্ধতার পর সাড়া পাওয়া গেল। ঐ বিমানের চালক কি তাদের রুট চার্ট জানিয়েছেন? নিশ্চয়ই, জন এফ কেনেডী বিমানবন্দর, আমেরিকা। ধন্যবাদ। টেলিসংযোগ ছিন্ন হলো।

হ্যারী স্ট্যানফোর্ড তার গাড়ীর তোলা কাঁচের জানালার মধ্যে দিয়ে বিমানটিকে আকাশে উড়তে দেখলেন। তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সব

জেনেছে? যাক বিমানের পেছনে বুনোহাঁস তাড়া করুক। দিমিত্রির দিকে তাকিয়ে বললেন, নাও হে, কাজ শেষ এখানকার। এবার চলল। আধ ঘন্টা পর তার বাদামী রেনল্ট মন্টে কালো পার হয়ে ইতালির সীমান্তের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। আকাশে তখন সবে রাতের আঁধার কেটে ফিকে আভা। ভোরের আকাশ সদ্য জাগতে শুরু করেছে।

.

সন্ধ্যের একটু পরে রেনল্টটা সান রেমেতে পৌঁছল। অনেক অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার এই শহরটার সাথে। কিন্তু বড় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। চরিত্র হারাচ্ছে শহরটা। এক সময় এটা সুন্দর সুন্দর হোটেল আর বেঁস্তোরাময় শহর ছিল। ছিল ক্যাসিনোগুলো। সেখানে এক সন্ধ্যাতে ভাগ্যর পাশা ওলোট পালোট ঘটাত মানুষের জীবন। আর এখন শহরটা কিছু হঠাৎ ধনী, হামলাবাজ, জুয়াড়ীর দখলে। হ্যারী স্ট্যানফোর্ড তখন শহরটাকে পছন্দ করতে। পর্যটকরা জুয়া খেলত। এখন জুয়াড়ীরা আসে পর্যটক হয়ে। রেনল্টটা শহরের ভিতর দিয়ে দ্রুতগতিতে জাহাজ ঘাটার দিকে চলল। এই বন্দরটা ইতালি-ফ্রান্স সীমান্ত রেখার বারো মাইল দূরে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে জাহাজ ঘাটায় নোঙর করা নীল আকাশ ইয়টে পৌঁছে গেলেন হারী স্ট্যানফোর্ড তার দলবল সহ। ইয়টের ক্যাপটেন কারো ওদের অভ্যর্থনা জানালেন। শুভ সন্ধ্যা সিনর। আপনাদের মালপত্র তুলে আনতে বলি? স্ট্যানফোর্ড হাত নাড়লেন। আমাদের সাথে কোন মালপত্র নেই। তারপর সতর্ক চোখে কেবিন ক্রুদের দিকে লক্ষ্য করতে করতে কোণের দিকের অল্প বয়সী যুবকটির দিকে তাকিয়ে আঙুল তুললেন। ওটি নতুন মুখ, তাই না? কারো মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ সিনর। আমাদের একজন কেবিন বয় কাপ্রিতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার বদলে এ

ঢুকেছে। ওকে বাদ দাও। মায়নাপত্র দিয়ে এখনি এই বন্দরেই নামিয়ে দাও। আমি কোন অচেনা মুখ এই সফরে চাই না। মনে রেখো। কারো অবাক। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ চোখে তাকালেন। মাথা নেড়ে সায় দিলেন মনিবের হুকুমে। আচ্ছা সিনর। স্ট্যানফোর্ড তার নৌ অধ্যক্ষের চোখের বিস্ময় পড়তে পারলেন। তিনি বাতাসে বিপদের গন্ধ টের পাচ্ছেন। এই সময়ে তার কাছাকাছি কোন অপরিচিত লোক থাকা, রাখার ঝুঁকি তিনি নিতে পারেন না। ইয়টের ক্যাপটেন এবং অন্য নাবিকরা দীর্ঘদিন তার কাছে কাজ করছে। তিনি এবার তার নতুন সঙ্গিনীর দিকে ফিরলেন। কামিনস্কি ওকে যেহেতু বেছেছিল প্রায় লক্ষ্যহীন ভাবে, হঠাৎ খেয়াল খুশি মত, কোন পরিকল্পনা ছাড়াই, তাই এর দিক থেকেও কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। বাকি রইল কামিনস্কি। নাহ, ওর বিশ্বস্ততা নিয়ে কোন সন্দেহ তোলার অবকাশই নেই।

দিমিত্রি কামিনস্কি বাইরের ডেকে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুরুর আয়োজন লক্ষ্য করছিল। জেনারেটরগুলো চলতে শুরু করেছে সগর্জনে। নোর ভোলা হয়েছে। সামান্য দুলতে শুরু করেছে নৌকো। কারো এসে স্ট্যানফোর্ডের কেবিনের দরজায় দাঁড়ালেন, সিনর স্ট্যানফোর্ড। বলুন ক্যাপটেন। আমরা যাত্রা শুরু করছি। আমাদের যাত্রাপথের লক্ষ্য কী হবে? পোটো ফিলো, ক্যাপটেন।

.

০৩.

ইতালিয়ান রিভিয়েরার লিগুরিয়ান কোস্ট। একটা অর্ধ বৃত্তাকার নিয়ে জেনোয়া থেকে প্রায় ঝাড়ু মারার মত ঘুরে গিয়ে এগিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে লা স্পেজিয়া গালফ-এর দিকে। দীর্ঘ একটা ফিতের মত ছড়ানো এই বালুকা বেলার এক পাশে ছোট্ট বন্দর পোটোফিলল। একটু আগেই নীল আকাশ সে বন্দরে এসে থেমেছে, নোঙর ফেলেছে। নিজের কেবিনের জানালা দিয়ে সতর্ক চোখে বন্দরের দিকে দেখতে দেখতে স্ট্যানফোর্ড মনে মনে হাসলেন। নাহঃ, ওরা তার জন্য জন এফ কেনেডীতেই অপেক্ষা করবে। সোফিয়া এসে তার পাশে দাঁড়ায়, তুমি কি প্রায়ই এখানে আসো? মাঝে মাঝে। তোমার আসল বাড়ী কোথায়। বড় ব্যক্তিগত। স্ট্যানফোর্ড প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। বন্দরটা খুব সুন্দর। আশা করি তোমার ভাল লাগবে।

.

একটু পর ওরা তিনজন–স্ট্যানফোর্ড, সোফিয়া এবং দিমিত্রি বন্দরের সুন্দর সুন্দর দোকান বাজারের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এক সময় স্ট্যানফোর্ড সোফিয়ার দিকে তাকালেন। আমরা দুপুরের খাওয়া খেতে যাবো হোটেল সেপ্পভিডোতে। একেবারে পাহাড়ের চুড়োয় বেঁস্তোরাটা। খেতে খেতেই ছবির মত পুরো শহরটাকে দেখতে পাওয়া যায়। কথা শেষ করে তিনি হাত নেড়ে একটা ট্যাক্সি ডাকলেন। সোফিয়ার হাতে কিছু লিরা তুলে দিয়ে বললেন, তুমি চলে যাও। ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি একটা ছোট্ট কাজ সেরে আসছি। সোফিয়া মাথা নেড়ে সায় দেয়। ট্যাক্সিটা সোফিয়াকে নিয়ে চলে যেতে তিনি দিমিত্রির দিকে তাকালেন। একটা ফোন করতে হবে। এবং সেটা নৌকো থেকে করা যাবে না। দিমিত্রি ভাবে, ইয়টে উঠেই নৌকোর রেডিওটিকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন মনিব। কোনরকম রেডিও বার্তা পাঠান, নেওয়া বা

কোনরকম রেডিও সংযোগই করতে দিচ্ছেন না। এমন কি, নৌকো থেকে কাউকেই সেলুলার ফোন ব্যবহার করে কথা বলারও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। দিমিত্রি যখন এসব ভাবছে লম্বা পা ফেলে রাস্তার অন্য প্রান্তে জনগণের ফোন ঘরটাতে ঢুকে পড়লেন স্ট্যানফোর্ড।

.

বোয়িং ৭২৭ জন এফ কেনেডী বিমানবন্দরে নামল। লাউঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চার জোড়া চোখ অতি সতর্ক ভাবে চলমান যাত্রী স্রোতে নজর বুলোচ্ছিল। খুঁজে বেড়াচ্ছিল একজনকে।

দুপুর পার হওয়া সদ্য বিকেলে নীল আকাশ এসে পৌঁছল এলবা দ্বীপের বন্দরে। স্ট্যানফোর্ড সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, এখানেই নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। সারা দ্বীপ জুড়ে যোড়শ শতাব্দীর অনন্য সাধারণ স্থাপত্যময় সুন্দর সুন্দর সব বাড়ী আছে। রাস্তাঘাটেও ছড়িয়ে আছে সুন্দর প্রাচীন ঐতিহ্য। তারপর দিমিত্রির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বরং ওকে নিয়ে যাও। ভিলা ডেল মুলিনি ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এসো। দিমিত্রি মাথা নাড়ে, আচ্ছা স্যার। ওরা বেরিয়ে যায়। স্ট্যানফোর্ড তার ঘড়ির দিকে তাকালেন। সময় দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণে বিমান জে কে এফ-তে পৌঁছে গেছে। এবং ওরা ব্যাপারটি ধরতে পেরেছে। সাথে সাথে নতুন করে শুরু হবে সন্ধান। ওর সঠিক গতিপথ খুঁজে পেতে ওদের কিছুটা সময় লাগবে। যা করার তার মধ্যে তার আগেই করে ফেলতে হবে। সব কিছু গুছিয়ে ফেলতে হবে। তিনি একাই

ইয়ট ছেড়ে বন্দরে নেমে এলেন। একটা ফোন বুথে ঢুকলেন। যন্ত্রে মুদ্রা ফেলে নম্বর ঘোরালেন, হ্যালো? বাকলেজ ব্যাঙ্ক? এক...সাত...এক...।

পনেরো মিনিট পর আবার তিনি বুথটায় গিয়ে ঢুকলেন। নম্বর ঘোরালেন...হ্যালো? সুমিটুমো ব্যাঙ্ক, টোকিও? আধঘণ্টা পরে তিনি যখন নৌকাতে ফিরে এলেন তাকে কিন্তু চিন্তিত দেখাচ্ছিল। দিমিত্রি এবং সসাফিয়া ততক্ষণে ফিরে এসেছে। ক্যাপটেন এসে জানতে চাইলেন, সিনর, আজকের রাতটা আমরা কি এখানেই নোঙ্গর ফেলব? নাহ, রওনা দাও। সারদিনিয়া। এখনি। তার ভঙ্গীতে ক্ষিপ্ততাময় অস্থিরতা ধরা পড়ে।

সারদিনিয়ার পাশে অবস্থিত কোস্ট স্মেরালডা সম্ভবত এই অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। মেডিটেরিনিয়ান কোস্ট-এর পাশ ঘেঁষা এই সমুদ্র উপকূল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত করে দেবার মত। ছবির মত ছোট্ট শহরটা পোর্টো সিরভো ধনীদের বেড়ানোর আকর্ষণ। সারা বছরই পর্যটকে ভরা থাকে আলিই খান-এর হাতে তৈরি প্রাচীনতম শহরটি। স্ট্যানফোর্ড শহরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন, সোফিয়াকে। প্রাচীন স্থাপত্য শৈলী, গথিক সৌন্দর্যে ভরা বিশাল বিশাল ভিলা, ইট বানো চওড়া রাস্তা, প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মূর্তি। স্থাপত্যের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তারা। একসময় স্ট্যানফোর্ড রাস্তার পাশে একটা জনগণের ফোন দেখতে পেয়ে সোফিয়াকে বললেন, দাঁড়াও। আমায় একটা ফোন করতে হবে। সোফিয়া অবাক হয়। নৌকো থেকে কেন ফোন করে না ও; ব্যাপারটা কী? স্ট্যানফোর্ড ততক্ষণে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছেন। যন্ত্রে মুদ্রা ঢুকিয়ে নির্দিষ্ট নম্বর ঘোরালেন, হ্যালো, ব্যাঙ্ক ডিটালিয়া; রোম?... এরপর প্রায় আধঘণ্টা ধরে কথোপকথন চলে, ফোন ঘর থেকে যখন তিনি বের হয়ে আসেন, ওকে বিধ্বস্ত দেখায়। প্রায় কদাকার একটা ঝড় বয়ে গেছে যেন।

দুপুরের খাবার খেতে ওরা যায় লিসিয়া ডি ককাতে। ওদের খাওয়া যখন মাঝ পর্বে হঠাৎ যেন হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল স্ট্যানফোর্ডের। সোফিয়ার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে পেলেন, কোণের টেবিলে দুজন পুরুষ এদিকেই তাকিয়ে আছে। দুজনেরই পরনে গাঢ় রঙের সুট। তখন কি লোক দুটো পর্যটক সাজার ভানও করছে না। করার দরকারই মনে করছে না। ওরা কি তারই পেছনে; নাকি নিছক নিরীহ অচেনা? নাহ, ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সোফিয়া কথা বলে চলেছে। তুমি কিন্তু আমায় এখনো বলনি, তুমি কীসের ব্যবসা করোকী করো। স্ট্যানফোর্ড সোফিয়ার দিকে ফিরলেন, কেউ অচেনা, তার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এ ব্যাপারটা কেন জানি তৃপ্তি দেয় ওঁকে। আমি রিটায়ার করেছি। এখন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছি। এবং তুমি খুব একা নিঃসঙ্গ। তাই না? এবার শব্দ করে হো হো হেসে ওঠার মত পরিস্থিতি, অথচ স্ট্যানফোর্ড তা করলেন না। বিষণ্ণ ভঙ্গী গলা করে তিনি বলেন, হ্যাঁ, আর সেই চরম নিঃসঙ্গতার মাঝে তোমায় পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি সোফিয়া। ওঁর হাতটাকে নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে সোফিয়া বলে আমিও; আমিও। স্ট্যানফোর্ড আবার তাকালেন চোখের কোণ দিয়ে। ওরা টেবিল ছেড়ে উঠে বের হয়ে গেল। দুপুরের খাওয়া শেষ হলো। ওরা আবার রাস্তায় বের হয়ে এলো। ছায়ার মত, একটু দূরত্বে দিমিত্রি। রাস্তায় নেমেই স্ট্যানফোর্ড উলটো দিকের ফোন ঘরে ঢুকলেন। হ্যালো লিয়ননেইস ক্রেডিস, প্যারিস?... সোফিয়া দিমিত্রির দিকে তাকায়, আপনার মনিব সত্যিই দারুন মানুষ। উনি সবার থেকে আলাদা। দারুণ মানুষ। আপনি সত্যি সৌভাগ্যবান। হ্যাঁ সত্যিই তাই। কবছর কাজ করছেন ওর কাছে? তিন বছর। ফোনঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছিল। দিমিত্রির কানে ভেসে আসতে থাকে স্ট্যানফোর্ড-এর ফোন সংলাপের টুকরো–রেনে? তুমি তো জানো কেন আমি ফোন করছি...হা...হা...তুমি করবে তো।...ঠিক আছে...হা..দারুণ..না,

না। ওখানে ...হা তাহলে করসিকা..সেটাই ঠিক রইল তাহলে? ফোন ঘর থেকে বের হয়ে আসার পর তাকে অনেকটা আশ্বস্ত নিরুদ্বেগ চিন্তামুক্ত মনে হচ্ছিল।

ফোন ঘর থেকে বের হয়ে এসে তিনি সোফিয়াকে বললেন–সোফিয়া আমাকে একটা দরকারী কাজ করতে হবে। তুমি বরং সোজা হোটেল পিত্রাজায় চলে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করো। মাথা নেড়ে সায় দেবার ভঙ্গীতে প্রেমময়তার আবেদন ফুটিয়ে তুলে সোফিয়া চলে যায়। স্ট্যানফোর্ড আবার ফোন ঘরটায় গিয়ে ঢোকেন। একটা নম্বর ঘোরান। হ্যালো? হারী স্ট্যানফোর্ড বলছি। আমি শ্রী ফিৎজেরাভের সাথে কথা বলতে চাই। অন্য প্রান্ত থেকে একটি নারী কণ্ঠ বলে, আমি ওনার ব্যক্তিগত সহকারী বলছি। উনি তো অফিসে নেই। কয়েক দিনের জন্য ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেছেন। অন্য কাউকে... না, আমার ফিজেরাল্ডকেই দরকার। শুনুন ওকে খবর পাঠান। আমি দেশে ফিরছি, ও যেন সোমবারই সকাল দশটায় বস্টন এর রোজ হিলতে আমার উইল এবং একটা নোটারী নিয়ে হাজির থাকে। মেয়েটি উত্তর দেয়, আমি চেষ্টা করছি...। ওর কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ধারালো কাটা কাটা ভঙ্গীতে স্ট্যানফোর্ড বলেন, চেষ্টা নয়, চেষ্টা নয়। এটা করতেই হবে। অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। ঠিক আছে স্যার। আমি দেখছি। ফোন ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসার পর তাকে সমাহিত ধীর স্থির, নিশ্চিন্ত দেখায়। দিমিত্রির কাছে এসে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ইয়টে ফিরে চলো। আমরা রওনা হবো। দিমিত্রি অবাক গলায় বলে, কিন্তু...। স্ট্যানফোর্ড বাঁকা হাসেন। মেয়েটার কথা বলছ? ও যেভাবেই হোক ফিরে যেতে পারবে।

নীল আকাশে ফিরে তিনি সোজা ক্যাপটেন ভাকাবোর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ক্যাপটেন আমাদের এক্ষুনি করসিকার দিকে রওনা হতে হবে। নোঙর তুলুন। ভাকাররা ইতস্তত

করেন, সিনর, একটু আগে একটা বার্তা এসেছে। সমুদ্রের অবস্থা ভাল নয়। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। অসম্ভব। আমাদের এখনি রওনা হতে হবে। আমার হাতে সময় নেই। কিন্তু সিনর, এটা দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ। সমুদ্র ভীষণ রকম অশান্ত হয়ে ওঠে। আমার ওসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। রওনা দিন। যা হবে দেখা যাবে। করসিকাতে তার সমস্যার সমাধান ঘটবে। তাকে যেতেই হবে। এবং কুড়ি মিনিট বাদে নীল আকাশ নোঙর তুলে রওনা হলো।

.

০৪.

ওর আদর্শ হচ্ছেন ডন কোয়াইলে এবং ছদ্ম পরিচয় হিসেবে মাঝে মাঝেই এই নামটাকে ব্যবহার করে থাকে সে। কোয়াইলে সম্পর্কে সবাই কী বলে তাতে মোটেই আমল বা কান দেয় না সে। সব সময় সর্বদা কোয়াইলের পেছনে আছে। কারণ কোয়াইলে একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি নাকি পারিবারিক মূল্যবোধকে সম্মান ও গুরুত্ব দেন। এই যে যুবক যুবতীরা বিবাহ বহির্ভূত জীবন যাপন বা লিভ টুগেদার করছে, সন্তান ধারণ করছে, এরকম একটা ঘৃণ্য পদ্ধতিকে, শকিং ব্যাপারকে কী করে মেনে নিচ্ছে, মেনে নেয় সমাজ ব্যবস্থা? এই যে এত অপরাধ ঘটছে চারপাশে, কেন তার কোন প্রতিকার হচ্ছে না? ডন কোয়াইলে যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। তবে এসব কিছুই ঘটত না। দৃঢ় বিশ্বাস তার। ওর নিজের চার ছেলে মেয়ে। বড় ছেলের বিলির বয়স আট। পরের তিন মেয়ে অ্যামি, সুসান, ক্লারিসসার বয়স যথাক্রমে দশ, এগারো, চৌদ্দ। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটানো তার কাছে এক অত্যন্ত সুখকর আরামদায়ক

অভিজ্ঞতা। সপ্তাহান্তের ছুটিটা ছেলে মেয়েদের সাথেই কাটায়। কাটাতে ভালবাসে। শুধু নিজের ছেলে মেয়েদেরই নয়, আশেপাশে পাড়া প্রতিবেশীর ছেলেমেয়েদেরও খুবই ভালবাসে। ওদের সাইকেল সারাই করে দেয়। খেলনা তৈরি করে দেয়। ছেলে মেয়েগুলোও তাকে খুবই ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে। ওরাও তার নিজের সন্তানদের মতই। তাকে ডাকে পাপা বলে।

ঝকঝকে রোদে উজ্জ্বল ছবির মত সুন্দর দিনটা। বসে বসে বেসবল খেলা শেখাচ্ছিল সে। এমন সময় তার সেলুলার ফোন বেজে উঠল। আহ, তার ভঙ্গীতে বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ে। এই নম্বরটা শুধু একজনই জানে। আর সে জানে সপ্তাহান্তের ছুটি কাটানো পরিবারের মধ্যে থাকার সময়ে বিরক্ত করাটা সে মোটেই পছন্দ করে না। মনে মনে রাগে গজগজ করতে করতে ফোনটা তোলে। কারণ তাকে অমান্য করার ক্ষমতা তার নেই। কয়েক মিনিট কথা বলে সে। বোতাম টিপে ফোনটা বন্ধ করে আগে সে বলে–ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি আমি দেখছি। ফোনটা নামিয়ে রাখতেই হাঁসের মাংসের কোর্মা রান্না করতে করতে ওর স্ত্রী জিজ্ঞেস করে। কী ব্যাপার গো? সব ঠিক আছে তো? সে হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে, বোধহয় না, ওরা আমাকে ডেকেছে। কাজ পড়েছে। অথচ কৃর্তা জানেন সপ্তাহের শেষের ছুটিতে কাজ আমি পছন্দ করি না। ওকে বিরক্ত রাগত দেখায়। স্ত্রী ওর হাত আলতো চাপ দেয়। ভালবাসামাখা গলায় বলে, তোমার কাজটা সব থেকে জরুরী। নাহ, মোটেই না। তার পরিবারের থেকে বড় কিছুই নয়। হতে পারে না। সে ভাবে। ডন কোয়োইলি বুঝত। একমাত্র সে বুঝত। কিন্তু এবার তাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। ডাক যখন এসেছে। বস্টনের ফ্লাইট ধরার জন্যে তার হাতে খুব বেশি সময় নেই।

রবিবার সকাল সাতটা। সে বস্টন পার্ক প্লাজার বিশাল বাড়ীটায় ঢুকল। বস্টন ট্রাষ্ট বিল্ডিং এটা। আটতলার ওপরে উঠে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। মোম পালিশ করা দরজায় পিতলের নাম ফলক ঝকঝক করছে–ফিজেরাল্ড অ্যাটনী। নিস্তব্ধ জনমানব শূন্য করিডোরটার দিকে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বন্ধ দরজাটার সামনে বসে পড়ল। নিজের ছোট্ট কালো চামড়ার যন্ত্রপাতির বাক্সটা খুলে কাজে নেমে পড়ল। মিনিট সতেরর মত সময় লাগল তার সদর দরজার স্বয়ংক্রিয় তালাচাবিকে অকেজো করে বিনা অনুমতিতে অনধিকার অনুপ্রবেশ করতে।

অফিসটায় এক চক্কর লাগালো সে তার প্রার্থিত গন্তব্য খুঁজে পেতে। রেকর্ডস রুম। ঘরটায় ঢুকে আর এস চিহ্নিত করা ক্যাবিনেটটা খোলার চেষ্টা করল। ওটা তালা বন্ধ ছিলো। পকেট থেকে এক গোছা সব খোলা চাবি বের করে সে। বেশ কয়েকবার কয়েকটি চাবি দিয়ে চেষ্টা করার পর তার মুখে হাসি ফুটল। ক্যাবিনেটটা খুলে গেল। আহ, এবার একটা লম্বা ছুটি। বউ, ছেলে-মেয়ে নিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে একটা লমবা দুর্দান্ত মন মাতানো ছুটি। একটা ড্রয়ার টেনে সে তার প্রয়োজনীয় কাগজগুলো পেয়ে গেল। খালি টেবিলটায় সেগুলো বিছিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট অথচ ক্ষমতাশালী ক্যামেরা বের করে কাজে নেমে পড়ে।

গোটা কাজটা শেষ করে আবার সব যথাযথ ভাবে গুছিয়ে তালা বন্ধ করে সদর দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ীর বাইরে বের হয়ে আসতে তার ঠিক পাকা সতেরো মিনিট সময় লাগল। একটা দুর্দান্ত রকম নিখুঁত এবং সফল কাজের হিসেবে যথেষ্ট কম সময় মানতেই হবে।

.

০৫.

সমুদ্র। সেদিন সন্ধ্যেবেলা। ক্যাপ্টেন কারো দেওয়ালে ছড়ানো বৈদ্যুতিক ম্যাপটায় লম্বা একটা ছড়ি দিয়ে দেখাচ্ছিল। এই যে আমরা এখানে। আর ভয়ঙ্কর দক্ষিণ-পশ্চিমী বায়ুর ঝড় ঠিক এখানে, প্রচণ্ডতরভাবে বইছে। স্ট্যানফোর্ড তাকালেন। বোনিফিয়াশিওর কাছে এখন বইছে ঝড়টা। কয়েক কিলোমিটার মাত্র দূরে। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে তিনি বললেন, আপনি একজন দক্ষ নাবিক, নৌকাটাও উন্নত মানের। আপনি সামলে নিতে পারবেন। ক্যাপ্টেন কারো ডোক গেলেন। আমি চেষ্টা করব। সিনর! স্ট্যানফোর্ড তার কেবিনে ফিরে এলেন। করসিকাতে রেনের সাথে দেখা করবেন। সব কিছু ঠিকঠাক করে নিয়ে হেলিকপ্টার ঠিক করা আছে। কামিনস্কি ব্যবস্থা করে রেখেছে, নেপলস যাবেন। সেখান থেকে ভাড়া করা বিমানে সোজা বস্টন। ফিৎজেরাল্ড তার জন্য অপেক্ষা করবে। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, মিটে যাবে। তিনি মিটিয়ে নিতে পারবেন। আটচল্লিশটা ঘণ্টা শুধু তার দরকার। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা শুধু।

.

নৌকোর ওঠা নামায় তার ঘুমটা ভেঙে গেল। ঠিক রাত দুটোতে। কেবিনে বসেই বাইরের প্রবল ঝড়ের তাণ্ডব টের পাচ্ছিলেন তিনি। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে মোচার খোলার মত দুলছে তার বিশাল প্রমোদ তরণী। বাতাসের তীব্র হুঙ্কারে কানে তালা লেগে যায়। জীবনে অনেক ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। কিন্তু এটা ভয়ঙ্করভাবে নিকৃষ্টতম

সাংঘাতিক। গা গুলিয়ে বমি আসছিল তার। বিছানা থেকে উঠে দেওয়াল ধরে ধরে টলতে টলতে কোনরকমে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। শক্ত হাতে একটা ডেক স্ট্যান্ড আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রবল হাওয়ায় সেটা অসম্ভবই মনে হচ্ছিল। ডেক ফঁকা। কেউ নেই। প্রবল ভাবে মারাত্মক ভঙ্গীতে দুলছে নৌকোটা। মনে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে যেন ঢেউয়ের ধাক্কায় চুরমার হয়ে যাবে। ঠিক এক সময়ে প্রবল বেগে শরীর কাঁপিয়ে বমি এলো তার। দুহাতে পেট চেপে ডেকের ওপর উপুড় হয়ে বসে বমির বেগ সামলানোর চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। আর ঠিক তখনি, প্রবলতর বাতাস আছড়ে পড়ল নৌকোটাকে পাক দিয়ে। ঢেউয়ের দুরন্ততায় নৌকোটা কাগজের নৌকোর মত দুলে টালমাটাল হয়ে ঢেউয়ের মাথায় লাফিয়ে উঠল। সাথে সাথে আরো এক প্রচণ্ড বেগবান বাতাসের আছড়ে পড়া চাবুক। অবলম্বনহীন দুহাতা হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের শরীরটা বাতাসে ছিটকে উঠল। কয়েক মুহূর্ত হাওয়ায় ভেসে থেকে ছিটকে পড়ল। অশান্ত সমুদ্র নিমেষে গিলে নিল তাকে।

ক্যাপ্টেনের কেবিনের জানালা থেকে কামিনস্কির তীব্র আর্তচিৎকারটা ঝড়ো বাতাসের হিংস্র গর্জনের তলায় ডুবে গেল।

.

০৬.

ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্কোয়েস ডুরের, চিফ অফ দ্য পুলিশ দম ফেলবার অবস্থা নেই তার। বছরের এই সময়টা প্রতি বছরেই পর্যটকের ভীড়ে ঠাসা হয়ে ওঠে ছোট্ট দ্বীপটা এবং সঙ্গে সঙ্গে

ছোট্ট পুলিশ দফতরটাও পর্যটকে ঠাসা হয়ে ওঠে। নানা ধরনের অভিযোগের স্রোতে পাগল হয়ে ওঠার অবস্থা হয়। একজন আমার ব্যাগ ছিনতাই করেছে। আমার জাহাজ আমাকে ফেলে রেখে চলে গেছে। অথচ আমার স্ত্রী জাহাজে রয়েছে। আমি একজন ফুটপাতের বিক্রেতার থেকে এই ঘড়িটা কিনেছিলাম। অথচ ঘড়িটায় কোন যন্ত্রপাতিই নেই। আমার প্রয়োজনীয় অত্যন্ত দরকারী ওষুধটা এখানকার কোন দোকানে নেই। সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যা। অন্তহীন অভিযোগের স্রোত। এমন সময় পুলিশ দফতরে ঢুকল ওরা দুজন। ক্যাপ্টেন কারো এবং দিমিত্রি কামিনস্কি। ওদের মুখে ঘটনার বর্ণনা শুনে ক্যাপ্টেন ডুরের গম্ভীর মুখ আরো ভার হলো। ওফ, তার কপালেই কি যত গন্ডগোল ঝুট ঝামেলাগুলো লেখা আছে। ঘটনার পুরো বিবরণ শুনে তিনি বললেন, তাহলে মৃতদেহ আপনারা জল থেকে তুলতে পেরেছেন? দিমিত্রি মাথা নাড়ে, হ্যাঁ স্যার। ক্যাপ্টেন কারো সাথে সাথে নৌকা বন্ধ করে দেন। তারই আপ্রাণ চেষ্টায় আমরা ওনাকে খুঁজে বের করে জল থেকে তুলতে পারি। যদিও তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। উনি মারা গিয়েছিলেন। তাহলে এখন আপনাদের সমস্যাটা কী? দিমিত্রি বিষণ্ণ গলায় বলে, কপাল জোরে ওনার মৃতদেহটা যখন উদ্ধার করতে পারা গেছে। আমরা তা দেশে নিয়ে যেতে চাই। এ ব্যাপারে দরকারী অনুমতির জন্যেই আপনার কাছে আসা। ডুরের মাথা নাড়লেন, তার কোন অসুবিধা হবে না।

একটা হলদে কাগজ টেনে নিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন। মৃতের নাম? হ্যারী স্ট্যানফোর্ড। তিনি হঠাৎ ঝলসে ওঠা চোখ নিয়ে দুই আগন্তুকের দিকে তাকালেন। কী নাম বললেন? বিখ্যাত শিল্পপতি, কোটিপতি, মিঃ স্ট্যানফোর্ড? দিমিত্রি মাথা নাড়ে। ক্যাপ্টেন ডুরের বুকে যেন গুনগুন সুর ওঠে। ভগবান তাহলে নির্মম একপেশে নন? মানুষের ভালও করেন। ভগবান প্রেরিত সেই আগামী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবিটা ক্যাপ্টেন ডুবের যেন স্পষ্ট

দেখতে পাচ্ছিলেন। মিঃ স্ট্যানফোর্ড আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুর খবর সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলবে, আর তার মধ্যমণি হবেন তিনি। পুরো ঘটনা নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব তার হাতে। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত হয়ে উঠতে চলেছেন তিনি। দিমিত্রি প্রশ্ন করে। মৃতদেহটাকে কত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারবেন আপনি? ক্যাপ্টেন ডুবের পূর্ণ দৃষ্টিতে ওদের দুজনের দিকে তাকালেন। পরিস্থিতিকে এখন নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে। ম্যানিপুলেট ইট ফর ইওর ম্যাক্সিমাম বেনিফিট। ভাল প্রশ্ন, এটাই আমিও ভাবছি। সাংবাদিকেরা, টিভি চ্যানেলগুলোর ক্যামেরা এসে পৌঁছাতে কত সময় নেবে? কতক্ষণ লাগবে? সাক্ষাৎকার। ক্যাপ্টেন ডুবের কি সাক্ষাৎকারে ইয়টের অধ্যক্ষকেও ডেকে নেবেন? না, না, মুখের মত ভাবনা। যশের আলোয়, প্রচারের উজ্জ্বলতর গৌরবে ভাগীদার আনবেন কেন?

ওদের দিকে তাকিয়ে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কাগজপত্র তৈরি করতে হবে। কিছু বিধি, কর্তব্য পালন করতে হবে। দেখা যাক কতো তাড়াতাড়ি করতে পারি। এসব ক্ষেত্রে তো তাড়াহুড়ো করা যায় না। তার এখন সময় চাই। যতটা সময় পারা যায় নষ্ট করতে হবে।

.

০৭.

সাইমন ফিৎজেরাল্ড। বয়স ছিয়াত্তর। ফিৎজেরাল্ড ল-অ্যাটর্নীর একমাত্র কর্তা। যার অধীনে ষাটজন আইনজীবী কাজ করেন। ফিৎজেরাল্ডের নোগা পাতলা চেহারা, ধবধবে

চুল, তরে মানতেই হবে বয়স এখনো সেভাবে দাঁত বসাতে পারেনি তার চেহারায়। এই মুহূর্তে তার মন প্রবল চিন্তায় দোদুল্যমান। দ্বিধায় আচ্ছন্ন। ব্যক্তিগত সচিবের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, মিঃ স্ট্যানফোর্ড যখন ফোন করেছিলেন; আমায় কেন তার দরকার কিছু উল্লেখ করেননি? না, স্যার, উনি শুধু সোমবার সকাল নটায় ওনার বাড়ীতে আপনাকে হাজির থাকতে বলেছিলেন! ঠিক আছে। মিঃ সোলানেকে একটু পাঠিয়ে দিন। স্টিভ সোলানে। এই সংস্থার সবচেয়ে উজ্জ্বল কর্মক্ষম, উদ্যমী, আইনবিদ কর্মী। মধ্য চল্লিশের স্টিভ সোলানে এই ফার্মের বিপদভঞ্জন। যে কোন পরিস্থিতিতে ঠেলে দেওয়া হোক না কেন, সে ঠিকই বের হয়ে আসবে। সংস্থার পক্ষে সর্বাপেক্ষা লাভজনক সওদা করে। স্টিভ ঘরে ঢোকে। আপনার তো এখন নিউ ফাউন্ডল্যান্ডে মাছ ধরার কথা। তাই নয় কি? ফিৎজেরাল্ড-এ মুহূর্তে ঠিক রসিকতার মেজাজে নেই। বসো স্টিভ। আমরা একটা গভীর সমস্যায় পড়েছি। স্টিভ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এ আর নতুন কথা কী? এটা হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের বিষয়। স্টিভ নড়েচড়ে বসে। হ্যারী স্ট্যানফোর্ড তাদের সবচেয়ে সম্মানজনক, দামী, গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্ট। কয়েক ডজন আরো আইন সংস্থা স্ট্যানফোর্ডের অন্য নানা কোম্পানীর আইনী পরামর্শের কাজ করে বটে। কিন্তু তারা ফিজেরান্ড ওর ব্যক্তিগত আইনী বিষয়ে পরামর্শ দেয়, কাজকর্ম করে, যেটা চরম গৌরবজনক। অন্যদের ঈর্ষার বিষয়।

–হুম, তা ব্যাপারটা কী? স্ট্যানফোর্ড মারা গেছেন। কি-ঈ-ই-ই। সোলানের গলা দিয়ে চেরা আওয়াজ ছিটকে আসে। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সাইমন ফিৎজেরাল্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু আগে করসিকার পুলিশ দফতর থেকে একটা ফ্যাক্স এসেছে। বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ স্টিভের দিকে তাকিয়ে ফিৎজেরাল্ড বলেন, তিরিশ বছর ধরে মানুষটাকে আমি চিনি। তুমি তো কখনো ওকে দেখনি, বুঝবে না। দ্বৈত স্বভাবের কী

নিপুণ মিশ্রণ। অমায়িক ভদ্র, শান্ত বিনয়ী মানুষটাই প্রয়োজনে হঠাৎ কেউটে সাপের মত হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। হ্যারী স্ট্যানফোর্ড ছিল একই সাথে সাপুড়ে আবার বিষাক্ত সাপও। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে স্মৃতিচারণে আবার ডুব দিলেন সাইমন ফিৎজেরাল্ড। ব্যবসায়ে ওর প্রতিদ্বন্দ্বীদের খতম করে দেওয়াটা ওঁর একটা বিষাক্ত নেশা ছিল। ওঁর উন্নতির পথে যারা কাটা ছিল ছলে-বলে কৌশলে তাদের ধ্বংস করতই। ওর এই খেলায় দেউলিয়া হতে বাধ্য হয়েছে, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে যে কতজন। আবার দেখো, ওই শয়তানী মনোবৃত্তির মানুষটাই অসংখ্য অনাথ আশ্রম চালাচ্ছে। এমন দ্বৈত অবস্থান একই মানুষের চরিত্রে আমি খুব কমই দেখেছি। স্টিভ সোলানে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল। ফিজেরাল্ড বললেন, তুমি গ্রীক পুরাণের অদিয়েপাস এর কাহিনী জানো তো? হ্যাঁ, মা-কে পাবার জন্য বাবাকে খুন করেছিল তো? ফিৎজেরাল্ড অদ্ভুত ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকালেন, হারী স্ট্যানফোর্ড তার বাবাকে খুন করেছিল মায়ের ভোট পাবার জন্য। ভাবতে পারো?

সোলানের মুখে কথা ফুটছিল না। কোনরকমে সে শুধু বলল, কি বলছেন আপনি? হ্যারীর বাবার ছিল মুদীর দোকান। বেশ বড় সড় ডিপার্টমেন্টাল দোকান বলা যায়। কলেজ ছাড়ার পরই হ্যারী কাজ নেয় সেই দোকানে। উদ্যমী উচ্চাকাঙ্খী হ্যারী ডিপার্টমেন্টাল মুদী দোকান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। সে চাইল, দোকানে বিক্রি হওয়া মাংস অন্য কসাইখানা থেকে না কিনে নিজের দোকানেই নিজস্ব কসাইখানা বানাতে। ফল শাক সবজী চাষীদের থেকে না কিনে নিজে জমি কিনে চাষ করতে। ওর বাবার এসবে মত ছিল না। প্রায়ই বিষয়টা নিয়ে দুজনের মধ্যে উত্তপ্ত তর্ক হতো। এর পরই স্ট্যানফোর্ডের মাথায় এলো সবচেয়ে আলোড়ন তোলা বৈপ্লবিক এক পরিকল্পনা। নিজেদের দোকানকে অতি আধুনিকতম ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের একটা চেইন বানাবার

কথা ভাবতে শুরু করে। একটা শৃঙ্খলে বাঁধা। ওদের কোম্পানির দোকানগুলো। যেসব দোকানে জীবন যাপনের জন্যে যাবতীয় যা কিছু প্রয়োজনীয় সবই পাওয়া যাবে। আলপিন থেকে গাড়ী। রুটি থেকে বৈদ্যুতিক উনুন। হ্যারীর বাবা শোনামাত্র প্রস্তাবটাকে খারিজ করে দিলেন। কিন্তু হারীর মধ্যে তখন থেকেই যা করতে চাইবে তা পেতে হবেই গোঁ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বাবার বাধা, তার উন্নতির পদে পদে বাধা হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে চতুর এক পরিকল্পনা করে সে। কৌশলে বাবাকে ভুলিয়ে দুরে পাঠিয়ে দেয়। ছুটি কাটাবার ছুতোয়। এবং বাবার অনুপস্থিতির সুযোগটায়, কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের হাত করে নিজের দিকে নিয়ে আসার কাজে লাগায়। ডিরেক্টরদের মধ্যে দুজন ছিল ওর কাকা ও কাকিমা। খুব সহজে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে নিজের পক্ষে নিয়ে আসে। ওকে কোম্পানির মালিকানা প্রদানের আইনী কাগজে সই করিয়ে নেয়। বাকি ডিরেক্টরদের ঘন ঘন দুপুরে খাবার খাওয়াতে নিয়ে যেতে থাকে। গলফ খেলার আমন্ত্রণ জানায়। শিকারে নিয়ে যায়–এবং, এসবের ফাঁকে ফাঁকে তাদের মগজ ধোলাই করতে থাকে।

এমন কী, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, স্বামীর ওপর প্রভাব ও পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে এরকম এক ডিরেক্টরের স্ত্রীর সাথে বিছানায়ও যায় পর্যন্ত। সেই ভদ্রমহিলাকে দিয়ে স্বামীকে নিজের কাজ হাসিল করার মতলবে। ফিৎজেরাল্ড থামেন, দম নেন। সোলানে ঢোক গেলে, অবিশ্বাস্য। ফিৎজেরাল্ড আবার বলতে শুরু করেন–হ্যারীর বাবা যখন ছুটি কাটিয়ে ফিরে এলেন তিনি দেখলেন, তারই বন্ধু-আত্মীয়রা সবাই তার ছেলের পেছনে দাঁড়িয়েছে। কোম্পানির মালিকানা কর্তৃত্ব থেকে হটিয়ে দিয়েছে তাকে। এমন কী নিজের স্ত্রীও। হ্যারীর মায়ের হাতেই ছিল সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শেয়ার। সুতরাং কোম্পানির মালিকানা বিষয়ে শেষ কথা বলবার ক্ষমতা, অধিকার শুধু তারই ছিল। হ্যারী তাকেও নিজের দলে

টানতে পেরেছিল। নিজেরই স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করাতে রাজী করতে পেরেছিল। তবে এখানেই শেষ নয়। এসব দেখে চূড়ান্ত হতাশ হ্যারীর বাবা যখন নিজের অফিসে ঢুকতে গেলেন, অফিসের ছাদ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া ফেলা হলো তাকে। মনে রেখো হারীর বয়স তখন তিরিশও ছোঁয়নি। বাবার মৃত্যুর পর পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে সেই ছোট্ট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটাকে একলার চেষ্টায় দেশের সর্ববৃহৎ ডিপার্টমেন্টাল চেইন বানিয়ে তুলেছে। নিজের একার ক্ষমতায় স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজ দেশের সবচেয়ে বড় কোম্পানিরগুলোর একটাকে গড়ে তুলেছে সে। কীসের ব্যবসা নেই ওর?

হ্যারী স্ট্যানফোর্ড কি বিবাহিত ছিলেন? স্টিভের প্রশ্নটায় সাইমন ফিজেরাল্ড আবার স্মৃতির গহনে ডুব দেন। হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের স্ত্রী এমিলি টেম্পল। সম্ভবত আমার দেখা সব চেয়ে সুন্দরী নারী। অসাধারণ রূপসী ছিলেন। ওদের তিন সন্তান হয়েছিল। বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য একজন সুন্দরী যুবতী গভর্নেস রাখা হয়েছিল, রোজমেরী নেলসন। হ্যারী তার আকর্ষণে জড়িয়ে পড়ল। অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। এবং তা আরো দুর্নিবার হয়ে, উঠল। কারণ রোজমেরী হ্যারীকে পাত্তাই দিত না। হ্যারীর সাথে বিছানায় যেতে কোন আকর্ষণ বোধ করেনি। হ্যারী না শুনতে অভ্যস্ত ছিল না, কেউ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তা কল্পনাই করতে পারে না। যে কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রোজমেরীর প্রতি তার আকর্ষণ আরো একশ গুণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। যেভাবেই হোক তাকে পাবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠল। নারী-মন জয়ে পটু প্লেবয় স্ট্যানফোর্ড এক সময় সত্যিই রোজমেরীর মন জিতে নিল। ওকে শয্যা সঙ্গিনীও বানালো। যার ফল হিসেবে গর্ভবতী হয়ে পড়ল সে। ওরা যে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, দুর্ভাগ্য ক্রমে তার নাতি ছিল এক সাংবাদিক। পুরো ঘটনাটাকে যথেষ্ট কেচ্ছাসহ তার কাগজে ফাঁস করে দিল সে। সারা শহর, বলা ভাল গোটা দেশ জুড়ে প্রবল আলোড়ন উঠল। হ্যারী

স্ট্যানফোর্ড শিল্পপতি, কোটিপতি ধনী হিসেবে তখনই সারা দেশে যথেষ্ট বিখ্যাত ছিল। তার চারিত্রিক অধঃপতনের কেচ্ছা জেনে সারা দেশের মানুষ আলোকিত হয়ে উঠল। সে এক বিশী স্ক্যান্ডাল।

স্টিভ দম বন্ধ করে শুনছিল। যেন কোন আধুনিক রূপকথা। ফিৎজেরাল্ড থামতেই সে প্রশ্ন করে, তারপর? তারপর কী ঘটল? সাইমন একটা গভীর শ্বাস ফেলেন। এমিলিও জানতে পারে সব কিছুই। এদিকে, রোজমেরী কিছুতেই গর্ভপাতে রাজী হয় না। স্ট্যানফোর্ড বারবার বোঝনোর চেষ্টা করে ওকে। ওকেই সে ভালবেসে বিয়েও করবে কিন্তু তার আগে গর্ভপাত করিয়ে নিতে হবে। বলাই বাহুল্য এ ধরনের কথা বহু মেয়েকে বহুবার বলেছে সে। এতে কোন সত্যি ছিল না। রোজমেরীকে বিয়ে করার কোন ইচ্ছেই তার ছিল না। শুধুই অবাঞ্ছিত গর্ভ এবং পিতৃত্বের দায় থেকে মুক্ত হবার জন্যই রোজমেরীকে ওসব কথা বলে চলেছিল দিনের পর দিন ধরে। সম্ভবত রোজমেরীও আঁচ করতে পেরেছিল তার প্রেমিকের মন, স্বভাব চরিত্র। তাই নিজের গোঁ থেকে নড়ল না। এদিকে একদিন স্ট্যানফোর্ড যখন রোজমেরীকে বোঝাচ্ছে, ভালবাসা প্রেমের আশ্বাস দিচ্ছে, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছে, হঠাৎ করেই আড়াল থেকে তা শুনতে পেয়ে যায় এমিলি টেম্পল। সে রাতেই সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এ ঘটনার পরই ঐ বাড়ী ছেড়ে চলে যায় রোজমেরীও। পরে জানা গিয়েছিল, ত্যরীকে সে এক চিঠি পাঠিয়েছিল–মিলউকীর সেন্ট জোসেফ হাসপাতালে সোফিয়া নামের একটি মেয়ের জন্ম দিয়েছিল রোজমেরী।

অবশ্য তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা ছিল না স্ট্যানফোর্ডের। রোজমেরীর মোহ কেটে ততদিনে অন্য নারীতে জড়িয়েছে সে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঘটল এরপর।

স্ট্যানফোর্ডের তিন সন্তানই তাদের মায়ের অকাল মৃত্যুর জন্য তাদের বাবাকে দায়ী করল। তাদের বয়স তখন দশ, বারো, চোদ্দো। বাবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই বা প্রতিবাদ করার পক্ষে বড়ই কম বয়স। কিন্তু অন্যায়টাকে ঠিকই চিহ্নিত করতে পেরেছিল তারা। বাবাকে তারা মনে প্রাণে ঘৃণা করতে শুরু করে। এই সময় থেকেই সন্তানদের আচরণ দেখে হ্যারীর মনে একটা চরম আতঙ্ক তৈরি হয়। তার সন্তানেরাও তার সাথে ঠিক তাই করবে। যা হ্যারী করেছিল নিজের বাবার সাথে। সুতরাং তারপর থেকেই তার একমাত্র চেষ্টা ছিল সেই ঘটনাকে আটকানো তা যাতে না ঘটে তার জন্য। যত কিছু করা সম্ভব সবই করেছিল। সে। ছেলেদের এবং মেয়েকেও আলাদা আলাদা বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয়। তারা যেন কখনো এক সাথে একজোট না হতে পারে। সেই ব্যবস্থা করা ছিল পাকাভাবে। ওর কোন টাকা পয়সাও ওরা পেত না। এমিলির সঞ্চিত অর্থের ভাগ থেকেই প্রতিপালিত হয়েছে। ওরা তিন ভাই। সামান্য সেই অর্থে অত্যন্ত দীনভাবে বড় হওয়া তিন ভাইবোনের জন্য তাদের বিখ্যাত কোটিপতি বাবা ঐ টুকুন বরাদ্দ করেছিল। স্টিভ সোলানে প্রশ্ন করে, ত্যারী স্ট্যানফোর্ডের ছেলে-মেয়েরা এখন কে কী করেন? সাইমন পড়ে থাকা ঝরা পাতা স্মৃতি যেন হাতে তুলে নেন। ভঙ্গীতে এতটাই সূক্ষ্মতর প্রবণতা। একটু কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বলেন, টাইলার স্ট্যানফোর্ড একজন বিচারপতি। যতদূর শুনেছি, জানি, উডরাও কিছুই করে না। প্লেবয় গোছের। এক সস্তা রেস্তোরাঁয় মহিলা পরিচারিকার সাথে প্রেম করতে গিয়ে তাকে গর্ভবতী করে বসে। বছর কয়েক আগের ঘটনা এটা। এবং সবাইকে অবাক করে ঐ মহিলাকে বিয়ে করে। বেনডাল নামী ফ্যাশান ডিজাইনার। নিউইয়র্কে থাকে। এক ফরাসী পুরুষকে বিয়ে করেছে। স্টিভ মাথা নাড়ে, সব তো বুঝলাম। এবার আমায় কী করতে হবে। ফিৎজেরাল্ড মাথা নাড়েন, হ্যাঁ এবার সেই কথা। তুমি আজই করসিকা চলে যাও।

স্ট্যানফোর্ডের মৃতদেহ এখন ওখানকার পুলিশের কজায়। গোটা ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছিল তুমি যাচাই করে দেখো। কোন ফাউল গেম আছে নাকি খতিয়ে দেখার দায়িত্বটাই তোমায় দিয়ে পাঠাচ্ছি।

.

স্টিভ সোলানে বিমানের জানালা থেকে দ্বীপ শহরটাকে দেখছিল। ছবির মত। ছবির থেকেও অনেক বেশি সুন্দর শহরটা। বিমান বন্দর থেকেই ট্যাক্সী ধরে সে পুলিশ সদর দফতরে হাজির হলো।বোনজুর রিসেপশন কর্মীটি তাকে স্বাগত জানালো। এখানে ইনচার্জ কে? ক্যাপ্টেন ডুবের। আমি ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সার্জেন্টটি ক্রু কুঁচকে বিরক্তির ভঙ্গী করে, কী ব্যাপারে দেখা করতে চান? স্টিভ তার কার্ড বের করে সার্জেন্টের হাতে দেয়। আমি হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের উকিল। তার মৃতদেহ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি আমি। সার্জেন্টটি ওকে বসতে বলে পিছনের একটি ঘরে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্টিভ চারপাশে তাকায়। অফিস ঘরটা ভীড়াক্রান্ত। হ্যারীর মৃত্যুর খবর ইতিমধ্যে যে বেশ চাউর হয়ে গেছে তার প্রমাণ হিসেবে ঘর জুড়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তের খবরের কাগজ, বেতার, টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকদের ভীড়।

ক্যাপ্টেন ডুবের-এর বহুদিনের সযত্নে লালিত স্বপ্ন এবার সত্যি সফল হতে চলেছে। পৃথিবীর এক কোণে, এক প্রান্তের, বিন্দুসম ছোট্ট পুলিশ থানার বড় কর্তা। এখন আন্তর্জাতিক স্তরে বিখ্যাত হবার মুখে। সার্জেন্ট তার সুখ স্বপ্নে বিঘ্ন ঘটাল। স্টিভ সোলানের কার্ড হাতে নিয়ে এবং তার আসবার কারণ জেনে ক্যাপ্টেনের কপালে বিরক্তির খাঁজ জমল। বলে দাও, আমি এখন ব্যস্ত আছি, দেখা করতে পারব না। কাল

সকাল দশটার সময় আসতে বলল। ঠিক আছে স্যার। সার্জেন্ট ফিরে যায়। সার্জেন্টের গমন পথের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন ডুবেরের চিন্তিত কপালের ভাজ আরো গম্ভীর হয়, না, তার খ্যাতির মুহূর্ত কেড়ে নেবার সুযোগ তিনি কাউকেই দেবেন না। এই লোকটাকে আটকাতে হবে। হারী স্ট্যানফোর্ডের মৃতদেহটিই হচ্ছে আপাতত তার একমাত্র অদ্বিতীয়ম মূল্যধন। এটাকে সহজে হাতছাড়া করা যাবে না। যতক্ষণ ঐ মৃতদেহ, বরফে জড়ানো কাঠ হয়ে যাওয়া জড় পদার্থটা তার কবজায় আছে, ততক্ষণ পর্যন্তই মধু লোভী মৌমাছির মত ঐসব সাংবাদিকগুলো তার চারপাশে ভন ভন করবে। তার আন্তর্জাতিক পরিচিতি যশের স্থায়িত্বও, ততক্ষণ, যতক্ষণ মৃত স্ট্যানফোর্ড তার সাথে আছেন।

এদিকে বাইরের অফিসে স্টিভ সোলানে বিস্ময় বিমূঢ় অবিশ্বাসের বিস্ফারিত চোখে সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাল সকালে? আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। বিকেলের উড়ানেই ফিরে যাবার কথা। সার্জেন্টটি শীতল দৃষ্টিতে তাকায়। স্টো আপনার সমস্যা। সোলানে কাঁধ ঝাঁকায়। ভবী ভুলবার নয়। তবু একটা শেষ চেষ্টা হিসেবে সার্জেন্টটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। কোন উপায়ই কি নেই? কোন ভাবেই কি...। একই রকম হিমশীতল চোখে ফিরে তাকায় পুলিশটি। এবার তার চোখে বিরক্তিও। বললাম তো, কাল সকাল দশটা। সোলানে রাস্তায় বের হয়ে আসে। এখানে থাকার পরিকল্পনা করে সে আসেনি। সুতরাং এখন প্রথমেই তাকে একটা ভাল হোটেল খুঁজে বের করতে হবে। বেশি খুঁজতে বাছতে হলো না। ৪, এভিনিউ ডি প্যারিস ঠিকানায়, রাস্তার ওপর, ছিমছাম, কোলামবা হোটেলটা তার পছন্দ হলো। হোটেলের ঘর থেকেই সোলানে অফিসে ফোন করল। সাইমন ফিজেরাল্ড উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষায় ছিল। তাকে বিস্তারিত জানালো পরিস্থিতি। আজকের রাতটা যে তাকে এখানেই কাটাতে হবে তাও জানিয়ে দিল। হোটেলের ঘরে নির্জন অবসরে এরপর হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে

শুয়ে সোলানে ভাবছিল। সাইমন ফিৎজেরাল্ড তাকে হ্যারী স্ট্যানফোর্ড সম্পর্কে যে সব কথা বলেছিল, তথ্য দিয়েছিল, সেগুলোকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল। রোজমেরী নেলসন নামের সেই মেয়েটা। এসব ভাবতে ভাবতে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ঠিক দশটায়, পুলিশ দফতরে হাজির হলো স্টিভ সোলানে। আজও সেই একই মুখ, সার্জেন্টটি স্টিভের সুপ্রভাত সম্ভাষণে মাথা ঝাঁকালে প্রত্যাভিবাদনে। ক্যাপ্টেন ডুবের-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছি। স্টিভ মনে করিয়ে দেয়। সার্জেন্ট মাথা নাড়ে। একটু বসুন। কালকের মতই পেছনের একটা ঘরে অদৃশ্য হয়ে যায় সে। পেছনের ঘরে ক্যাপ্টেন তখন একটি বিদেশী টিভি চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার দিতে ব্যস্ত। শটের ফাঁকে তার হাতে স্টিভের কার্ডটা গুঁজে দিতে সক্ষম হয় সার্জেন্ট। ক্যাপ্টেন বিরক্ত চোখে তার এই বোকা অধস্তনের দিকে তাকালেন। খেঁকিয়ে ওঠেন, তুমি কী হে? দেখছ না আমি কি রকম ব্যস্ত? যাও ওকে কালকে আসতে বলল গিয়ে। সার্জেন্ট মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে যায়। ক্যাপ্টেন আবার সাময়িক বন্ধ ক্যামেরার দিকে ফিরে তাকান। তিনি জানতে পেরেছেন পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আরো কয়েক ডজন খবরের কাগজ এবং টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকেরা আসছে তার কাছে। এমন কি সুদুর নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও। এই সময়ে হত্যারী স্ট্যানফোর্ডের উকিলের সঙ্গে কথা বলা বা সময় দেবার অর্থই তার মূলধন অর্থাৎ স্ট্যানফোর্ডের মৃতদেহটি হাত ছাড়া করার ঝুঁকি নেওয়া। যার কোন ইচ্ছেই তার নেই।

বাইরের অফিস ঘর। এখন উনি দেখা করতে পারবেন না? প্রায় স্বগতোক্তির মত শোনায় সোলানের গলা। রোজই তো ক্যাপ্টেনকে নানা রকম দায়িত্ব সামলাতে হয়। ব্যস্ততা চরম ওনার। তাহলে কখন দেখা হবে? আমার মনে হয় কাল দুপুরের আগে উনি

সময় দিতে পারবেন না। কাল দুপু-র? সোলানের সামনে ক্যাপ্টেনের চরম ব্যস্ততার কারণ এবং ছবিটা তখন স্পষ্ট এবং পরিষ্কার হচ্ছে। সে সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি শুনেছি, স্ট্যানফোর্ডের মৃত্যুর ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আছে। হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী কামিনস্কি। সে এখন কোথায়? অস্ট্রেলিয়ায়। এই হোটেলটা কোথায়? দুঃখিত স্যার। ওটা হোটেল নয়, এটা দেশ। সোলানে বিমূঢ় হতবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। ওর মুখে কথা ফোটে না, তার...মা...মানে আপনি বলতে চান ঘটনাটির একমাত্র সাক্ষী প্রত্যক্ষদর্শীকে আপনারা ছেড়ে দিয়েছেন? চলে যেতে দিয়েছেন? কেউ তার সঙ্গে কথা বলা বা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন? তার মনে হয়েছে ঘটনাটার সঙ্গে লোকটির কোন সংস্রব বা যোগাযোগ নেই।

হোটেলে ফেরার পথে রাস্তার পাশে খবরের কাগজের স্টলে তার চোখ পড়ল ইন্টার ন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের প্রথম পাতাতেই চার কলম জুড়ে শিরোনাম–স্ট্যানফোর্ড ব্যবসা সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত কী এরপর? সঙ্গে বিস্তারিত খবর। সোলানে এগিয়ে গেল। কাগজটা তুলে নিয়ে দাম মেটাবার সময়েই তার নজর পড়ল, স্টলে ঝুলন্ত দেশী বিদেশী সব রকম সংবাদ পত্রের প্রথম পাতাতেই হারী স্ট্যানফোর্ডের খবরের জোরালো তীব্রতর উপস্থিতি। এবং প্রতিটি খবরের রিপোর্টের সঙ্গেই ক্যাপ্টেন ডুবের-এর এক ঝকঝকে উজ্জ্বল ছবিসহ সাক্ষাৎকার। সোলানে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল। এটাই তাহলে ক্যাপ্টেনের–ব্যস্ততার কারণ? সোলানের দুচোখ জ্বলে ওঠে। ঠিক আছে...সেও দেখে নেবে। কাটা দিয়েই তাহলে কাটা তুলবে। হোটেলে ফিরেই ফিৎজেরাল্ডকে ফোন করল সে। এখানকার পরিস্থিতি বিস্তারিত ভাবে জানালো। নিজের পরবর্তী পরিকল্পনার কথাও সে জানালো।

পরের দিন সকাল পৌনে দশটা। পুলিশ দফতরে পৌঁছেই সোলানে দেখতে পেল যে, রিসেপশন ডেস্কে সার্জেন্টটি তার জায়গায় নেই। এরকম আচমকা পাওয়া একটা সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করল না। ক্যাপ্টেনের অফিসের অর্থাৎ পেছনের ঘরের খোলা দরজা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ফাঁকা অফিস ঘরে ক্যাপ্টেন তখন একা। ক্যাপ্টেন সম্ভ্রম চোখে তাকালেন। আমি আসছি দি নিউইয়র্ক টাইমস কাগজ থেকে–সোলানে বলে। নিমেষে ডুবেরের মুখচোখ উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে,–ওহ আসুন, আসুন। ভদ্রমহোদয়ের নামটা জানতে পারি কি? ডুবেরের গলায় বিনয় মেশা অ্যাপায়নের সুর। সোলানে নির্বিকার মুখে বেবাক মিথ্যে বলে, জোনস। জোহান জোনস। মহোদয় কী নিতে পছন্দ করবেন? কফি? নাকি কনিয়াক বলব? সোলানে হাত নাড়ে, কিছু না। কিছু না, আমি কয়েকটা অতি দরকারী গুরুত্বপূর্ণ কথা জানতে এসেছি আপনার কাছে। ডুবের মাথা দোলাল, জানি, নিশচয়ই মশিয়ে স্ট্যানফোর্ডের ব্যাপারে। সত্যি আমাদের এই ছোট্ট দ্বীপে এরকম একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল, ভাবা যায় না। হাতে সময় খুবই কম। সোলানে সরাসরি দরকারী কথায়, তার প্রয়োজনীয় বিষয়ে ঢুকে পড়ে। মৃতদেহটি কবে আপনারা ছাড়বেন। ক্যাপ্টেন একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। আপাতত বেশ কিছুদিনের মধ্যে সেটা সম্ভব । হবে না। বহু নিয়ম কানুন বহু কাগজ পত্র...সহজে সব হয় কী? বহু সময়ের ব্যাপার। বহুদিন লাগবে। যতদিন না সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর ক্ষিধে পুরোপুরি মিটছে। আমার ছবি সাক্ষাৎকারের পুরো প্রয়োজন মিটছে। ততদিন... ক্যাপ্টেন ডুবের শেষ হয়ে যাওয়া কথার খেই ধরেই আবার প্রায় স্বগতোক্তির মত বলেন–হয়তো দশদিন। কিম্বা পনেরো দিনও হতে পারে।

সোলানে এবার পকেট থেকে নিজের কার্ডটা বের করে এগিয়ে দেয়। এই যে আমার কার্ড এটা, আসল কার্ড। সেটার দিকে তাকিয়েই ক্যাপ্টেন নড়ে চড়ে ওঠেন। প্রায়

তড়িতা হতের মতই ছিটকে ওঠেন–আপনি রিপোর্টার নন? উকিল? হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের অ্যাটর্নী আমি। তার মৃতদেহ নিয়ে যেতে এসেছি। কাল সেটা আমি নিয়ে যাব। ক্যাপ্টেন সহানুভূতির ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলে বলেন, সত্যি যদি তা আমি পারতাম। কিন্তু আমার দুহাত বাধা। দুভার্গ্যজনক ভাবে আমি কোন উপায়ই দেখতে পারছি না। কাল, কালই নাহ, অসম্ভব। সোলানে সোজা চোখে তাকায়। ক্যাপ্টেনের চোখে চোখ রেখে কর্তৃত্বের গলায় বলে, আমার মনে হয়, আপনার এক্ষুনি প্যারিসে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা ব্যবস্থা করা উচিত। এদেশে আমাদের সংস্থার বেশ কয়েকটি দফতর, কারখানা রয়েছে। এরকম একটা বিষয়ে যদি আমরা ক্ষোভের বশে সেসব কলকারখানা, দফতরগুলো বন্ধ করে দিই–এ দেশের সরকারের পক্ষে সেটা চরম লাভজনক ব্যাপার হবে কী? ক্যাপ্টেন অসহায় ভঙ্গী ফোঁটাবার চেষ্টা করেন, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমার নেই। সোলানে উঠে দাঁড়ায়, ঠিক আছে। আমি তাহলে সেটাই আমার মালিককে জানাচ্ছি। এবং আমার সংস্থা মারফৎ আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং এদেশের সরকার জানতে পারবে যে আপনার গাফিলতি, কর্তব্য অবহেলার কারণেই স্ট্যানফোর্ড সংস্থা এদেশ থেকে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। নিতে বাধ্য হয়েছে এবং তাতে দেশের কোটি কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে...।

সোলানে দরজার দিকে এগোতে থাকে। মিশিয়ে দাঁড়ান। হয়তো কয়েকদিন সময়... ক্যাপ্টেনের গলায় বিপন্নতা। কাল, আমি দেখতে চাই কাল সকালে শ্রী স্ট্যানফোর্ডের মৃতদেহকে খালাস করে দেওয়া হয়েছে। দরজা দিয়ে বের হয়ে যায় সে, ক্যাপ্টেন ডুবের এর অসহায়তা মাখা বিপন্ন মুখের দিকে দৃকপাত না করেই।

পরের দিন বিকেলে স্টিভ সোলানে স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের নিজস্ব বিমানে হারী স্ট্যানফোর্ডের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে এসে লোগন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নামল। বস্টনের আকাশে তখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ঘন সন্ধ্যা।

.

০৮.

জজ টাইলার স্ট্যানফোর্ড। টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে তার সারা শরীরে এক ঘন কাপুনি জাগল। ডবলিউ বি বি এম চ্যানেলে নিউজ বুলেটিনে দেখাচ্ছিল, ছবি...শব্দ...কথা...শ্রী স্ট্যানফোর্ডের নীল আকাশ ইয়টটি করসিকান দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্রে এক বিধ্বংসী ঝড়ের মুখোমুখি হয়। দুভার্গ্যজনক ঘটনাটির সাক্ষী ছিলেন শ্রী স্ট্যানফোর্ডের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দিমিত্রি কামিনস্কি। তার চোখের সামনেই...।

পর্দায় দ্রুত নড়ছে চড়ছে, সরে যাচ্ছে প্রতিচ্ছবি, এসে পড়ছে নতুন প্রতিচ্ছবি। চলমান দ্রুত পরিবর্তনশীল সেই ছবির দিকে তাকিয়ে শুন্য প্রায় বোধহীন মগজে বসে থাকতে থাকতে জজ টাইলারের মস্তিস্কে ফিরে আসছিল স্মৃতি, সার সার স্মৃতি।

একটা ভরাট গলার চড়া চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। গভীর রাত, চোদ্দ বছর বয়স তখন তার। রাগী চড়া গলার স্বরটাকে কয়েক মিনিট ধরে শুনল সে। তারপর প্রায় নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেলো, বাইরের ঘরে সিঁড়ির ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে বাবা আর মা ঝগড়া করছে। তর্ক-বিতর্ক

করছে। মা উন্মত্তের মত চিৎকার করছে। বাবা এলোপাথাড়ি চড় মারছে মায়ের মুখে গালে।

টেলিভিশনের ছবিতে, হ্যারী স্ট্যানফোর্ড, হোয়াইট হাউসকে পশ্চাৎপট হিসেবে রেখে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ-এর সঙ্গে করমর্দন করছেন। হ্যারী স্ট্যানফোর্ড ছিলেন প্রেসিডেন্টের আর্থিক পরামর্শদাতাদের বিশেষ দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তার পরামর্শকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট...। ।

ওরা বাড়ির বাগানের চত্বরে ফুটবল খেলছিল। ছোট ভাই উডির মারা বলটা বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিল। টাইলার বলটা আনতে বাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। একতলায় বাবার পড়ার কাজকর্মের ঘরের জানালার ঠিক নিচে বলটা পড়েছিল। বলটা যখন সে কুড়িয়ে নিচ্ছে, খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসা বাবার গলার স্বর শুনতে পেল–আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি জানো না আমি তোমায় কতটা ভালবাসি। টাইলার রোমাঞ্চিত হয়েছিল। বাবা-মায়ের ভাব হয়ে গেছে জেনে খুশি হয়েছিল। ঠিক তখনি তার কানে আসে, তুমি ভাল। এসব কিছুতেই সম্ভব নয়। তুমি বিবাহিত। সন্তানের বাবা। রোজমেরী, তাদের গভর্নেসের গলা। আচমকাই তার সারা শরীর গুলিয়ে তীব্র বমিভাব জাগল। মাকে সে ভালবাসত। হ্যাঁ, ভালবাসে রোজমেরীকেও। বাবা অনেক দূরের মানুষ ছিল। এ মুহূর্তে তাকে আরোও আতঙ্কজনক অচেনা ঠেকেছিল।

টেলিভিশনের ছবিতে এখন ফাইল সট। বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে, নানা সময়ে হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের নানা প্রতিক্রিয়া নানা অভিব্যক্তি নানা সময় নানা জায়গার ছবি। কে নেই

সেই লম্বা তালিকায়? মিতের..গরবাচভ...থ্যাচার...প্রবাদ প্রতিম বাণিজ্য সম্রাট বিভিন্ন সময়ে নানা বিশ্বনেতার অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। ঘোষকের বিষাদ কণ্ঠ শোনা গেল।

এক মাঝরাতে তীব্র ঝাঁকুনিতে ওর ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ খুলেই মুখের ওপর ঝুঁকে থাকা বাবার মুখ দেখতে পেলো। টাইলার ওঠো তাড়াতাড়ি। একটা খারাপ খবর আছে। তোমার মা মারা গেছেন। চোদ্দ বছরের বালকের শরীরটা প্রচণ্ড আতঙ্কে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। বাবা বলেছিল এটা দুর্ঘটনা। কিন্তু ও জানত তা মিথ্যে। বাবা খুন করেছিল মাকে। বাবাই দায়ী ছিল। বাবা আর রোজমেরীর সম্পর্কের জন্যেই মাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। সে এক চরম কেচ্ছা। সারা বস্টনে ছড়িয়ে পড়েছিল, সবাই জেনে গিয়েছিল ঘটনা। বেশ কয়েকদিন ধরে খবরের কাগজের পাতায় পাতায় শিরোনাম ছিল ঘটনাটা। এর ওপর ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো সত্যি মিথ্যের চাটনি বানিয়ে মুখরোচক রসালো কুৎসা কেলেঙ্কারী-কেচ্ছাময় করে ছাপছিল ব্যাপারটাকে। গর্ভবতী রক্ষিতা ছেলেমেয়ের গভর্নেস, কোটিপতি শিল্পপতি স্ত্রীর আত্মহত্যা। স্কুলের বন্ধুরা এসব নিয়ে টিটকিরি ঠাট্টা, অসহ্য হয়ে উঠেছিল জীবন। মায়ের মৃত্যুর পরই রোজমেরীও বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। একুশ ঘণ্টার মধ্যে দুই কিশোর এবং বালিকাটি হারালো তাদের ভালবাসার দু-দুজন প্রিয়তমাকে। বাবার জন্যই দুজনকেই হারাতে হলো।

আমি বাবাকে ঘেন্না করি। চাপা গলায় কাঁদতে কাঁদতে বলল বেনডাল, আমিও, উডরোও বলে। সায় দেয় টাইলার, আমিও। বাস্তবিকই ওদের তিন জনের মধ্যে সেই বয়স থেকে অথবা সত্যি বললে তার বহু আগে থেকেই বাবার প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধ প্রোথিত হয়েছিল। শিকড় ছড়িয়েছিল মনের গহনে। ওরা পালিয়ে যাবে বাড়ী থেকে ঠিক করে। কিন্তু তার পরই ওদের মনে হয়েছিল, কোথায় যাবে পালিয়ে, শেষ পর্যন্ত ওরা ঠিক করে বিদ্রোহ

করবে। প্রতিবাদ করবে। একদিন খাবার টেবিলে সবচেয়ে ছোট বেনডাল, যার তখনো বুদ্ধি পরিণত হয়নি, বলে ফেলে, আমাদের তোমাকে ভালে লাগে না। আমরা অন্য বাবা চাই। হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের আঙুলে হাত কাটা ছুরি থেমে গিয়েছিল। শীতল চোখে তিন কিশোর বালিকা ছেলেমেয়ের মুখের দিকে পর্যায় ক্রমে কয়েকবার চোখ রাখলেন। তারপর কাটাকাটা বরফ ঠান্ডা গলায় বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। আমি ব্যবস্থা করছি সেরকম কিছুর। সম্ভবত সন্তানদের মনের তীব্র বিদ্বেষের আঁচ তিনিও অনুমান করতে পেরেছিলেন। এর তিন সপ্তাহ পরেই ওদের তিনজনকে আলাদা আলাদা তিনটি বোডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দিন-মাস-বছর কেটে যেতে লাগল, বাচ্চারা তাদের বাবার দেখা খুব কমই পেতো, খবরের কাগজে পত্র-পত্রিকায় ওরা বাবার সম্পর্কে পড়ত। টেলিভিশনে তাকে দেখত। তাদের কৈশোর পিতৃসঙ্গহীন, নির্বাসিত ছিল।

টাইলার সম্মোহিতের মত দেখছিল। টেলিভিশনের পর্দায় এখন স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজ এর ব্যবসা-সাম্রাজ্যের নানা জায়গীরের ছবি। কারখানা অফিস, সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের ব্যবসা সাম্রাজ্যের মনতাজ। হ্যারী স্ট্যানফোর্ড নিজেকে প্রবাদপ্রতিম বানিয়ে তোলার পথে যা যা, যেসব কিছুকে সৃষ্টি করেছিলেন, টাইলার মুগ্ধ বিস্ময়ে শিহরিত দৃষ্টিতে দেখছিল। ওয়াল স্ট্রীটের বিশেষজ্ঞদের মনে এখন বড় প্রশ্ন কৌতূহল হয়ে দেখা দিয়েছে। এর পর কী? পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ পরিবার নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা সংস্থার ভাগ্য এবার কোন পথে এগোবে? যখন, প্রতিষ্ঠাতা চলে গেছেন? হ্যারী স্ট্যানফোর্ড যদিও তিন সন্তান রেখে গেছেন। কিন্তু এখনো জানা যায়নি স্ট্যানফোর্ড যে হাজার কোটি ডলারের সম্পত্তি রেখে গেছেন তার উত্তরাধিকারী কে হবে? কে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পাবে স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের? ঐ তুমুল সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে কার জন্যে?

তার বয়স তখন ছয় বছর। বালকোচিত কৌতূহল উৎসাহেই সারাটা বাড়ি ঘুর ঘুর করে বেড়াত। একমাত্র বাবার কাজের ঘরটাতে ঢোকার অধিকার বাবা ছাড়া আর কারো ছিল না। বালক টাইলার দেখত, কালো ধূসর বাদামী নানারঙের কোট পরা সুসজ্জিত নানা ধরনের মানুষেরা আসত। ঐ ঘরে ঢুকতো, বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলত, কাজ সারতো, তার পর চলে যেত। যেহেতু ঐ ঘরে ঢোকার অধিকার ছিল না সে কারণেই ঘরটা তার মনে অপ্রতিরোধ্য এক আকর্ষণ তৈরি করেছিল। মাঝে মাঝে ভোলা দরজা দিয়ে বাবার চেয়ারটা নজরে পড়ত। ছড়ানো টেবিলটার পেছনে বিশাল চামড়া মোড়া চেয়ারটা, যা তাকে দুর্নিবার আকর্ষণে চুম্বকটান মারত। একদিন আমি বাবার মত গণমান্য মানুষ হয়ে উঠব। একদিন ঐ চেয়ার আমার হবে। আমি বসব ঐ চেয়ারে। শিশুমনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। একদিন বাবা বাড়ী ছিল না। দরজাটা খোলা পেয়ে সে ঘরটায় ঢুকে পড়ে। পুরোপুরিই অফিস ঘর একটা, প্রথামাফিক। পুরো ঘরটা ঘুরে দেখার পর একসময় বাবার চেয়ারটায় উঠে বসে। আহ, আমিও এখন একজন গুরুত্বপূর্ণ, গণ্যমান্য মানুষ। এক উজ্জ্বল গর্বে ফুলে ওঠে তার বুক। টেবিলের দেরাজগুলো টেনেটেনে খুলে দেখতে থাকে। শুধু মাত্র কাগজপত্রে সব দেরাজ তাকগুলো ভরা। কি হচ্ছেটা কি? এখানে তুমি কি করছ? টাইলার চমকে ফিরে তাকায়। ঘরের দরজায় বাবা দাঁড়িয়ে। কে তোমাকে বলেছে তুমি ঐ চেয়ারটায় বসতে পারো? বাবার মুখ রাগে টকটকে রক্তবর্ণ। টাইলার কথা খুঁজে পায় না। কাঁপতে থাকে।–আ...আমি... এমনি বসেছিলাম...কেমন লাগে... বাবা রাগে কাঁপতে কাঁপতে ওকে হিড়হিড় করে টেনে নামায় চেয়ারটা থেকে। তুমি, তোমরা কোনদিন জানতে পারবে ঐ চেয়ারে বসতে কেমন লাগে। বুঝেছ? এখন দূর হয়ে যাও। আর এ ঘর থেকে দূরে দূরে থেকো। না হলে...।

কান্নায় ভেঙে পড়ে টাইলার মায়ের কোলে গিয়ে আছড়ে পড়ে। মা ওকে সান্ত্বনা দেন। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে উঠতে টাইলার বলে, আমি কিছু করিনি, শুধু চেয়ারটাতে বসেছিলাম। মা বলেন, আসলে ওটা ওঁর চেয়ার, ওঁর একার, কেউ ওটায় বসুক, সেটা উনি সহ্য করতে পারেন না। তবুটাইলারের কান্না থামছিল না। তখন মা ওকে আরো কাছে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, টাইলার তোমার বাবা যখন আমায় বিয়ে করেন, তখন তিনি আমায় বলেছিলেন আমায় তার কোম্পানির অংশীদার করে নিতে চান। তিনি আমাকে একটি শেয়ার দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা রসিকতার মতই। সেই শেয়ারটি তোমায় দিয়ে দেব আমি। তাহলে তুমিও কোম্পানীর একজন হতে পারবে, কি খুশি তো? এবং, সত্যি তার নিজের শেয়ারটি ওকে দিয়ে দিয়েছিলেন। স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের অজস্র শেয়ারের একটির গর্বিত মালিক হয়ে উঠেছিল সে। পরে ব্যাপারটা জানতে পেরে বাবা ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তুমি কী ভাবো? ঐ একটা শেয়ার নিয়ে কী করবে? কোম্পানি টেক ওভার?

স্মৃতি থেকে আবার বাস্তবে ফিরে আসে টাইলার। কী জানি এক স্বস্তিবোধ পরিপূর্ণতা ওকে এ মুহূর্তে তৃপ্ত করে। ঐতিহ্যগত ভাবে পুত্র সফল হয় বাবাকে খুশি করার, গর্বিত করার জন্যে। টাইলার প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সফল বানিয়ে তুলেছে। তার নিজের বাবাকে ধ্বংস করার জন্য। শিশু বয়স থেকে তার মনে স্থায়ী হয়ে গেড়ে বসেছে এক তীব্রতর কল্পনা। তার মাকে খুনের অভিযোগে বাবার মৃত্যুদণ্ড জারী করবে সে। তারই আপোষহীন কলম। প্রতিশোধকাম জর্জর শব্দমালায় সে লিখবে বাবার, তারই জনকের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা–আমি আসামীকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিচ্ছি। আহ গোপন স্বপ্নটা প্রায় বাস্তব সত্যি হয়ে উঠেছিল।

মিলিটারি স্কুলের কঠোর শৃঙ্খলা নিয়মের বাধন, অসহ্যকর হয়ে উঠেছিল। চোদ্দ বছরের জীবনে সে কখনো নিয়ম বাধা শৃঙ্খলা পছন্দ করেনি। সে ভাবে চলেনি। কিন্তু স্কুলের কর্তৃপক্ষ তার ওপর অত্যন্ত কড়া নজর জারী রাখতেন। টাইলার নিশ্চিত, বাবার গোপন নির্দেশ ছিল এ ব্যাপারে। স্কুলের প্রথম বছরটিতে বার কয়েক আত্মহত্যা করার কথাও মনে হয়েছিল তার। কিন্তু নিজেকে দমন করত সে। না, এই সুখ আনন্দটা বাবাকে সে দেবে না। তাছাড়া মায়ের মৃত্যুর শোধ তাকেই নিতে হবে। স্কুল শেষ করে সে যখন আইন কলেজে ভর্তি হলো, বলাই বাহুল্য, ও তখন প্রাপ্তবয়স্ক। বাবার ইচ্ছের ধার ধারে না। সে খবর জেনে বাবার প্রতিক্রিয়া ছিলো–ওহ তুমি কী ভেবেছ? আইনবিদ হবার পর আমি তোমায় আমার কোম্পানিতে নেবো? আইনবিদের দায়িত্ব দেবো? ভুলে যাও। সেরকম কোন আশা ভুলেও মনে এমো না। আমার কোম্পানিগুলোর একশো মাইলের মধ্যে আমি তোমায় আসতে দেবো না।

জজ টাইলারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তার সহকর্মীরাও বিশেষ কিছু জানে না। কর্মক্ষেত্রে তাঁর অতি বেশি কড়া হিসেবে সুনাম ও কুখ্যাতি। তিনি মনে করেন, অপরাধ মাত্রই কঠোর শাস্তিযোগ্য। এক্ষেত্রেও তার অবচেতনে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে বাবার প্রতি, বাবাকৃত সেই অপরাধের প্রতি বিদ্বেষ। প্রতিটি অপরাধের মধ্যেই যেন বাবার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পান তিনি। সারা দিন ধরে অপরাধী পক্ষের আইনবিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের নানা যুক্তিজাল, কাকুতি, দয়াভিক্ষা শোনেন তিনি। তারপর রায় দেবার সময় সব উড়িয়ে দেন। অপরাধীর কঠোর কঠিন সাজা হয়। এ কারণে অপরাধী মহলে তার ডাক নাম কুখ্যাতি ছড়িয়েছে ফাঁসুড়ে জজ। ব্যক্তিগত জীবনে তার বিবাহটি তিক্ত অভিজ্ঞতা। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং তারপর থেকে তিনি একাই থাকেন। বাধা নিয়মে জীবন কাটান তিনি।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসব জমায়েতে সহকর্মীদের স্ত্রীরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়। ওরা জানে তিনি একক পুরুষ। কেউ কেউ পরস্ত্রী বন্ধুপত্নীরা নিজেরা টাইলারের সঙ্গে জড়াতে আগ্রহ দেখায়। কেউ কেউ অবিবাহিতা বান্ধবী বা আত্মীয়দের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে উৎসুক হয়। কিন্তু টাইলার এড়িয়ে যান। কেউ তাকে রাতের খাওয়া খেতে ডাকে। কেউ বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানায়। নানা ছুতোয় টাইলার সেসব এড়িয়ে যান। টাইলারের এক আইন ছাড়া অন্য আর কোন কিছুতে উৎসাহ নেই। এক আইনবিদ বন্ধু তার স্ত্রীকে কথাটা বলে। এবং এও বলে টাইলারের বিয়েটা মর্মান্তিক হয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর আর কোন নারীর সঙ্গে আবেগঘন সম্পর্কে জড়াবেন না নিজেকে। কিন্তু, হঠাৎ একদিন লি-এর সঙ্গে পরিচয় হলে তার। এবং প্রায় নিমেষে ঝড়ের মত সব কিছু বদলে গেল তার। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো লি-কে পাওয়া। সুন্দরী অনুভূতি প্রবণ এবং ভালবাসাময়। লি এমন এক নারী বাকি জীবনটা যার সঙ্গে কাটাতে তার ভালবাসা পেতে উতলা হয়ে উঠল টাইলার।

সমস্ত মন প্রাণ আবেগ দিয়ে লিকে ভালবাসেন টাইলার। কিন্তু লি কেন তাকে ভালবাসবে? একজন সফল মডেল লি-এর প্রচুর ভক্ত গুণমুগ্ধ আছে। এবং তারা প্রায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত ধনী এবং লি দামী উপহার বিলাস পছন্দ করে বললে কমই বলা হবে। সুতরাং, টাইলার নিজের কোন আশাই দেখেননি। লি-এর ধনকুবের স্তাবক প্রেমিকদের সঙ্গে দৌলতের প্রতিযোগিতায় পাল্লাবাজি লাগিয়ে লিয়ের নজর প্রেম দৃষ্টি কাড়বার কোনরকম সুযোগ বা ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। কিন্তু রাতারাতি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। মৃত বহু বিলিয়নের মালিক বাবার পুত্র হিসেবে তার সামনে এখন তার কল্পনার ও দুঃসাধ্য দৌলতের মালিক উত্তরাধিকারী হবার সুযোগ, হাতছানি। * সেই

বিকেলে, বস্টনগামী বিমানের উড়ানের যাত্রী জজ টাইলার স্ট্যানফোর্ডের বারবার মনে পড়ছিল। তার সঙ্গে বাবার শেষ কথোপকথন। তাকে বলা বাবার শেষ কথাটি। শব্দগুলো–জানি আমি তোমার নোংরা গোপনীয়তা।

.

০৯.

মধ্য জুলাইয়ের গ্রীষ্ম। দুপুর জুড়ে প্যারিসে তখন তুমুল বৃষ্টি। বিব্রত পথচারীরা দ্রুত মাথা বাঁচানোর আশ্রয় খুঁজতে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছে। কেউ কেউ ট্যাক্সির খোঁজ করছে। যা নাকি তখন বিলুপ্ত কোন প্রাণীর মতই বিরল প্রায়। রু ফাবর্গ স্ত্রী অনরেতে বিশাল একটি ধূসর রঙা বাড়ীর একতলার প্রেক্ষাগৃহে তখন যাকে বলা যায় চরমতম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। ডজন খানেক প্রায় নগ্ন মহিলা মডেল উদভ্রান্তের মত মঞ্চের পেছনের অংশটাতে দৌড়াদৌড়ি করছে। কর্মীরা কেউ কেউ চেয়ারগুলো প্রেক্ষাগৃহে পেতে সাজিয়ে দিতে ব্যস্ত। ছুতোরেরা কাঠের কাজের শেষ তৎপরতায় ব্যস্ত। প্রত্যেকেই ব্যস্ত ভঙ্গীতে চেঁচাচ্ছে। এদিক থেকে ওদিকে দৌড়াচ্ছে। নিজের কাজ শেষ করার মরীয়া চেষ্টা করছে। এবং চারপাশের প্রায় মুচ্ছগ্রস্ত উদ্ভ্রান্তের ব্যস্ততার মধ্যে একজনই সমস্ত কিছুতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার মরীয়া চেষ্টা করে চলেছিলেন অনুত্তেজিত ভাবে। তিনিই এই অনুষ্ঠানের আয়োজক। এক পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে সংগঠিত করার চেষ্টা করতে করতে বেনডাল স্ট্যানফোর্ড রেনর ভাবছিলেন, ফ্যাশান শো শুরু হতে আর মাত্র চার ঘন্টা বাকি। অথচ প্রকৃতি থেকে শুরু করে প্রেক্ষাগৃহের শব্দ ব্যবস্থা সবই তার সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা অসহযোগিতা করছে। হাতের সিগারেটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষলেন বেনডাল।

বেনডাল স্ট্যানফোর্ড রেনরকে অনায়াসে একজন মডেল বলে ভুল করতে পারে যে কেউ। অবশ্য একটা সময়ে বেনডাল নিজেও মডেল ছিলেন। প্যারিসের ফ্যাশান জগত মনে করত তার অনিন্দ্য দেহবল্লরীতে যে কোন পোশাকই অসাধারণ খাপ খেয়ে মানাত অনেক অনেক বেশি। শুধুমাত্র একজন মডেল হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। এই বিশ্বাস মনে প্রাণে ছিল তার। এই মুহূর্তে চরকির মত পাক খেতে খেতে, সহকারীদের নানা আদেশ দিতে দিতে, মডেলদের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দিতে দিতে, মেকআপ ম্যানদের দ্রুত কাজ সারার মেয়েদের তৈরি করে দেবার জন্য আদেশ দিতে দিতে সেই চরম ব্যস্ততার ফাঁকেও বেনডাল মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন। সারা পারিপার্শ্বিক একবার নজর বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। সারা পৃথিবীর ফ্যাশান জগতের বিশিষ্টরা আজ এখানে তার, বেনডাল স্ট্যানফোর্ড রেনর-এর সৃষ্টিকে তারিফ করার জন্য হাজির থাকবে। হ্যাঁ, তাঁর কাজ তার সৃষ্টি যে উচ্চ প্রশংসিত হবেই, সে আত্মবিশ্বাস তার চরম ভাবেই আছে। ধন্যবাদ বাবা। এই সাফল্য আমি তোমায় উৎসর্গ করছি। তোমার নির্দয় অবহেলা উপেক্ষা ছাড়া বোধ হয় আমি এত বড় হতে এতটা এগোতে পারতাম না। তুমি বলেছিলে, আমি কোন দিন সাফল্য অর্জন করতে পারব না। ধন্যবাদ বাবা, তোমার ঐ উপেক্ষা অনুপ্রেরণাহীনতাই আমার সাফল্যের পাথেয়। সফল হবার জেদ হয়ে উঠেছিল এবং আমি পেরেছি বাবা।

বেনডাল ছোটবেলা থেকেই জানত সে একজন ফ্যাশান ডিজাইনারই হয়ে উঠবে। খুবই অল্পবয়স থেকে ফ্যাশান সম্পর্কে আশ্চর্যরকম স্পষ্ট স্বচ্ছ ধারণা ছিল তার। নিচু শ্রেণীর

ছাত্রী থাকার সময়েই বালিকা বয়সেই নিজের পুতুলগুলোর জন্য নানা ছাঁট কাটের যে, পোশাকগুলো সে বানাত, তা সবাইকে চমৎকৃত করত। মা সে সব দেখে দারুণ প্রশংসা করে বলতেন, তুমি একদিন পৃথিবী বিখ্যাত ফ্যাশান ডিজাইনার হবে এবং বেনডালের নিজেরও সে বিষয়ে কোনরকম দ্বিধা ছিল না। স্কুল পার হয়েই তাই সে ফ্যাশন ডিজাইনিং কলেজে ভর্তি হয়েছিল। সেই সময়েই এক বিখ্যাত ফ্যাশান ডিজাইনারের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি তাকে একটা মূল্যবান পরামর্শ দেন। শুরু হিসেবে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে নিজে মডেল হও। এভাবে তুমি বিখ্যাত ডিজাইনারদের সঙ্গে পরিচিত হতে, তাদের কাছাকাছি আসতে পারবে। খুব কাছ থেকে তাদের কাজগুলো দেখতে পারবে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ মনে করে বেনডাল এ বিষয়ে যখন বাবার মত নিতে গিয়েছিল, তিনি সশব্দে, উচ্চস্বরে হেসে উঠেছিলেন–তুমি, মডেল? মডেল? এটা বোধহয় বছরের সেরা ঠাট্টা রসিকতা বিবেচিত হতে পারবে।

ছুটিতে বোর্ডিং হোস্টেল থেকে বেনডাল যখন বাড়ী ফিরত, গিয়ে দেখত এক অসহ্যকর পরিস্থিতি। সমস্ত কিছুর মধ্যেই চরম বিশৃঙ্খলতার ছাপ। সে প্রাণপণে চেষ্টা করত সবকিছুকে স্বাভাবিকতা শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনতে, সুস্থ চেহারা দিতে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তার করা কোন কিছুই যেন বাবার পছন্দ হতো না। এই নতুন রাধুনীটা জঘন্য, কোথা থেকে জোগাড় করা হয়েছে একে? নতুন ডিশগুলো কে পছন্দ করে এনেছে? জঘন্য রুচি। আমার শোবার ঘর নতুন করে সাজাতে কে বলেছে। বিশ্রী। কুৎসিত হয়েছে। বেনডালের মনে হতো, শুধুমাত্র সে করেছে বলেই বাবাকে অপছন্দ করতে হচ্ছে। বাবার এই নিষ্ঠুরতা, নির্মম ব্যবহারই তাকে শেষ পর্যন্ত বাড়ী থেকে দুরে চলে যেতে বাধ্য করল। এক ভালবাসাহীন গৃহ। ছেলেমেয়েদের প্রতি বাবার কোন আদর যত্ন ভালবাসাই ছিল না। একদিন শেষ পর্যন্ত সত্যিই সে নিউইয়র্কের দিকে পাড়ি জমাল।

চিরদিনের মত ঐ বাড়ীকে পরিত্যাগ করে, সম্পর্ক ছিন্ন করে। এবং শুরু হলো তার নতুন জীবন। প্রথম দিকে যা মোটেই সহজ ছিল না। রীতিমত লড়াই করতে হয়েছে পায়ের তলায় একটু জমি খুঁজে পাবার জন্য। মডেলিং এজেন্সীগুলোর দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু কেউ তাকে সুযোগ দিতে চায়নি। অচেনা, অজানা, অনভিজ্ঞ একটা মেয়েকে মডেল হিসেবে কে নিতে চাইবে? প্রত্যাখানের পর প্রত্যাখান। তবুও ভেঙ্গে পড়েনি সে। জানত, তার আত্মবিশ্বাস ছিল যে, একদিন না একদিন সুযোগ সে পাবেই, আসবেই।

নিউইয়র্কের অন্যতম সেরা মডেলিং এজেন্সী ছিল প্যারামাউন্ট মডেলস এজেন্সী। এই এজেন্সীতে তার কোন সুযোগই নেই বুঝেছিল বেনডাল। বিশেষ করে ছোট ছোট এজেন্সীগুলোই যখন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তবু কী মনে করে, হঠাৎ এক দুপুরে সে হাজির হলো প্যারামাউন্টের দফতরে। রিসেপশন বলে কিছু ছিল না, সে সোজা ঢুকে পড়ল কাঁচের দরজা ঠেলে উল্টোদিকের ঘরটায়। রোকসানে মানেরিক ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। ফোন রেখে এক ঝলক তার দিকে তাকালো। দুঃখিত আমরা আপনার চেহারার কাউকে খুঁজছি না। বেনডাল মরীয়া গলায় বলে, দেখুন আপনারা যে ধরনের মডেল চাইছেন, রোগা মোটা লম্বা বেঁটে আমি নিজেকে ঠিক সে ধরনের বানিয়ে তৈরি করে নেবো। আমি শুধু একটা সুযোগ চাই। একটা সুযোগ পেতে চাই। ওর দিকে স্থির চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে। মেয়েটির চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। সংকল্প এবং আত্মবিশ্বাস। কী যেন ভেবে নেয় কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাত বাড়ায়। দেখি তোমার পোর্ট ফোলিও। সেই শুরুর পর বেনডালকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সে জানে না, প্যারামাউন্টের মত সংস্থার মালকিন রোকসানে মানেরিক তার মধ্যে কী দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু রোকসানের পরামর্শ ও প্রশ্রয় সে পেয়েছিল পুরোমাত্রায়। তার

মত একজন নবীনকে হাত ধরে মডেলিং এবং সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ও শিখিয়ে ছিল রোকসানেই। বিজ্ঞাপন ও ফ্যাশানের জগতে প্রতিষ্ঠিত মডেল হিসেবে শক্ত জমির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

মডেল হিসেবে কাজ করতে করতে, নানা ডিজাইনারের পোশাক পরতে পরতেই শিখে চলেছিল বেনডাল। নানা ডিজাইনারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও বাড়ছিল। মডেল হিসেবে চরম ব্যস্ত দ্রুতগামী জীবনের মাঝেও এক মুহূর্তের জন্যও সে ভুলত না নিউইয়র্কে আসার মূল কারণটিকে, নিজের জীবনের আসল লক্ষ্যটিকে। এবং বাড়ীতে অবসরে সে নানাভাবে পোশাকের স্কেচ করত। অন্য ডিজাইনারদের পোশাকগুলো পড়ে সে এবং অন্য মডেলরা মঞ্চে উঠত সেগুলো যদি সে করত, কেমন হতে কী কী বদল করত? এভাবেই নানা চিন্তা ভাবনা মাথায় গিজ গিজ করত। যা তার স্কেচ খাতায় পাতার পর পাতায় ভরে উঠত। অবশ্য, পুরোটাই সাফল্যের গল্প নয়। ওর প্রথম প্রদর্শনীটি বিশ্রীভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে। প্রায় এক বছর পর যখন সে ফ্যাশান ডিজাইনার হিসেবে তার দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি করল, ফলাফল অন্যরকম কিছু হলো না। ব্যর্থ পোশাক পরিকল্পক হয়ে প্রায় চিহ্নিত হয়ে গেল সে। রাতে বিছানায় জেগে সে ভাবত ব্যর্থতার কারণগুলো। তারপর হঠাৎ করে একরাতে সে বুঝতে পারল যে পোশাকগুলো সে বানাচ্ছে ডিজাইন করছে, সেগুলো মডেলদের পরবার মত নিখুঁত। কিন্তু সাধারণ মহিলাদের তা পছন্দ হবে কেন? তাকে এমন পোশাক পরিকল্পনা করতে হবে যা সাধারণ নারীদের কাছে আরামদায়ক। সহজ সপ্রতিভ এবং সস্তা হবে। একবছর পর তার তৃতীয় প্রদর্শনীটি সুপার হিট হলে পোশাক পরিকল্পনাকারী হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল সে।

সাফল্যের খুশিতে সে একদিন হাজির হলো রোজ হিলে তাদের বাড়ীতে। কিন্তু বাবা বদলায়নি। তার সাফল্য বাবাকে খুশি করা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করতে পারেনি। ওকে দেখে বাবা মুখ কুঁচকে কুৎসিত ভঙ্গী করে বললেন–এখনো কাউকে ফাসাতে পারোনি? ঐ চেহারা নিয়ে সারাজীবন বোধহয় তা পারবেও না কোনদিন।

এক চ্যারিটি ডিনারে তার আলাপ হয়েছিল মার্ক রেনর এর সঙ্গে। বেনডাল তার থেকে পাঁচ বছরের বয়সে ছোট। ঐ আকর্ষণীয় চেহারার ফরাসী যুবকটির প্রতি অতি দ্রুত আকর্ষিত হয়ে পড়েছিল। সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে রেনরের সঙ্গে আলাপ করে। এমন কি পরের রাতে তার সঙ্গে খাবার খেতে যাবার ইচ্ছেও প্রকাশ করে। সে রাতে, পরের রাতে, খাবার, খেয়ে তারা রেনরের ফ্ল্যাটে যায় এবং বেনডাল বিনা দ্বিধায় তার শয্যাসঙ্গিনী হয়। তারপর থেকে প্রতিরাতেই। মার্ক তখন নিউইয়র্কের এক শেয়ার দালাল সংস্থায় কাজ করত। একদিন মার্ক তাকে বলে, বেনডাল আমি তোমায় পাগলের মত ভালবাসি। মার্কের গলাটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বেনডাল প্রণয়সিক্ত গলায় বলে, আমি সারাজীবন তোমারই মত কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। মার্ক বিমর্ষ গলায় বলে, কিন্তু আমাদের বিয়ের একটা বিরাট সমস্যা আছে। একে তো তুমি নিজেই একজন সফলতম নারী। তার ওপর একজন পৃথিবীখ্যাত শিল্পপতির মেয়ে তুমি। আমার মত একজন অতি সামান্য... বেনডাল কথা শেষ করতে না দিয়ে ওর ঠোঁটে নিজের আঙুলটাকে চেপে ধরে।

বড়দিনের ছুটিতে সে মার্ককে নিয়ে তাদের রোজ হিলের বাড়ীতে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বাবার সঙ্গে মার্কের আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তুমি ঐ ছোকরাকে বিয়ে করতে চাও। হ্যারী স্ট্যানফোর্ড যেন আগুনের গোলার মত ফেটে পড়লেন। ঐ ছোকরার আছে কী? অতি সামান্য তুচ্ছ একটা মানুষ। ও শুধু স্ট্যানফোর্ড পরিবারের বিশাল অর্থ সম্পত্তি

পাবার লোভে তোমায় বিয়ে করতে চাইছে। তা কি তুমি বুঝতে পারছ না? বোকাটা ভেবেছে, তুমি আমার সম্পত্তির অংশ পাবে। বেনডাল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ফিরতি বিমানেই ওরা ফিরে এসেছিল। পরের সপ্তাহেই ওরা বিয়ে করেছিল। এবং তার বিয়ে সত্যিই সুখের হয়েছিল। স্বামী হিসেবে মার্ক সত্যিই আদর্শ। কোন অপূর্ণতা নেই ওদের দাম্পত্য জীবনে। বিয়ের রাতেই মার্ক ওকে বলেছিল–সারাজীবন ধরেই তোমার বাবা তার অর্থ বিত্তকে অস্ত্র হিসেবে, ক্ষমতাদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে এসেছেন। কিন্তু আমাদের সম্পর্কের মাঝে, আমরা কোনদিন তোমার বাবার অর্থকে আসতে দেব না। মার্কের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা আরো তীব্রতর হয়েছিল একথা শুনে।

ফ্যাশান শো শেষ হবার পর নিজের অফিসে বসেছিল বেনডাল। মুখটা ঝলমল করছিল শোটা বেশ সফল হয়েছে। উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে ওর কাজ। এমন সময় ওর ব্যক্তিগত সচিব ঘরে ঢুকল। কুরিয়ার মাধ্যমে একটা চিঠি এসেছে আপনার নামে। সে চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাদামী খামটার দিকে তাকিয়ে বেনডালের সারা শরীরে হিম স্রোতের শিহরণ বয়ে গেল। চিঠিটা না খুলেই সে বুঝতে পারে ওতে কী লেখা আছে।

প্রিয় শ্রীমতি রেনর,

আপনাকে বিনীতভাবে জানাচ্ছি, আপনাদের পশু ক্লেশ নিবারণ সংস্থা আবার তহবিল ঘাটতিতে পড়েছে। খরচ সামাল দিতে অবিলম্বে দশ হাজার ডলার প্রয়োজন। টাকাটা দ্রুত পাঠাবার ব্যবস্থা করলে কৃতজ্ঞ থাকব। টাকা জুরিখের ক্রেডিট সুইস ব্যাঙ্ক এর এ

৮০৭০৪০২ নম্বরের অ্যাকাউন্টে পাঠাতে হবে। চিঠির শেষে কোন সই প্রেরকের নাম নেই।

বেনডাল স্তব্ধ। বোবা হয়ে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ব্যাপারটা তার স্নায়ুর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে ক্রমে। এই ব্ল্যাকমেইলিং বোধহয় কোনদিন বন্ধ হবে না। যতদিন সে বেঁচে থাকবে এটা বোধহয় চলতে থাকবে। ঠিক এই সময়ই হন্তদন্ত হয়ে তার একজন সহকারী ঘরে ঢোকে। উত্তেজনায় লাল মুখে সে হাঁপাচ্ছে। বেনডালের দিকে তাকিয়ে বিবর্ণ মুখে সে বলে, আমি...দুঃখিত...একটা ভয়ঙ্কর খারাপ খবর আছে ম্যাডাম। আরো খারাপ খবর? বেনডাল ভাবে তার স্নায়ু আর কত সহ্য করবে? কী? কি ব্যাপারটা কী? ম্লান মুখে সহকারীটি বলে। এই মাত্র রেডিওর খবরে বলল...আপনার বাবা হ্যারী স্ট্যানফোর্ড জলে ডুবে মারা গেছেন। ব্যাপারটাকে নিজের অনুভবে ডুবিয়ে নিতে পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে বেনডালের কয়েক মুহূর্ত সময় বেশিই লাগল। তারপর ওর মাথায় প্রথম অনুভতিই যেটা প্রকট হলো–আমার বেশি খুশি হওয়া উচিত কোনটিতে? ফ্যাশান শোয়ের সাফল্যতে? নাকি আমি একজন খুনী, এই গূঢ় বাস্তবে?

.

১০.

উডরোও উডি স্ট্যানফোর্ড-এর সঙ্গে পেগি মালকোভিচের বিয়ে হয়েছে দুবছর। কিন্তু হোব-এর বাসিন্দাদের কাছে আজও সে বেঁস্তোরা পরিচারিকা হিসেবেই বিবেচিত হয়। উডির সঙ্গে রেইন ফরেস্ট রেস্তোরাঁতেই প্রথম আলাপ হয়েছিল তার। সুদর্শন, সপ্রতিভ,

আকর্ষণীয় চেহারার উডি তখন হোবের সব অবিবাহিত কুমারী মেয়েদেরই লক্ষ্যবিন্দু ছিল। শুধু হোব কেন? ফিলাডেলফিয়া, লঙ আইল্যান্ড পর্যন্ত তার জনপ্রিয়তা ছিল। তাই উড়ি যখন পেগির মত একজন স্কুল পার না হওয়া বিদ্যের রেস্তোরাঁ পরিচারিকাকে বিয়ে করল। সারা হোব শহরের মানুষ বিষম চমক পেয়ে আঁতকে উঠল বলা ভাল। আঁতকে ওঠার পরিমাপটা আরো চরম হলো, কারণ সারা হোব শহরই মনে মনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে উডির পেছনে যত মেয়েই ঘোরাঘুরি ছোঁক ছোঁক করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত উডি বিয়ে করবে কাঠ ব্যবসায়ী, ধনীর মেয়ে মিমি কারসনকেই। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মিমিও উডির প্রেমে পাগল ছিলো। ক্রমে জানা গেল পেগি মালকোভিচ বিয়ের আগেই গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। সে কারণেই উডি তাকে বিয়ে করে নেয়।

চব্বিশ বছর আগে, এরকমই একটি স্ক্যান্ডাল নাড়িয়ে দিয়েছিল হোবকে। সেটি, সেই ঘটনাটিতেও জড়িত ছিল স্ট্যানফোর্ড পরিবারের একজন পুরুষ। একটি ভদ্রঘরের মেয়ে এমিলি টেম্পল সেই ঘটনায় আত্মহত্যা করে। কারণ তার স্বামী বাচ্চাদের দেখাশোনাকারীনি যুবতী গভর্নেসকে গর্ভবতী করেছিল। যেহেতু নিজের বাবার কুকাজ, পাপ, উডকেও কোনদিন অনুমোদন করেনি। প্রকাশ্যেই তার সমালোচনা করে এসেছে এতদিন। বাবাকে সোজাসুজি এবং প্রকাশ্যে ঘৃণা করে এসেছে। তাই পেগি মালকোভিচ গর্ভবতী হয়ে পড়ায় সে দ্বিতীয় ভাবনা চিন্তা বা কোন দ্বিধা না করেই তাকে বিয়ে করে নেয়। বোধ হয় নিজের বাবার থেকে সে অনেক উন্নততর মহৎ চরিত্রের পুরুষ। এটা সবাইকে বোঝাবার একটা দায় অথবা চেষ্টা, ইচ্ছাও তার মনের গভীরতর পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করেছিল।

সুতরাং ওদের বিয়েটা হয়ে গেল। সারা হোব শহর এবং উডির বন্ধুবান্ধবেরাই এ বিয়েতে বেশ হতাশ হয়েছিল। মেয়েটার মধ্যে উডরোও স্ট্যানফোর্ড এমন কি দেখতে পেলো? নিরন্তর এই চর্চা চলেছিলই। এবং সত্যি কথা বলতে কী এই সমালোচনা চর্চা অর্থহীন ছিল না মোটেই। পেগি, নির্বোধ ব্যক্তিত্বহীন এক মহিলা। দেখতেও সে মোটেই সুশ্রীও বলা যাবে না। সুন্দরী তো দূরের কথা। উডি প্রাণপণে তাদের বিয়েটাকে সার্থক সফল করে তোলবার চেষ্টা চালাচ্ছিল। একজন আদর্শ স্বামী হয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ বিয়ের পরে কাটতেই সে বুঝে গেল, বিরাট একটা ভুল করে ফেলেছে সে। বিয়েটা কিছুতেই সফল হয়ে উঠবে না। তাদের সমাজের স্তর থেকে অনেক দূরে পেগির অবস্থান। উডরোও এর পরিচিত বন্ধু আত্মীয়দের সঙ্গে কিছুতেই সহজ হয়ে মিশতে পারত না পেগি। নিমন্ত্রণ পার্টিতে নিয়ে গেলে আড়ষ্ট জড়োসড়ো হয়ে থাকত। ঐ রকম কোন পরিবেশে বলার মত কথা পেতো না। ঐসব নিমন্ত্রণে অথবা অনুষ্ঠানে, পার্টিতে পেগি মালকোভিচের কোন অবদান থাকত না। ফলে ঐ সব জায়গায় গিয়ে সে এক কোণে জড়োসডো নার্ভাস হয়ে থাকত। সহজ হতে পারত না। বিয়ের চার সপ্তাহ পরই হঠাৎ করে পেগির গর্ভপাত ঘটে। বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়।

ঐ ঘটনাটা ওদের দাম্পত্যে একটা প্রভাব ফেলে। তীব্রতর প্রভাব। পেগি নিজেকে আরো গুটিয়ে নেয়। তীব্র নিঃসঙ্গতার এক শক্ত খোলসে মুড়ে এবং গুটিয়ে নেয় নিজেকে। বাইরে বের হওয়া, অনুষ্ঠান নিমন্ত্রণে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দেয়। উত্তরোত্তর বারবার অনুরোধেও কোন কাজ হত না। ফলে, বাধ্য হয়েই সব জায়গাতে উডরোওকে একাই যেতে হতো। অন্যদিনও বাড়ী ফিরতে গভীর রাত হতো তার। নিজের শোবার ঘরে বিনিদ্র রাত পার করতে করতে পেগি স্বামীর ফিরে আসা টের পেতো। এবং সে

ঠিকই বুঝত যে এতক্ষণ অন্য নারীদের সঙ্গ লাভ করছিল উডি। এভাবেই দিন কাটছিল এবং ওদের দুজনের মধ্যেই ভাঙ্গনটা বিশালতর হয়ে উঠতে থাকছিল।

আচমকা সবকিছু বদলে গেল একটা দুর্ঘটনায়। সেটা ঘটল একটা পোলো ম্যাচে। পোলো খেলোয়াড় হিসেবে সারা দেশ জুড়ে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল উডরোও-এর। একটা পোলো ম্যাচে দ্রুততর গতিতে ধাবমান অবস্থায় মাটিতে ছিটকে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ল তার পা ভেঙ্গেছে। পাজরের তিনটে হাড় ভেঙ্গেছে। ফুসফুঁসেও চোট লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরের দু সপ্তাহে তিনটে আলাদা আলাদা অস্ত্রোপচার করা হলো উডিকে। পাঁচ সপ্তাহ পরে হাসপাতাল থেকে যখন সে বাড়ীতে ফিরল, তার চরিত্রের, ব্যবহারে একটা অদ্ভুত অসাম্য দ্বিমুখীতা লক্ষ্য করা যেতে লাগল। হঠাৎ হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে রেগে উঠতে লাগল। এক মুহূর্ত আগে হয়তো পেগির সঙ্গে চা খেতে খেতে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার মেজাজের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত। এক উদ্দাম উত্তেজনা, উন্মাদনায় ক্ষেপে উঠত সে। যা আসলে এক প্রচণ্ডতর তীব্র রকমের হতাশা বিষণ্ণতার ক্ষিপ্ত বহিঃপ্রকাশ। ক্রমে পেগিকে দৈহিক নিপীড়ন শুরু করল সে।

একদিন ডাক্তার টিকনার, যিনি উডির চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন, পেগিকে হাসপাতালে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। কোন ভূমিকা না করেই সরাসরি তিনি বললেন, মিসেস স্ট্যানফোর্ড, আপনি কি বুঝতে পারছেন না? জানেন না আপনার স্বামী নিয়মিত মাদক নিচ্ছে? পেগি যেন আকাশ থেকে পড়ে। ড্রাগ? অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ডাঃ টিকনার-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। মাথা নেড়ে হতাশার ভঙ্গী প্রকাশ করে ডাঃ টিকনার বলেন, জানি আপনার বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এটাই বাস্তব সত্য। উনি রীতিমত মাদকে

আড়ষ্ট হয়ে পড়েছেন। কেউ ওকে নিয়মিত ভাবে হেরোইন কোকেন সরবরাহ করছে। এই বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর একটাই পথ আছে। ওকে কোন রিহ্যাবিটেশন সংস্থায় ভর্তি করে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ব্যাপারটা যদিও খুব সহজ ছিল না। শেষ পর্যন্ত ডাঃ টিকনার এবং পেগির আপ্রাণ চেষ্টায় উডরোও রাজী হলো। হারবার গ্রুপ ক্লিনিকে তিন সপ্তাহ চিকিৎসা করিয়ে উডি যখন ফিরে এলো সবাই আবার পুরনো উডিকে খুঁজে পেলো। সপ্রতিভ হাসি খুশি। আবার পোলো মাঠে ফিরেও গেল সে। এরকমই একটা পোলো ম্যাচ চলছিল। উডি দুরন্ত খেলছিল। পঞ্চম চাকার চলার সময়ে উডি দ্রুতগতিতে একটা বল নিয়ে বিপক্ষ সীমানায় ঢুকে পড়ে। অনেকটা এগিয়ে গেল। বলটাকে কোন সঙ্গী খেলোয়াড়কে বাড়িয়ে দেবার জন্য তাকাতেই চোখের কোণ দিয়ে সে দেখতে পেলো বিপক্ষের সেরা খেলোয়াড় রিক হ্যাঁমিলটন তেড়ে আসছে। রিক বলটা কেড়ে নিয়ে বিপক্ষের গোলের দিকে দৌড় শুরু করল। উডি প্রাণপণে তাকে তাড়া করে বলের দখল নিতে চেষ্টা করতে থাকল। হ্যাঁমিলটন গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। মরীয়া উডি তাকে প্রাণপণ শক্তি দিয়ে বাধা দিলো অবৈধভাবে। আম্পায়ারের বাঁশি তীব্র রাগত স্বরে বেজে উঠল। একটা হাত তুলে তিনি পেনাল্টির ইঙ্গিত করলেন, সেই চাকার একটা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে কাটল। পরের তিন মিনিটে উডি আরো দুটি অবৈধ ফাউল করল। বিপক্ষ দল আরো দুটো পেনাল্টি গোল লাভ করল। জেতা ম্যাচটা একা উডির জন্য হারতে হলো তার দলকে।

খেলার পরে সাজঘরে যেন কবরের স্তব্ধতা। উডি বিষণ্ন, ম্লান মুখে বসেছিল। লজ্জায় দলের অন্যদের মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছিলো না। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন দলের কোচ। উডির কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির সুরে তিনি বললেন, উডি তোমার

জন্য একটা ভয়ঙ্কর খারাপ খবর আছে। তোমার বাবা মারা গেছেন। উডি চোখ তুলে তার দিকে তাকালো। তার দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, আমি...আমি...এরজন্য দায়ী। আমার দোষেই...কোচ সহানুভূতির স্বরে বললেন, না উডি, এরকম তো সবারই জীবনে ঘটতে পারে। এর জন্যে নিজেকে কেন দায়ী করছ। এটা দুর্ঘটনা, এই শোকের ঘটনার জন্যে তোমার কোন দোষ তো নেই। উডি কেঁদে উঠে, কান্না ভেজা গাঢ় গলায় বলে, না, না, দোষ আমারই। আমার পেনাল্টিগুলো না হলে তো আমরাই খেলাটা জিততাম।

.

১১.

জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড কোনদিন নিজের বাবাকে স্বচক্ষে সামনা সামনি দেখেনি। শুধু খবরের কাগজে টেলিভিশনের ছবিতে দেখেছে শিল্পপতি বিজনেস টাইফুন হ্যারী স্ট্যানফোর্ডকে। আজ সে মানুষটা মৃত। এক বিখ্যাত ধনী শিল্পীপতি বিজনেস টাইফুন থেকে স্রেফ খবরের কাগজের মোটা কালো হরফের কয়েকটা লাইন। জুলিয়া খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছবিসহ হ্যারী স্ট্যানফোর্ড, বিখ্যাত প্রবাদ প্রতিম শিল্পপতি জলে ডুবে মৃত শিরোনামের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মধ্যে তীব্র বৈপরীত্যময় আবেগের উথাল পাথাল চলেছে। আমার মায়ের সঙ্গে যে ব্যবহার উনি করেছিলেন তার জন্যে আমি কি ওকে ঘৃণা করি? যতই হোক, আমার বাবা উনি, সেজন্য ওকে কি আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি? নিজে কেন কোনদিন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করিনি, করার চেষ্টা করিনি। এজন্যে আমার কি অপরাধ বোধ, আত্মশোনা হচ্ছে? উনি কোনদিন নিজের মেয়েকে খুঁজে দেখার চেষ্টা

করেননি। এ কারণে ওকে কি ঘৃণা করা উচিত আমার? প্রশ্নগুলো ওর মনে ঝলসে উঠেছিল। আবার বুদবুদের মত মিলিয়েও যাচ্ছিল। অবশেষে উত্তরটা ও নিজেই খুঁজে পেলো। ঐসব প্রশ্নগুলো এবং তার উত্তর, এখন আর কোন যথার্থতা নেই, অর্থহীন, কারণ আসল মানুষটিই নেই, চলে গেছেন।

অবশ্য সেভাবে ভেবে দেখলে, তার বাবা চিরকালই ওর জন্ম থেকেই ওর কাছে মৃত। এই মৃত্যু শুধুই একটা ইঙ্গিতময় প্রতীকি মৃত্যুর বেশী কিছু নয়। তাই তার কাছে প্রথমটায়। স্বজন হারানোর ক্ষতিটা হৃদয় জুড়ে বেজে উঠেছিল খবরটা পাওয়া মাত্র। তারপরই মনের গহন গভীর থেকে ওর বাস্তববুদ্ধি বোধ ধমকে ওঠে। বোকা মেয়ে যাকে তুমি চেনোই না, তাকে হারানোর ক্ষতি তোমার মনে অনুভূত হয় কী ভাবে? জুলিয়া তার কোলের ওপর রাখা ছবির অ্যালবামটার পাতা ওলটাতে থাকে। পরম মমতায় ধূসর হলুদ বিবর্ণ হয়ে ওঠা ছবিগুলোতে হাত বুলোতে থাকে। ছবিগুলো ওর মায়ের। বেশির ভাগই স্ট্যানফোর্ড পরিবারের নানা জনের সঙ্গে গভর্নেসের পোশাকে। দীর্ঘক্ষণ সেই ভাবেই বসে থাকে জুলিয়া। অতীতে হারিয়ে যায়।

মিলাউঁকির সেন্ট জোসেফ হাসপাতালে ওর জন্ম হয়েছিল। ছোটবেলার স্মৃতি বলতে ওর শুধু মনে আছে ছোট্ট ছোট্ট ঘিঞ্জি অ্যাপার্টমেন্ট। কোন শহরেই বেশিদিন একনাগাড়ে থাকত না। চরকির মত এ শহর সে শহর ঘুরে বেড়াত। এমন সময় প্রায়ই আসত ওর মা। জীবনে মেয়ের হাতে আধ ডলারও থাকত না। দিন কাটত অনাহারে। ওর জন্মের পর থেকেই মা অসুস্থ রুগ্ন হয়ে পড়েছিল। অসুস্থতার কারণেই কোথাও টানা স্থায়ীভাবে চাকরী করতে পারত না। ছোটবেলা থেকেই রুক্ষ জেদী স্বভাবের ছিল। ছাত্রছাত্রী শিক্ষক সবার কাছেই সে ছিল এক উপদ্রব। হয়ত, স্কুলের সেরা ছাত্রী না হলে ওকে বোধহয়

স্কুল থেকে তাড়িয়েই দেওয়া হতো। ছোটবেলা থেকেই ও জানত ওর বাবা মৃত। সে কথা বিশ্বাস করেই ও বড় হয়েছিল। তারপর একদিন ওর বয়স তখন বারো, পুরনো কাগজপত্রের ভেতর থেকে একটা বেশ পুরনো ছবি ওর হাতে এলো। একটা পারিবারিক গ্রুপ ছবি। ছবিটার দিকে অচেনা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক চোখে জুলিয়া প্রশ্ন করেছিল, এরা তোমার সঙ্গে ছবিতে কারা মা? ওর মা বোধহয় বুঝেছিল, সব কিছু মেয়েকে জানানোর সময় এসেছে। সব কিছু হা, সব কিছুই জেনেছিল জুলিয়া, চিনেছিল সত্য। সৎ দাদাদের, সৎ দিদিকে। উনি কি করে তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে পারলেন? বাবার প্রতি ঘৃণা বোধের বীজ সেই প্রথমবার প্রোথিত হয়েছিল তার মনে।

বাবার থেকে দূরে থাকলেও বিখ্যাত ধনকুবের পিতার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তার নেশা হয়ে উঠল। পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন, রেডিও, খবরের কাগজ দেখলেই, হ্যারী স্ট্যানফোর্ড সম্পর্কে কোন লেখা খবর তথ্য বের হতো, জেনে রাখত, জোগাড় করে নিতো। একসময় তার মায়ের এক নাগাড়ে বেশিদিন কোথাও না থাকা, এক শহর থেকে অন্য শহরে পালিয়ে বেড়ানোর সঠিক কারণ সে খুঁজে পেলো। সংবাদ মাধ্যম, কেচ্ছা সন্ধানী, গুজব, অনুসন্ধিৎসু সংবাদ মাধ্যম তাড়া করে বেড়াত রোজমেরী নেলসনকে। হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের প্রেমিকা ও তার অবৈধ সন্তান এখন কোথায়, কীভাবে আছে জানার জন্যে মুখরোচক কেচ্ছা বর্ণনাসহ কাগজের পাতায় তা তুলে ধরার জন্যে রোজমেরীর পিছু তাড়া করে বেড়াত কেচ্ছা লোভী কুকুরের দল। আর নিজেকে, নিজের ও মেয়ের সম্মান বাঁচাতে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হতো রোজমেরীকে। আর জুলিয়া পিতৃ পরিচয় জানবার পর একটু বড় হতেই যখনি হ্যারী স্ট্যানফোর্ড-এর কোন ছবি দেখত অথবা কোন খবর পড়ত, টেলিভিশনে দেখতে পেতো, বাবাকে ফোন করার এক তীব্র অপ্রতিরোধ্য স্পৃহা বোধ করত। বাবা, আমি তোমার মেয়ে বলছি, তুমি কি আমায়

দেখতে চাও–দুচোখ বুজলেই, স্বপ্নের মত অথচ স্বপ্ন নয়, জুলিয়া দেখতে পেতো-বাবা এসেছেন। মায়ের প্রতি অবাক ভালবাসায় পড়েছেন। মাকে বিয়ে করলেন। সব ঠিকঠাক, স্বাভাবিক হয়ে গেল। ওরা সবাই সুখে শান্তিতে থাকতে লাগল। এই স্বপ্নের মত বাস্তব ইচ্ছে অথবা বাস্তবের ইচ্ছে যা স্বপ্নই, বাবা এবং মাকে আবার একসঙ্গে মিলিত করার সেই প্রখর কামনা, শেষ হয়ে গেল, শূন্যে মিলিয়ে গেল, যেদিন মায়ের মৃত্যু হলো।

এ খবরটা অন্তত আমার বাবার জানা উচিত। তাকে জানানো উচিত। এই বোধ থেকে মায়ের মৃত্যুর তৃতীয় দিনে বোস্টনে ফোন করে জুলিয়া, হালো স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইস? ফোন ধরে রেখে ইতস্তত করে জুলিয়া, হ্যালো, কে বলছেন? উত্তরহীন জুলিয়া ফোনটা নামিয়ে রাখে। মা নিজেও বোধ হয় চাইতেন না, যা সে করতে যাচ্ছিল।

সে একা হয়ে গেল। আজ থেকে তার কেউ নেই। জুলিয়া একজন অত্যন্ত সৌন্দর্যবতী যুবতী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর সবার আগে তার কাছে প্রশ্ন হয়ে উঠল জীবনধারণের জন্য সে কি করবে? অতুলনীয় রূপের জন্যেই কেউ কেউ তাকে ফিল্ম অভিনয়কে পেশা হিসেবে নেবার পরামর্শ দিলো। প্রস্তাবটা এককথায় উড়িয়ে দেয় সে। কারণ সেক্ষেত্রে এতদিন ধরে তার মা সংবাদ মাধ্যমের থেকে সেটা লুকিয়ে রেখেছে সেই অতীত, গোপনতা হারাবে, প্রকাশিত হয়ে পড়বে। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য কিছু তো করতে হবে। কিন্তু কী তা? শেষ পর্যন্ত জুলিয়া একটা সেক্রেটারিয়াল কোর্স করে এবং একটি অংশীদারী মালিকানা কোম্পানীতে চাকরীও জোগাড় করে ফেলে। যদিও সে জানত এটা শুধুই শুরু। বহুদূর এগোতে হবে। এগোবে সে এই পথ ধরে।

.

১২.

এ-এক অদ্ভুত পারিবারিক মিলন। একই পরিবারের একদল অচেনা অপরিচিত মানুষ মুখোমুখি হলো। যাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ সংযোগ খুবই কম। বহু বছর হয়ে গেছে ওদের মধ্যে শেষ দেখা সাক্ষাৎ হবার পর। যাই হোক, হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের বংশধরদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, অন্তিম কাজ সম্পন্ন হবে কিংস চ্যাপেলে। যেহেতু হ্যারী। স্ট্যানফোর্ডের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে দেশ বিদেশের নানা বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছিলেন, তাই গির্জার ভেতর বাইরে নিরাপত্তা কড়াকড়ি ছিল। পুলিশ নিরাপত্তা কর্মীতে থিকথিক করছিল জায়গাটা। গির্জার ভেতর ওরা ভাই বোনেরা মিলিত হলো। অস্বস্তিজনক সেই মিলন। অপরিচিতদের মুখোমুখি হবার মতই বিব্রতকর। বেনডাল, মার্কের সঙ্গে অন্যদের আলাপ করিয়ে দিল। পেগির সঙ্গে ভাই বোনের পরিচয় করিয়ে দিল উডবরাও। ভদ্র বিনীত ভঙ্গীতে আন্তরিকতার আবেগ উচ্ছ্বাসহীন, যথার্থ অচেনাদের মত আলাপ পর্ব শেষ হলো।

এক সময় অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হলো।

টাইলারের কাছে বস্টনে ফিরে আসাটা মিশ্র অনুভূতিময়। জঘন্য, ভুলে যেতে চাওয়া স্মৃতির সঙ্গে ভাল সুন্দর কিছু স্মৃতিও আছে মায়ের, রোজমেরীর। যখন তার বয়স এগারো, সে একটা ছবি দেখেছিল। গইয়ার বিখ্যাত ছবি স্যাটার্ন ডেভভারিং হিজ সন এবং সর্বদাই সে নিজের পিতাকে ঐ ছবিতে খুঁজে পেয়েছে। শয়তান আজ মৃত। বাবার কফিনের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার কানের পাশে অপার্থিব

অনুরণনটা আবার : টের পেলেন জাজ টাইলার স্ট্যানফোর্ড–আই নো ইয়োর ডার্টি লিটল সিক্রেট।

উডির কাছে পরিস্থিতিটা অসহ্যকর মনে হচ্ছিল। যার জন্য মনে সামান্যতম শ্রদ্ধা ভালবাসা নেই তারই জন্যে শোকের ভান করা, বসে থাকা। এসব নাটক তার অসহ্য বিরক্তিকর লাগে। উসখুশ করতে করতে সে তার ভাই বোনেদের দিকে তাকায়। টাইলার বেশ ওজন চড়িয়েছে শরীরে। ওকে বেশ ভারিক্কী লাগে। বিচারকের মানানসই। বেনডাল দারুণ সুন্দরী হয়েছে। তবে ওকে কিছুটা শান্ত মনে হচ্ছে। বাবার মৃত্যুর কারণেই কি? শোকে? না, বাবাকে অন্য ভাই বোনেদের মতই মনের থেকেই আন্তরিকভাবে ঘৃণা করত বেনডালও।

বেনডালের মন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিকে ছিল না, যান্ত্রিকভাবে ঘটে যাওয়া সব কিছুর ওপর সে আলতো চোখ রাখছিল। কিছু শুনছিল না। কিছু বোঝার চেষ্টাও করছিল না।

পেগি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। এরা সবাই তার থেকে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ। এত সব গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিত্তের চোখ বাধানো প্রদর্শনীর মাঝে সে নিজেকে দলছুট মনে করে।

মার্ক রেনর একমনে ব্ল্যাকমেইলের চিঠিটার কথা ভেবে যাচ্ছিল। খুব সতর্কভাবে শব্দবাছাই করে দারুণ বুদ্ধির সঙ্গে চিঠিটা লেখা। পড়ে কিছুতেই বোঝার উপায় নেই কে এর পেছনে। মার্ক স্ত্রীর দিকে তাকায়। শ্রান্ত দেখাচ্ছে। আর কত নেবে, নিতে পারে এই দুর্বিপাকের রাশি? স্ত্রীর প্রতি এক অসীম মমত্ব বোধ করে সে।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ হবার পর হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের মরদেহ সহ শবাধারটি তুলে দেওয়া হল শবদেহ বহনকারী যানে। পিছনে চলল আত্মীয় বন্ধু, গণ্যমান্যদের নিয়ে গাড়ীর বিরাট মিছিল। ঘন্টা খানেকের মধ্যে শবদেহসহ আধারটি মাটির নিচে কবরস্থ হলো। গাড়ীর মিছিল আবার ফিরে চলল। রোজ হিলের বাড়ীতে ফিরে আসার পর, বহুদিনের পুরনো চাকর ক্লার্ক, যার বয়স এখন সত্তরোর্ধ, ওদের অ্যাপায়ন করল। দুই পরিচারিকা ইভা ও মিলি সবাইকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিতে চলল। সে সময় ক্লার্ক টাইলারের দিকে তাকিয়ে বলল,–বিচারক টাইলার আপনার জন্যে একটা খবর আছে। সাইমন ফিৎজেরাল্ড আপনাদের সবার সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান। তার তরফে আপনাদের কিছু বলার আছে। উনি ফোন করে জানাতে বলেছেন আপনারা কখন ওকে সময় দিতে পারবেন। মার্ক প্রশ্ন করে, সাইমন ফিৎজেরাল্ড ভদ্রলোকটি কে? ক্লার্ক সবিনয়ে জানায়, উনি স্ট্যানফোর্ড পরিবারের এ্যাটনী। টাইলার বিচারক সুলভ গাম্ভীর্য ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলে বলে, তার মানে ফিৎজেরাল্ড হয়ত বাবার সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যেই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। তোমাদের কারো যদি আপত্তি না থাকে তাহলে কাল সকালে ওনাকে সময় দিই। এ ব্যাপারে কারোরই কোন আপত্তি দেখা গেল না। ক্লার্ককে বলে দেওয়া হলো, সে যেন ফিৎজেরাল্ডকে জানিয়ে দেয় পরদিন সকাল নটার সময় স্বর্গত ত্যারী স্ট্যানফোর্ডের বাড়ীর পড়বার ঘরে ওরা তার সঙ্গে মিলিত হবে।

পরদিন সকালে যথা সময়ে ফিৎজেরাল্ড এবং সোলানে এসে হাজির হলেন। ক্লার্ক তাদের হ্যারী স্ট্যানফোর্ড-এর পড়ার ঘরে নিয়ে আসে। তিন ভাইবোন তাদের স্বামী স্ত্রী অপেক্ষা করছিল। সোলানের মনে পড়ে পথে আসতে আসতে সাইমন বলেছিল, একটা উৎসাহ ব্যঞ্জক অন্য রকম সকাল হতে চলেছে। ব্যাপারটা শুনে ওদের প্রতিক্রিয়া ঠিক

কেমন কিরকম হবে ভেবে আমার যথেষ্ট উৎসুক্য জাগছে। কী বোঝাতে চেয়েছিল, সাইমন ঐ কথাটার মধ্যে দিয়ে? ফিৎজেরাল্ড ঘরের মানুষগুলোর দিকে পর্যবেক্ষণময় চোখে তাকায়। সবাই, সব কজন নিজেদের সহজ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেও ওদের সবার মুখেই আগ্রহ ঔৎসুক্যের রেখাচিত্র। শরীরগুলোয় টানটান উত্তেজনা। সাইমন ফিৎজেরাল্ড কথা শুরু করেন। আপনারা জানেন...প্রয়াত হ্যারী স্ট্যানফোর্ড... ফিৎজেরাল্ড বলেই চলেন। সারা ঘরে এক অদ্ভুত নীরবতা। অস্বস্তিকর উশখুশে ভাব। হঠাৎ উড়ি বাধা দেয়, ওসব তো ইতিহাস, পুরনো কথা হয়ে গেছে। আপনি বরং সরাসরি কাজের কথায় আসুন। বাবার উইল সে প্রসঙ্গে বলুন। টাইলার সমর্থন সূচক মাথা নাড়ে। সাইমন ওদের সবার মুখের দিকে আরেক ঝলক নজর বুলিয়ে নিয়ে বলেন, বেশ ভাল কথা। তবে সে প্রসঙ্গেই আসি। তিনি তার হাতের চামড়ার ব্রিফকেসটা খুলে কয়েক গোছা কাগজপত্র বের করলেন। উডি অধৈর্য ভঙ্গীতে হাতের তালুতে হাত ঘষতে ঘষতে প্রায় ক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে বলে, আমি জানতে চাই, বুড়োটা আমাদের জন্য এক সেন্টও রেখে গেছে কিনা। টাইলার চাপা ধমকের সুরে বলে, উডি। উডি প্রায় ফেটে পড়ে। আমি জানি, হতচ্ছাড়া, নচ্ছার বুড়োটা আমাদের জন্য কানাকড়িও দিয়ে যায়নি।

সাইমন ফিৎজেরাল্ড শান্ত ধীর চোখে ধনকুবের প্রবাদসম শিল্পপতি হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের বংশধরদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কেটে কেটে শান্ত স্বরে তিনি বলেন, বাস্তব সত্যি কথাটা হলো, আপনাদের সবাইকে তিনি তার সম্পত্তির সমান অংশীদার করে গেছেন। কথাটা শেষ হওয়া মাত্র সারা ঘর জুড়ে যেন এক অপার্থিব নীরবতা ছড়িয়ে পড়ল অকস্মাৎ। প্রথম কথা বলতে পারল উডিই বেশ কিছু সময় পর, কি বলছেন? তার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা আর্তনাদের মত শোনায়। আপনি সত্যি বলছেন তো? উত্তেজনায় সে দাঁড়িয়ে ওঠে। ফিজেরাল্ড এবং স্টিভ সোলানে ঘরের মধ্যে বয়ে যেতে থাকা আচমকা

বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিরক্তিপূর্ণ মনোভাবের আবহাওয়াটা খুশির উচ্ছ্বাসের মধুরতায় পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখল। ফিৎজেরাল্ড তার পেশাদারী নিরাসক্ত। গাম্ভীর্যের আড়াল থেকে ঘোষণা করলেন, মোটামুটি, আপনাদের প্রত্যেকের ভাগে একশো কোটি ডলার করে পড়বে। ঘরের সবাই বাক্যরহিত, যেন স্বপ্নহত। ফিৎজেরাল্ড গলা খাকারী দিয়ে স্বপ্ন ভঙ্গ করে ওদের বাস্তবের জগতে টেনে নামিয়ে আনলেন। ঠিক আছে। সম্পত্তি হস্তান্তরের আইনি প্রক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ হলে আমি তবে জানাব আপনাদের। যে যার অংশ বুঝে নেবেন। পুরো ব্যাপারটার ঘোর তখনো ওদের কাটেনি। কিছুক্ষণ আগেও ওরা ছিল নগণ্য অতি সাধারণ। আর মাঝখানে মাত্র দুতিন মিনিটের ব্যবধান। পৃথিবীর সেরা একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অংশীদার মালিক। একশো কোটিরও বেশির মালিক। পৃথিবীর অন্যতম ধনকুবের। ব্যাপারটার অভিঘাত তীব্রতা হজম করতে ওদের সময় তো লাগবেই।

একশো কোটি ডলার অথবা আরো বেশি, ওরা যে যার নিজস্ব উজ্জ্বল ভবিষ্যতের না পূরণ হওয়া স্বপ্নগুলো সার্থক হয়ে ওঠার সুখ স্বপ্ন দেখতে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। ফিজেরাল্ড তাকালেন, এদের স্বপ্নাতুরতা ভেঙ্গে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে বারবারই তাকে এই অস্ত্রটার প্রয়োগ ঘটাতে হচ্ছে। আপনারা হয়ত জানেন, সমস্ত কোম্পানীগুলো মিলে যে স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইস, তার ৯৯ শতাংশ শেয়ার ছিল আপনার বাবার দখলে। ঐ শেয়ারগুলো আপনাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, আপনারা তিনভাই বোন ছাড়াও, আপনার বাবার সম্পত্তির আরো একজন উত্তরাধিকারী আছেন। আরো একজন উত্তরাধিকারী? ওদের তিনজনের গলা থেকে ছিটকে বের হওয়া বিস্ময়সূচক প্রশ্নটাকে সমবেত আর্তনাদের মত শোনায়। হ্যাঁ, স্বাভাবিক। বিবাহসূত্রের তিন উত্তরাধিকারী ছাড়াও, আপনার বাবার বিবাহ বহির্ভূত একজন উত্তরাধিকারী আছেন।

আইনত যিনি বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীনি হবার অধিকারী। আইন অনুযায়ী এই সমর্থন বিবাহ সম্পর্ক বহির্ভূত সন্তানের পক্ষে থাকবে। এ ব্যাপারে আপনাদের বাবা সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই তিনি তাকে বঞ্চিত করেন নি। বা কোন অন্যায় উদ্দেশ্যও তার ছিল না। লম্বা বক্তৃতা শেষ করে ফিৎজেরাল্ড শ্বাস ছাড়লেন। দম নিলেন। সেই সামান্য ফুরসতেই বেনডাল ব্যগ্র অতি উৎসাহী এবং সামান্য উদ্বিগ্নতা মেশা গলায় প্রশ্ন করে, কে, কে সে? ওর প্রশ্নে অন্য দুভাইয়ের গলার আওয়াজও যেন প্রতিধ্বনিত হয়। ফিৎজেরাল্ড সামান্য ইতস্তত করেন। একজন কৃতি পিতার, সফল মানুষের অবৈধ সন্তানের কথা তার ছেলে মেয়েদের কাছে জানাতে এই দ্বিধাটুকু স্বাভাবিকই। বহু বছর আগে, এ বাড়ীতে তাঁর ছেলে মেয়েদের দেখা শোনার জন্যে হ্যারী স্ট্যানফোর্ড একজন গভর্নেস রেখেছিলেন। রোজমেরী নেলসন, টাইলার জানায়। হ্যাঁ, সেই রোজমেরী, আপনাদের মায়ের মৃত্যুর পর যখন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যান তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। বলা বাহুল্য...। কথা শেষ না করে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে ফিজেরাল্ড এ ঘরের মানুষদের মুখগুলো নিরীক্ষণ করতে লাগলেন সময় নিয়ে।

সারা ঘর জুড়ে পিন পতন কবর অভ্যন্তরের স্তব্ধতা। সেই মেয়েটির, হারীর ঔরসজাত রোজমেরীর যে মেয়ে হয়েছিল, তার নাম জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড। ফিৎজেরাল্ড তার কথা শেষ করলেন। বেনডাল ধীর নীচু গলায় প্রশ্ন করে, মেয়েটি এখন কোথায়? সাইমন ফিজেরাল্ড মাথা নাড়ে, না, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। ওর কোন খোঁজ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। উডি অসহিষ্ণু গলায় বলে, তাহলে এসব কথা উঠছে কেন? সাইমন তার পেশাদারীত্ব বজায় রেখে বললেন, ব্যাপারটা আমি আপনাদের একারণেই বলে আগে থেকে জানিয়ে রাখলাম, কারণ ভবিষ্যতে কখনো কোনদিন যদি সে এসে হাজির হয় তবে কিন্তু আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে সেও আপনাদের বাবার সম্পত্তির সমান অংশ দাবী

করতে পারবে। সমান অংশীদার হিসেবে তাকে মেনে নিতে আইনগত ভাবে আপনারা বাধ্য থাকবেন। উডরোও আত্মবিশ্বাসের গলায় বলে, ভুলে যাও। ওরকম দিন কখনো আসবেই না। মেয়েটি হয়ত জানেই না। কোনদিন জানতে পারবেও না, কে তার বাবা।

সাক্ষাৎকার পর্ব, কথাবার্তা শেষ করে স্ট্যানফোর্ডদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে এসে বসে সাইমন ফিৎজেরাল্ড আগ্রহ ভরা চোখে স্টিভ সোলানের দিকে তাকালেন। স্ট্যানফোর্ড পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে কথাবার্তা বলে, তোমার কি অনুভব হচ্ছে স্টিভ? সোলানে মাথা নাড়ে, শোকের পরিবেশ থেকে একটা পারিবারিক মিলন উৎসবের আবহাওয়া মনে হচ্ছিল। একটু থেমে স্টিভ সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কথার খেই ধরে, আচ্ছা স্ট্যানফোর্ড নাকি তার ছেলে মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই ঘৃণা অপছন্দ করতেন। অথচ সেই ছেলেমেয়েদের জন্যই তিনি নিজের বিশাল সম্পত্তি দিয়ে গেলেন কেন? সাইমন একটা, গভীর শ্বাস ছাড়লেন। এ রহস্যের প্রশ্নের উত্তর জানবার আজ আর কোন উপায় নেই। তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, হয়ত তিনি সম্পত্তির পুরোটা বা কিছু অংশ অন্য কাউকে দেবার কথা, বর্তমান উইল-এর পরিবর্তন করার কথা ভেবেছিলেন। তাই আমাকে জরুরী তলব করেছিলেন।

সে রাতে ওদের কারোরই ভাল করে ঘুম হলো না। চুড়ান্ত উত্তেজনায় অস্থির মস্তিষ্কে হাতুড়ীর ঘা মেরে চলল একশো কোটিরও বেশি সম্পত্তির মালিকানা শব্দগুলো। যে যার নিজস্ব সুখ স্বপ্নের ভবিষ্যতের অবয়ব দেখতে পাচ্ছিল। টাইলার ভাবছিলো অবশেষে এটা সত্যিই ঘটল। এখন লিকে আমি তার যা ইচ্ছে হবে তাই এনে দিতে পারব। বেনডালের চিন্তা একটাই বেজন্মাগুলোকে আমি এবার একেবারেই কিনে নিতে পারব। সারাজীবন ধরে ওদের হাতে নিষ্পেষনের শিকার হওয়া থেকে মুক্তি এবার। উডির কল্পনাও আকাশ

ছোঁয়া, আমি নিজের একটা পোলো দল তৈরি করব। পরদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে ওদের সবাইকেই খুশি খুশি, উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। প্রাতরাশ সারতে সারতে ওরা নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে কথা বলছিল। তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছ। কিভাবে টাকাটা খরচ করবে? উডি বলে। মার্ক কাঁধ ঝাঁকায়, একশো কোটিরও বেশি, কয়েক হাজার ডলার তো নয়। ঐ বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করার পরিকল্পনা করা কি এত সহজ? এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়, মার্কের কথায় অন্যেরা সশব্দে সমবেত ভাবে হেসে ওঠে। এমন সময় ক্লার্ক ঘরে ঢোকে। সবাইকে বিনীতভাবে অভিবাদন জানিয়ে সে বলে, কুমারী জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড এসেছেন। তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

দুপুর

১৩.

ঘরে যেন বাজ পড়ল। ভূত দেখলেও বোধহয় ওরা এভাবে আঁতকে উঠত না। ওরা একজন, অন্যজনের মুখের দিকে স্তম্ভিত তড়িতাহতের মত তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ কয়েক মিনিটের ব্যবধানেই দরজায় দেখা গেল তাকে। ওদের সব কজনের দিকে চোখ বুলিয়ে অস্বস্তির ভঙ্গী হাবে ভাবে ফুটিয়ে তুলে সে বলে, আমার, আমার বোধহয় আসাটা... বোধহয় উচিত হয়নি। উডি অধৈর্য মেশান ক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে বলে, ড্যাম রাইট ইউ আর। টাইলার খাদে নামানো গলায় উডির ঠিক বিপরীত অভিব্যক্তি আর প্রকাশভঙ্গী থেকে বলে, কে আপনি, জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড? টাইলার তার জজসুলভ গাম্ভীর্য ধরে রেখেই ঠিক আগের কথার অভিব্যক্তির ধরনে বলে। আসলে, আমি জানতে চাইছি, বলতে চাই– আপনি ঠিক কে? আসলে কে? জুলিয়া কিছু বলতে যায়। তারপর থমকে যায় নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। ওর ঠোঁট ফাঁক হয়। শুধু শোনা যায়, আমি...আমার মা রোজমেরী নেলসন...আমার বাবা...বাবা হ্যারী স্ট্যানফোর্ড। জুলিয়াকে বাদ দিয়ে অন্য কজন পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকে। এ কথার কোন প্রমাণ আপনার কাছে আছে? দলটার হয়ে টাইলারই আবার কথা বলে। প্রশ্নটা তোলে, ছুঁড়ে দেয় জুলিয়ার দিকে। জুলিয়া ঢোক গেলে, ওকে যথার্থই বিব্রত দেখায়, না। সেরকম কোন শক্তপোক্ত প্রমাণ বা তথ্য আমার কাছে নেই। বেনডাল এবার কথা বলে... এটা, এটা যে আমাদের কাছে একটা আঘাত তা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পরেছেন? আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয় তবে...ইয়ে, আপনি আমাদের সৎ বোন হবেন। জুলিয়া ইতস্তত ভঙ্গীতে মাথা

নাড়ে। আপনি বেনডাল। মায়ের মুখে আপনার কথা খুব শুনেছি। জুলিয়া বেনডালের চোখে চোখ রেখে বলে, তারপর উডির দিকে ফিরে তাকায়, আপনি নিশ্চয়ই উডররাও। সবাই আপনাকে উডি বলে।

উডির মুখে প্রভাবিত হবার কোন চিহ্নই পড়ে না। বিরক্ত এবং সতর্কভঙ্গীতে দ্ব্যর্থবোধক উত্তর দেয়, পিপল পত্রিকা থেকে অনায়াসেই এসব কথা জানা যায়। টাইলার আবার কথা বলে। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে কোর্টে রায় দেবার ভঙ্গীমায় বলে, আশা করি আপনি আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পারছেন। কোন দৃঢ় যথোপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া আপনাকে, আপনার কথাকে মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। জুলিয়া নাভাস ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে সায় দেবার ভঙ্গীতে বলে, হ্যাঁ তা ঠিক। আমি কেন যে এলাম, নিজেই ঠিকঠাক জানি না, বুঝে উঠতে পারছি না। উডি ফোড়ন কাটে, বোধহয় আমি জানি । আপনার আসার কারণটি টাকা। জুলিয়া ঘরের সবার মুখের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। ভাল ভাবে সবাইকে নিরীক্ষণ করে নিয়ে কঠিন গলায় সে বলে, আপনারা আমায় ভুল বুঝেছেন। বাবার সম্পত্তির টাকায় আমার কোনো আগ্রহই নেই। আমি সেসব দাবী জানাতে আসিওনি। আমি...হয়তো কথাটা নাটকীয় শোনাবে কিন্তু আসলে সত্যিই আমি এসেছি আমার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে। কোনদিন না দেখা সব ভাইবোনেদের দেখতে। কেনডাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে নিরীক্ষণ করছিল। এবার সে বলে, তোমার মা কোথায় আছেন? টাইলার বলে, তোমার কাছে এমন কোন আইন গ্রাহ্য প্রমাণ নেই বলছ যাতে প্রমাণিত হয় তোমার সত্য পরিচয়? জুলিয়া বিষণ্ণ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে, সেটা তার আগেই ভাবা উচিত ছিল। এখন এই মুহূর্তে ওদের সবকজনের অবিশ্বাসী দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে যাচাই এবং অসম্মানের কষ্টি পাথরের নির্মম ঘষার জ্বালাবোধ করতে করতে তীব্র ঘৃণাবোধ হয়। না

এলেই বোধহয় ভাল করত। না আইন সঙ্গত কোন প্রমাণ আমার কাছে হয়ত নেই। তবে এমন কিছু কিছু কথা, যা হয়ত আমি মায়ের মুখে শোনা ছাড়া, অন্য কোন ভাবে জানা সম্ভব নয়।

মার্ক ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে, যেমন? জুলিয়া মাথা একপাশে হেলিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে। তারপর বলে, আমার মা প্রায়ই এ বাড়ীর পেছন দিকের একটা গ্রীন হাউসের কথা বলত। প্রচুর ধরনের... উডি ওকে বাধা দিয়ে মাঝ পথেই থামিয়ে দেয়। ঐ গ্রীন হাউসের ছবি অন্তত শদুয়েক পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এ পর্যন্ত। এছাড়া, তোমার মা আর কি বলেছিলেন? টাইলার প্রশ্ন করে, এ প্রশ্নে জুলিয়ার মুখ ঝলমল করে ওঠে, ওহ। সে যে কত কথা। তোমাদের সম্পর্কে বলতে আমার মা প্রচণ্ড ভালবাসত, তোমাদের সবার কথা এবং তোমাদের সঙ্গে যে দারুণ সুন্দর সময়টা কাটিয়ে ছিলেন, সে সম্পর্কে অনেক কিছু কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। একবার তোমাদের সবাইকে নিয়ে তিনি সোয়ান হ্রদে নৌকাবিহার করতে গিয়েছিলেন। তোমাদের একজন জলে পড়ে গিয়েছিল। কোন জন, তা আমি মনে করতে পারছি না। এ ঘটনা শুধু বেনডাল আর উডিই জানে। তারা টাইলারের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, আমি সেদিন জলে পড়ে গিয়েছিলাম। সে স্বীকার করে। তারপর একদিন কেনাকাটা করতে বের হয়ে তোমাদের একজন হারিয়ে যায়। অন্যেরা প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল তখন সেই ঘটনায়। বেনডাল ধীর গলায় বলে, আমি সেদিন হারিয়ে গিয়েছিলাম। সারা ঘর জুড়ে স্তব্ধতা এখন। ওরা নীরবে একজন অন্য জনের দিকে ইঙ্গিতবাহী দৃষ্টিতে তিন ভাই বোন দৃষ্টি বিনিময় করছিল। ঘরের পরিবেশ জুড়ে সেই হিরন্ময় নীরবতা ভেঙ্গে উডির দিকে তাকিয়ে জুলিয়া বলে, মা তোমায় একদিন চার্লসটাউনের জাহাজ ঘাটায় নিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধ জাহাজ দেখাতে। তুমি সেখান থেকে আর বাড়ী ফিরে আসতে চাইছিলে না কিছুতেই। প্রায় জোর জবরদস্তী

করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসতে হয়েছিল সেদিন। কথা শেষ করেই সে বেনডালের দিকে তাকায়, একদিন জনগণের জন্য সরকারী বাগানের গাছ থেকে তুমি বেআইনী ভাবে বিনা অনুমতিতে একটা ফুল ছিঁড়েছিলে। প্রায় গ্রেপ্তার হতে বসেছিলে পুলিশের হাতে সেদিন তুমি।

বেনডাল ঢোঁক গেলে, মাথা নেড়ে সায় দেয়, হা সত্যিই। এরকম ভাবে একের পর এক ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা বলে চলে সে। মনোযোগী শ্রোতার মত গভীর আগ্রহে ওরা সেসব শুনতে থাকে। দেখা যায় প্রতিটি ঘটনা ওদের কারো না কারো জীবনের সঙ্গে হুবহু সত্যভাবে জড়িত। এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নয় কোন ঘটনা। তারপর এক সময় সে থামে। আমি...আর কি বলার আছে। আর কিছু বাকি নেই বোধহয়। একথা বলে থেমে যায় সে, তারপর হঠাই যেন কিছু মনে পড়ে গেল। এভাবে বলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও তোমাদের একটা জিনিষ বোধহয় দেখাতে পারি। একটা ছবি, হাতব্যাগ খুলে মলিনতর বিবর্ণ হয়ে ওঠা একটা ছবি বের করে ওদের এগিয়ে দেয়। রোজমেরীকে ঘিরে ওরা তিন ভাই বোন। এবার ওদের তিন ভাইবোন যখন আগ্রহী, উদগ্রীব চোখে ছবিটাকে দেখছে। জুলিয়া ধীর গলায় কেটে কেটে বলে, তোমরা আমায় বিশ্বাস করছ কিনা তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। আমি তো আগেই বলেছি, কখনো যে বাবাকে চোখেই দেখলাম না তার টাকা সম্পত্তির প্রতি আমার কোন আগ্রহই নেই। সেসবের লোভ আমি আসিওনি। আমি এসেছিলাম...।আবেগে বাকরুদ্ধ গলা ঝাপসা হয়ে ওঠে, জুলিয়া থেমে যায়। টাইলার ওর আবেগকে সতর্ক চোখে নিরীক্ষণ করতে করতে বলে, তোমার অবস্থানটা আমরা বুঝতে পারছি। আমাদের অবস্থানটাও তুমি বোঝার চেষ্টা করো। একেবারে শূন্য থেকে আকাশ থেকে হঠাৎ তুমি এসে হাজির হলে। তেমন কোন প্রমাণও তোমার হাতে নেই, তোমায় মেনে নিতে, গ্রহণ করার জন্য নিশ্চিত হতে। আমাদের একটু ভাবার সময়

দেওয়া উচিত তোমার। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। জুলিয়া সায় দেয়। তারপর ঘরের সবার দিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে বলে, আমি ট্রিসন্ট হাউস হোটেলে উঠেছি। আমি এখন সেখানেই ফিরে যাচ্ছি। টাইলার সম্মতিসূচক ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলে, সেই ভাল, আমরা ভাই বোনেরা একটু এ ব্যাপারে কথা বলে নিয়ে তোমার সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করব।

ওরা জুলিয়ার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। জুলিয়া ঘর ছেড়ে চলে যাবার কয়েক মুহূর্ত পর বেনডাল বলে, তাহলে? আমাদের আরো একটি বোন আছে? আমি মোটেই সেকথা বিশ্বাস করি না। উডি হিংস্র ক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে বলে। মার্ক বলে ওঠে, আসলে, আমার মনে হয়...। সবাই একই সাথে কথা বলতে থাকে। বলেই চলে উত্তেজিত ভাবে। এক দুর্বোধ্য কোলাহল ছাড়া আর কারো কথাই কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। টাইলার হাত তোলে দৃঢ়তায়। সিদ্ধান্ত জানাবার কাঠিন্যসহ বলে ওঠে, এরকম করে, এভাবে আমরা কখনো কোনদিন আদৌ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব না। পুরো ব্যাপারটাকে আমাদের যুক্তি দিয়ে ভাবতে হবে। তবে সিদ্ধান্ত যাই হোক সেটা নিতে হবে একমত হয়ে। সবার সায় থাকতে হবে। উডি মাথা নাড়ে, একদম ঠিক কথা। টাইলার মাথা তোলে, ঘরের অন্য কজনের মুখের দিকে নজর বুলিয়ে বলে, বেশ। ধরা যাক আমরা সবাই জুরি, মেয়েটি নিজেকে আমাদের সৎ বোন হিসেবে পরিচয় দিতে চাইছে, তার দোষ অথবা নির্দোষিতা বিচার করছি। জুরিদের রায় বের হয়ে আসে মত প্রকাশের ভোটের মধ্যে দিয়ে। আমরাও : সেই পথই অবলম্বন করব। প্রথম মত এবং ভোটটি আমিই দিচ্ছি তাহলে। আমার মত মেয়েটি জোচ্চর। আমার ভোট তার বিরুদ্ধে, বিপক্ষে।

জোচ্চর! তুমি কি করে এত নিশ্চিতভাবে তা বলতে পারছ? মেয়েটি আমাদের ছোট বেলার যে সব ঘটনা বলল, জানে। তারপরও এরকম কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ ওর

প্রতি একতরফা ভাবে অন্যায়-অবিচার করা। বেনডাল তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলে। টাইলার, বেনডালের দিকে তাকায়, মুচকি হেসে, বলে, আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন এ বাড়ীতে একজন চাকর-চাকরানী কাজ করত? বেনডাল আচমকা ঐ ধরনের প্রশ্নে হতভম্ব হয়ে যায়। অবাক চোখে তাকায়, কেন? ডজন খানেক তাই নয় কি? তারা অনেকেই আমাদের ছোটবেলার ঐ সব ঘটনা জানে। জানা সম্ভব, তাই না? এবং তাদের কারো পক্ষে যে কোনভাবে আমাদের সঙ্গে রোজমেরীর ঐ ছবিটা পাওয়াও তখন মোটেই অসম্ভব ছিল না। টাইলার কি বলতে চাইছে বেনডাল এবং অন্যেরাও সহজেই বুঝতে পারে। এবং অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে জজের কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। মার্ক বলে, তাহলে চক্রান্ত? টাইলার মুখে বলে, কিন্তু আমরা প্রমাণ করব কী করে, ও জাল বা নকল। আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই।

সেটার উত্তর তোমরা কাল পাবে।

সাইমন ফিৎজেরাল্ড ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলেন, আপনি বলছেন, এত বছর পর জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড-এর আবির্ভাব ঘটেছে? একজন মহিলা এসে হাজির হয়েছেন, যিনি নিজেকে জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড বলে দাবী করছেন। টাইলার ওনাকে সংশোধন করার ভঙ্গীতে বলে। এবং আপনারা তাকে বিশ্বাস করছেন না? স্টিভ সোলানে প্রশ্ন করে, নিশ্চয়ই নয়। ওর পরিচয়ের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে কতগুলো ঘটনা শুধু বলেছে। দৃঢ় প্রমাণ হিসেবে কাউকে নিশ্চিত করে মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের সবার বিশ্বাস মহিলা একজন জোচ্চোর, জালিয়াত। সাইমন ফিৎজেরাল্ড ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে বলেন, সেটা প্রমাণ করার জন্য আপনারা কী করতে চান? খুব সহজ উপায় তো আছেই, ডি এন এ পরীক্ষা। সোলানে আঁতকে ওঠার মত করে বলে। তার মানে তো আপনার বাবার

দেহকে আবার কবর থেকে তুলতে হবে। টাইলার ফিৎজেরাল্ডের দিকে তাকিয়ে বলে, কী আর করা যাবে? এরকম পরিস্থিতিতে এটাই একমাত্র পথ। আপনি বাবার মরদেহ কবর থেকে তোলানোর আবেদন করুন। ফিৎজেরাল্ডও সায় দেবার ভঙ্গীতে বলেন, ঠিক আছে। সে ব্যবস্থা আমি না হয় করছি। কিন্তু মেয়েটি ডি এন এ পরীক্ষায় রাজী হবে কেন? এ ব্যাপারে ওর সাথে কোন কথা হয়নি। তবে যদি সে রাজী না হয় তবে বুঝে নিতে হবে যে পরীক্ষার ফলাফলে তার আপত্তি আছে। হয়ত ফলাফল তার বিরুদ্ধে যাবে বলেই। ফিৎজেরাল্ড দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলে, সত্যি বলতে কী, এসবে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। তবে এটাও সত্যি যে এরকম একটা বিতর্কিত সমস্যার সমাধান ঘটতে পারে এই পদ্ধতিতেই। এই একটাই পথ আছে। কয়েক মুহূর্ত চিন্তান্বিত ভাঁজময় কপালসহ তিনি দুচোখ বুজে রইলেন। তারপর স্টিভের দিকে তাকালেন, এই ব্যাপারটা সামলানোর দায়িত্ব আমি তোমায় দিলাম।

পরদিন সকাল দশটা, বাড়ীর পড়বার ঘরে ওরা সবাই জমায়েত হয়েছিল। ওরা সবাই মুখোমুখি বসেছিল এক নবাগতর। টাইলার ঘরের অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলে। এনার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি পেরি উইঙ্গার, একজন ডি এন এ বিশেষজ্ঞ। বেনডাল প্রশ্ন ও বিস্ময় জড়ানো চোখে টাইলারের দিকে তাকায়। ডি এন এ বিশেষজ্ঞ। এখানে ওনার কী কাজ? টাইলার অন্যদের সবার মুখে ঐ একই প্রশ্নের প্রতিক্রিয়া দেখতে পায়। আমি ঐ উড়ে এসে জুড়ে বসা মেয়েটিকে কিছুতেই মেনে নেবো না। শেষ পর্যন্ত দেখব। এবং ইনি তাতে সাহায্য করবেন? বেনডাল বলে, সেটা কি ভাবে? এবার পেরি উইঙ্গার মঞ্চে অবতীর্ন হন। ঘরের সব কজনের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, ডি এন এ পরীক্ষা হচ্ছে বংশগতির প্রমাণ সূচক পরীক্ষা। যাতে সন্দেহভাজন দুজনের দেহকোষকে মেলানো হয়। যদি দেখা যায় যে দুটি দেহকোষ ডি এন এ মিলে যাচ্ছে

তবে তারা একই বংশগতির বাহক, এখানে আমরা শ্রী স্ট্যানফোর্ডের দেহ থেকে ডি এন এ কোষ সংগ্রহ করব। তারপর ওর মেয়ে হবার দাবী যিনি করেছেন তার শরীরের ডি এন এ, যার পুরো নাম ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড নেবো। এটা রক্ত, চুল, বীর্য ধাতু এরকম যে কোন দেহ পদার্থ থেকে সংগ্রহ করা যায়। এবার দুজনের ডি এন এ জিন কোডকে ম্যাচ করানো হবে রসায়নাগারে। যদি তা মিলে যায় তবে প্রমাণ হবে উনি শ্রী স্ট্যানফোর্ডের সন্তান। আর যদি ম্যাচ না হয় তবে নিশ্চিত ভাবেই প্রমাণ হবে যে উনি জোচ্চোর প্রতারক। কথা শেষ করে পেরি উইঙ্গার কাঁধ ঝাঁকালেন। সে ভঙ্গীটির অর্থ হয়–এই ই সব। উডি প্রশ্ন করে, এই পরীক্ষাটা কতটা নিখুঁত এবং নির্ভরযোগ্য? পেরি হাসেন, দুশো শতাংশ। তার চেয়ে বড় কথা আইনের চোখে এই পরীক্ষার ফলই শেষ কথা।

ওরা সবাই এখন খাবার ঘরে। বেলা সাড়ে তিনটে। জুলিয়াকে কিছুটা সন্ত্রস্ত বিভ্রান্ত হতশ ও বিষণ্ণ, দেখাচ্ছিল। ইতিমধ্যে পেরি উইঙ্গার তাকে ডি এন এ টেস্ট-এর ব্যাপারে বিশদভাবে জানিয়েছেন। বিপন্ন মুখে সে বলে, আমি এই ব্যাপরে বাবার মৃতদেহকে কবর খুঁড়ে তুলে আনার ব্যাপারটা একদমই পছন্দ করছি না। ব্যাপারটা ভাবলেই কেমন গা ঘিনঘিন করছে। টাইলার মাথা নাড়ে, হয়ত তা ঠিকই, তবে তোমাকে তো বললামই জুলিয়া, এছাড়া কোন উপায় ছিল না। জুলিয়া বিপন্নতাময় ভঙ্গীতেই বলে, আমাকে কী করতে হবে। উইঙ্গার বলেন, একজন ডাক্তার তোমার চামড়ার নমুনা সংগ্রহ করবেন। তারপর সেখান থেকে তোমার শরীরের ডি এন এ কোষ সংগ্রহ করা যাবে এবং সেটিকে শ্রী স্ট্যানফোর্ডের মৃতদেহ থেকে একই পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা ডি এন এ কোষের সঙ্গে মেলানো হবে। আমি...আমি...এক দমই, ভাল লাগছে না ব্যাপারটা আমার। উডি উদ্ধত। প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করেন। কেন? কেন পছন্দ হচ্ছে না? জুলিয়া অসহায় ভঙ্গীতে

বলে, জানি না। তবে এত সব...কবর খোঁড়া..মৃতদেহ তোলা.. টাইলার শান্ত গলায় বলে, এবং সে সব...সব কিছু। শুধু তুমি যে সত্যি বলছ তা প্রমাণ করার জন্যে। এবার অন্তর্নিহিত তীব্র সন্দেহের খোঁচাটি জুলিয়া বুঝতে পারে। নিমেষে ওর মুখের রেখা অভিব্যক্তি বদলে যায়। ঘরে উপস্থিত সব কজনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নেয় সে। তারপর টানটান কঠিন মুখে বলে, ঠিক আছে। আমি রাজী।

কবর খুঁড়ে মৃতদেহ বের করার অনুমতি প্রশাসনের এবং কবরখানার দফতর থেকে বের করা সহজ কাজ নয়। পরের দিন কাটল সেই ব্যস্ততায়। অবশেষে অনুমতি পাওয়া গেল।

সোমবার সকাল নটায়, মৃতদেহ কবর থেকে তোলার অনুমতি পাওয়া গেল। নির্দিষ্ট দিনে টাইলার, উডি, বেনডাল, মার্ক, জুলিয়া, সাইমন ফিৎজেরাল্ড, স্টিভ সোলানে, পেরি উইঙ্গার এবং ডাঃ কলিন্স নামের একজন করোনোর দপ্তরের প্রতিনিধির সামনে মৃতদেহ তোলার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ওঁরা সবাই হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের কবরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কবরখানার চারজন কর্মী কবর খুঁড়ে কফিনসহ হ্যারী স্ট্যানফোর্ডকে বের করে আনার কাজে ব্যস্ত ছিল। এক সময় কফিনটি দেখা দিল। দ্রুত হাতে মাটি সরিয়ে ধরাধরি করে কবর খানার চার কর্মী কফিনটিকে মাটির গর্তের ওপরে তুলে আনল। কর্মীদলের কর্তাটি এবার এই দলটার দিকে ঘুরে তাকায়। এবার কী করতে হবে? পেরি উইঙ্গার এগিয়ে যায়। ডালাটি সরিয়ে দিন। আমি চট করে একটু চামড়ার নমুনা নিয়ে নিই। কর্মীদের একজন ধীরে ধীরে ডালাটাকে ঠেলতে থাকে। ডালা সরে যেতে থাকে। টাইলার, উডি, বেনডাল, জুলিয়া, মার্ক, পেরি টানটান হয়ে ওঠে। ওদের উত্তেজনার আঁচ

ছড়িয়ে পড়ে অন্যদের মধ্যেও। উপস্থিত সব কজন টানটান হয়ে ওঠা সাগ্রহ শরীরে ঝুঁকে পড়ে কফিনের দিকে। কফিনের ডালা পুরো খুলে যায়।

হে ভগবান, বেনডালের ঠোঁট দিয়ে বের হয়ে আসা শব্দগুলো আর্তচিৎকারের মত, তীব্র আতঙ্কতাড়িত শোনায়।

কফিন সম্পূর্ণ খালি।

.

১৪.

রোজ হিলের বাড়ীর বসবার ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিলেন ওরা সব কজন। ঘটনার তীব্রতর অভিঘাতে হতভম্ব স্তম্ভিত, আতঙ্কজড়িত। উডি ক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে বলে উঠল, হঠাৎ এটা সম্ভব হলে কী করে? কুত্তাটা এটা করল কী করে? টাইলার মাথা নাড়ে, এটাই তো লাখ ডলারের প্রশ্ন। নিশ্চিত ভাবেই ঐ মেয়েটা ছাড়া একাজ কেউ করেনি। অন্য কারো এরকম কিছু করার কারণ উদ্দেশ্যও তো কিছু নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কাজটা সে করল কী ভাবে? প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করল কী করে? এখন আমরা কী করব? কী করার আছে আমাদের? বেনডাল প্রশ্ন তোলে। টাইলার কাঁধ ঝাঁকাল, সত্যি বলতে কী আমি জানি না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই একটা কোন উপায়, অন্তত কিছু একটা পথ তো থাকবে? মার্ক উদ্বিগ্নতা ভরা গলায় প্রশ্ন করে। টাইলার তাকায়। ওর কপালে গভীর চিন্তা উদ্বেগের ভাঁজ। চিন্তান্বিত গলায় বলে, একটা, একটাই মাত্র পথ খোলা দেখতে পাচ্ছি আমি, একজন প্রাইভেড ডিটেকটিভকে দিয়ে ঘটনার তদন্ত করানো। যে

ঐ মেয়েটার আসল চেহারা, জালিয়াতিকে প্রকাশিত উন্মুক্ত করতে পারবে। উডি আগ্রহের গলায় বলে, এটা চমৎকার পরিকল্পনা, তোমার চেনাজানা এরকম কোন গোয়েন্দা আছেন? টাইলার বলে, না, আমার পরিচিত কাউকে এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়াতে চাই না। আমরা শ্রী ফিৎজেরাল্ড-এর সাহায্য চাইতে পারি এ ব্যাপারে। সবাই এ ব্যাপারে রাজী হয়। টাইলার ফোন তুলে নিলো। সাইমন ফিৎজেরাল্ডের নম্বর ঘোরায়। মিনিট তিন দুজনে কথাবার্তা হলো। তারপর ফোন নামিয়ে রেখে ঘরের অন্যদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, টিমমনস, ফ্রাঙ্ক টিমমনস তার নাম। এবং এটা তার ফোন নম্বর। তোমরা যদি রাজী থাকো, তাহলে আমি ভদ্রলোকের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। অন্যেরা সবাই এই কথায় রাজী হয়।

পরের দিন বিকেল, বসবার ঘরে ওরা সবাই অপেক্ষায় বসেছিল। এক সময় ক্লার্ক এসে খবর দেয়, ফ্রাঙ্ক টিমস নামের এক ভদ্রলোক এসেছেন, আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। উডি বলে, ওনাকে নিয়ে এসো। কয়েক মুহূর্ত পরই ক্লার্ক পথ দেখিয়ে ফ্যাকাসে রঙের শক্তপোক্ত গড়নের চল্লিশোর্ধ এক পুরুষকে এঘরে নিয়ে এসে হাজির করে। প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর, টাইলার সরাসরি কাজের কথায় চলে যায়। পুরো ব্যাপারটা বিস্তারিত ভাবে খুলে বলে টিমমনসকে। সব কথা শোনার পর টিমমনস বলে, ঠিক আছে, কেসটা আমি নিচ্ছি। ঘরের সব কজনের স্বস্তির শ্বাস ফেলার সশব্দ আওয়াজ শোনা যায়। ফ্রাঙ্ক টিমমনস বলে, আশা করি আমার পারিশ্রমিক সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই ওয়াকি বহাল। তবুও আমার কর্তব্য সেটা জানিয়ে দেওয়া। আমি দৈনিক একহাজার ডলার হিসাবে পারিশ্রমিক নিই। নিমেষে ঘরের আবহাওয়াটা বদলে যায়। সবাই যেন চমকে থমকে যায়। বেনডাল অবিশ্বাসের চেরা গলায় বলে ওঠে, দিনে..হাজার ডলার? টাইলারও চমকের অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঘরের বদলে যাওয়া

পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে জরিপ করতে থাকেন টিমমনস। উডি মরীয়া ভঙ্গীতে বলে ওঠে, ঠিক আছে। পারিশ্রমিকের ঐ অঙ্কই আপনাকে দেওয়া হবে।

প্রথম কাজই টিমমনস যেটা করলে বস্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে পুরনো দিনের খবরের কাগজ-এর মাইক্রোচিপ ঘেঁটে ঘেঁটে পঁচিশ বছর আগের স্ট্যানফ্যার্ড পরিবারের কেচ্ছাটির সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ে নিলো। লাইব্রেরী থেকে যখন বের হলো টিমমনসের মনে হলো একটা গোটা উপন্যাস লেখার মত রসদ জোগাড় হয়ে গেছে তার হাতে। এর পর সে এসে হাজির হলো সাইমন ফিৎজেরাল্ডের অফিসে। আমার নাম ফ্রাঙ্ক টিমমনস। ফিৎজেরাল্ডের সঙ্গে তার প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ করে সে যখন বের হয়ে আসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তার জানা হয়েছে। ৯ই আগষ্ট, ১৯৭৬ আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড জন্ম নেয়। কোথায়? এটা জানা তার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী ছিল। ফিৎজেরাল্ডের কাছ থেকে জানা গেল উত্তরটা। সেন্ট জোসেফ হাসপাতাল, মিলাউঁকি। সেই প্রথম এবং শেষবার ওদের মা-মেয়ের সম্পর্কে খোঁজ খবর জানতে পারা যায়। তার পরই ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়। জন সমুদ্রে মিশে যায়। আত্মগোপন করে।

শ্রীমতি ডোহার্টি, মিলাউঁকির সেন্ট জোসেফ হাসপাতালের সুপারিন্টেডেন্ট একজন ষাট বছর বয়সি রুপোলী চুলের বৃদ্ধা মহিলা। স্মৃতির পাতা উলটে পালটে দেখতে দেখতে একসময় তিনি বলে উঠলেন, হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। আরো আগেই অবশ্য মনে পড়া উচিত ছিল। আহ কি ভয়ঙ্কর কেচ্ছা, কেলেঙ্কারীর ঘটনা। রিপোর্টারগুলো পিছু তাড়া করে, গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এখানে পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছিল। ভাবতে পারেন? এখান থেকে ওরা কোথায় গিয়েছিল আপনি জানেন? না এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। ও চলে যাবার সময় কোন ঠিকানা রেখে যায়নি? টিমমনস এবার ব্যাপারটাকে অন্যদিক

থেকে ধরতে চায়। হাসপাতাল ছেড়ে যাবার সময় উনি কি পুরো পাওনা টাকা মিটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন? শ্রীমতি ডোহার্টি মাথা নাড়েন, না, ওরা মা-মেয়ে যখন হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার সময় এলো, রোজমেরী আমায় বলল, হাসপাতালের পুরো বিল মেটাতে পারবে না । কিছুটা দেবার মত টাকাই ওর কাছে আছে। এটা নিশ্চয়ই হাসপাতালের নিয়মের পরিপন্থী। কিন্তু কেন জানি না, মেয়েটার ওপর আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া মেয়েটি তখন ভীষণ অসুস্থ ছিল। তাই ওকে যেতে দিয়েছিলাম। যদিও রোজমেরী কথা দিয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের সমস্ত পাওনা সে অবশ্যই মিটিয়ে দেবে। তিনি কি পরে তা করেছিলেন? অবশ্যই। মাস কয়েক পরই সে ডাক মারফৎ একটা চেক পাঠিয়েছিল। হাসপাতালের পাওনা টাকা মিটিয়ে দিয়ে। ততদিনে ও একটা চাকরী পেয়েছিল। ঐ ডাক ফেরতের ঠিকানা, ওটা পাওয়া যাবে কি শ্রীমতি ডোহার্টি? আচমকা সোনার খনি আবিষ্কার করার মত উত্তেজনা চক চক করে ওঠে টিমমনসের চোখের তারায়। হে ভগবান! সে তো কোন আদ্যিকালের ঘটনা। দোহাই শ্রীমতি ডোেহার্টি এটা অত্যন্ত জরুরী। শ্রীমতি ডোহার্টি কয়েক পলক টিমমনসের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন,–আপনি বসুন, পঁচিশ বছরের পুরনো ফাইল ঘাঁটতে হবে, সময় লাগবে।

প্রায় মিনিট কুড়ি পর তিনি ফিরে এলেন। হাতে একটা লাল কাগজের টুকরো। হাসি মুখে তিনি টিমমনসের দিকে বাড়িয়ে এগিয়ে দিলেন–নিন, পেয়েছি।

এলিট টাইপিং সার্ভিস, ওমাহা, নেব্রসকা।

এলিট টাইপিং সার্ভিসের মালিক ওটাটো ব্রডরিকের বয়স প্রায় ষাটের কোঠায়। টিমমনসের কথার উত্তরে ঝাঁঝালো গলায় তিনি বললেন, আমরা প্রচুর অনিয়মিত অস্থায়ী কর্মীকে নিয়োগ করি। অতদিন আগের কোন একজনের কথা কি করে মনে রাখা সম্ভব? এটা একটা বিশেষ ঘটনা। একজন একাকী মহিলা। সদ্য প্রসব হওয়া অসুস্থ, ভগ্নস্বাস্থ্য। সঙ্গে সঙ্গে সদ্য জন্মান শিশু কন্যা। রোজমেরী? ওটটো ব্রডরিকের মুখ দিয়ে আচমকাই তীরের মত ছিটকে বের হলো নামটা। ঠিক ধরেছেন। ওর কথা কি করে মনে রয়েছে আপনার দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর বাদেও? ওটাটো হাসেন, আপনি Anemonies কাকে বলে জানেন? হ্যাঁ, স্মৃতি সহায় বিদ্যা, মনে রাখতে সাহায্য করে এমন পদ্ধতি। ঠিক বলেছেন। ও যখন এখানে কাজ করতে আসে তখনি একটা সিনেমা ছিল–রোজমেরিজ বেবী। তার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আমার। এবং... রোজমেরী নেলসন আপনার এখানে কতদিন কাজ করে ছিল? প্রায় এক বছর, তারপর, হঠাৎ কিভাবে যেন সংবাদ মাধ্যমের কাছে খবর পৌঁছে যায় ওর আসল পরিচয়। আমরাও তখনি জানতে পারি। সংবাদ মাধ্যমের উঁকি ঝুঁকি। যাতায়াত শুরু হতেই একদিন মাঝরাতে সে নিঃশব্দে এ শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। উনি কোথায় গিয়েছিলেন সে ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা আছে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। রোজমেরী একটু উচ্চতর আবহাওয়ার জলবায়ু পরিবেশে থাকার কথা বলত। আমিই ওকে ফ্লোরিডার গালে এজেন্সীতে যেতে বলেছিলাম।

দশ দিন পর আবার বস্টনে ফিরে এলো ফ্রাঙ্ক টিমমনস। রোজ হিলের বাড়ীর বসবার ঘরে স্ট্যানফোর্ড পরিবারের সদস্যদের মুখোমুখি হলো সে। ওদের সবকজনের তীব্রতর উৎসুক জ্বলজ্বলে দৃষ্টি এখন তার ওপরে নিবদ্ধ। টিমমনস তার ব্রিফকেস খুলে এক তাড়া কাগজ বের করলো। সেগুলোয় নজর বুলোতে বুলোতে সে মুখ খুললো। প্রথমেই আমি... ওর কথা শুরু হওয়া মাত্র টাইলার বাধা দিয়ে বলে ওঠে,–ওসব থাকুক, শ্রী

টিমমনস, আপনি শুধু আমাদের বলুন মেয়েটা জালিয়াত জোচ্চোর নাকি খাঁটি আসল; টিমমনস ঠান্ডা চোখে ওদের সব কজনের অতি আগ্রহের উত্তেজনায় প্রায় আদিমতর হয়ে ওঠা হিংস্রতার ছায়ামাখা মুখগুলোর দিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে কাটাকাটা গলায় বললো, যদি আপনারা কিছু মনে না করেন শ্রী স্ট্যানফোর্ড, আমার নিজের একটা পদ্ধতি আছে। আমি সেভাবেই কাজ করতে চাই। টাইলার উডির দিকে তাকালো। দুজনের মধ্যে সতর্কতার ইঙ্গিতবাহী দৃষ্টি বিনিময়ের পর টাইলারই বলে,–নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আপনি বলুন। সুতরাং টিমমনস বলে চলে, হাসপাতাল থেকে রোজমেরী নেলসন যায় ওমাহা, নেব্রাস্কাতে। চাকরী নেন–উষ্ণতর আবহাওয়া তার স্বাস্থ্য শরীরের পক্ষে উপযোগী হবে তাই। এর পর তিনি ফ্লোরিডায় বাস করতে থাকে। চাকরী নেন...এর পর। শেষ খোঁজ পাওয়া যায় দশবছর আগে। তখন তিনি সানফ্রান্সসিসকোতে বাস করছিলেন। এটা কি? টাইলার উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। দশবছর আগে? গত দশ বছরের খোঁজ আপনি জোগাড় করতে পারেননি? তাহলে তো কাজের কাজ কিছুই হলো না। পণ্ডশ্রম। ওর কথায় কান বা মনোযোগ না দিয়ে ফ্রাঙ্ক টিমমনস এক মনে নিজের হাতের কাগজগুলো দেখতে দেখতে এক সময় মুখ তুলল। মেয়েটি, জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছিল। তখন তার বয়স সতের বছর। উডি তীক্ষ্ণ রাগ মেশানো গলায় বলে, তাতে কি সোনার খনি আবিষ্কার হলো আমাদের? ফ্রাঙ্ক টিমমনস এক টুকরো কাগজে চোখ রেখে বলে, ক্যার্লিফোনিয়া রাজ্যের নিয়ম, প্রতিটি চালকের অনুমতিপত্র প্রাপ্তর আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহ করে রাখা। আমি সেখান থেকে একটা কপি করে এনেছি। কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিয়ে সে বলে, এই হচ্ছে আসল জুলিয়া স্ট্যানফোর্ডের আঙ্গুলের ছাপের নমুনা?

টাইলার সপ্রশংস চোখে টিমমনসের দিকে তাকিয়ে বলে, চমৎকার, তার মানে, যদি মেয়েটির ফিঙ্গার প্রিন্ট ঐ নমুনার সঙ্গে মিলে যায় তাহলে সে আমাদের সৎ বোন, খাঁটি। আর যদি না মেলে তাহলে... টিমমনস বলে, আমি সঙ্গে করে একটি পরিবহনযোগ্য আঙ্গুল ছাপ মেলানোর যন্ত্র নিয়েই এসেছি। উনি কি এখানে আছেন? তাহলে এখুনি পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যায় ফলাফল। টাইলার উত্তেজিত গলায় বলে, না, স্থানীয় একটি হোটেলে থাকছে সে। আমি এখুনি ফোনে ওকে বলছি এখানে চলে আসতে।

আধঘণ্টা বাদে, ওরা সদল বলে হোটেল ট্রিমন্ট হাউসে জুলিয়ার ঘরে হাজির হয়। কারণ ফোনে টাইলারের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখান করেছিল জুলিয়া। ওরা ঘরে ঢুকে দেখে জুলিয়া তার সুটকেস গোছাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছো তুমি? বেনডাল বলে। সে ওদের দিকে ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়ায়। তারপর দৃঢ় গলায় বলে, আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। আমারই ভুল। আমার এই দেখা করতে আসাটা। টাইলার অগোছালো ভঙ্গীতে বলে, তুমি তার জন্য আমাদের দায়ী করতে পারো না। ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত ভঙ্গীতে জুলিয়া বলে, আমার ওপর, প্রথম মুহূর্তটা থেকেই তোমরা আমায় সন্দেহের চোখে দেখছ, অথচ বারবার আমি তোমাদের বলেছি, বাবার সম্পত্তিতে আমার কোনরকম লোভ বা দাবী নেই। আমি এসেছিলাম, বাবার মৃত্যুর খবর জানতে পেরে, তোমাদের সঙ্গে, আমার সৎ ভাই বোনদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু বিনিময়ে কী পেলাম, শুধুই সন্দেহ আর অবিশ্বাস। দুচোখ জলে ভরে ওঠে ওর। টপটপ করে এক সময় চোখ ভাসিয়ে দুগাল বেয়ে নেমে আসে। টাইলার থমকে যাওয়া পরিবেশের ভারী আবহাওয়ার নৈঃশব্দ্য ভাঙ্গে, জুলিয়া পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ফ্রাঙ্ক টিমমনস, একজন গোয়েন্দা। জুলিয়া জলভরা অথচ খর চোখে তাকায়। এবার কি? আমায় গ্রেপ্তার করা হবে? ভদ্রমহোদয়া জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড সানফ্রান্সিসকোতে গাড়ীর চালকের সরকারী অনুমতি অর্থাৎ লাইসেন্সের জন্য আবেদন

করেছিলেন। জুলিয়া দুই ভুরু কুঁচকে এক ঝলক ভাবে। তারপর উত্তর দেয়, হ্যাঁ, অবশ্যই মনে পড়েছে। তাতে কী, সেটা কি আইন বিরুদ্ধ কোন কাজ নাকি আপনার মতে।

টিমমনস মাথা নাড়ে, না, মহোদয়া নিশ্চয়ই নয়, আসলে কথা হচ্ছে... টাইলার হঠাৎ বাধা দেয়। কথাটা হচ্ছে, সেই জুলিয়া স্ট্যানফোর্ডের আঙ্গুলের ছাপ লাইসেন্সে আছে। ওদের দিকে তাকিয়ে জুলিয়া কিছুটা বিভ্রান্তের মত বলে, আমি বুঝতে পারছি না...। এত সব কথা...। উডি বলে ওঠে, আমরা চাই সেই লাইসেন্সে দেওয়া জুলিয়া স্ট্যানফোর্ডের নমুনার সঙ্গে তোমার আঙ্গুল ছাপ মিলিয়ে যাচাই করতে। জুলিয়া শক্ত মুখে বলে, না, আমি তা করব না। মার্ক প্রশ্ন করে, কিন্তু বোন, দেবে না কেন? ওর শরীর কাঁপতে থাকে। জুলিয়া ফেটে পড়া রাগের অভিব্যক্তিতে বলে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছ যেন আমি অপরাধী। যথেষ্ট হয়েছে, তোমাদের ওসব খেলায় আর আমি নেই। আমি চলে যাচ্ছি। বেনডাল নরম গলায় বলে, দেখো জুলিয়া, যা ঘটছে। যা করতে হচ্ছে তা আমাদেরও ভাল লাগছে না। কিন্তু আইন এবং নিজেদের মনের কাছে পরিষ্কার থাকার জন্য, এসব কিছু করতে বাধ্য যাচ্ছি আমরা। কিন্তু এবার এসবের শেষ হওয়া একটা সমাধান সূত্রে পৌঁছান দরকার। এই ব্যবস্থাটা তোমায় সুযোগ করে দিচ্ছে প্রমাণ দেবার। তুমি আসলে কে প্রমাণ করে দিয়ে গোটা অধ্যায়টাতে পর্দা টানাও। তুমি পিছিয়ে যাচ্ছো কেন? জুলিয়া কথাগুলো শুনে বেনডালের মুখটাকে সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। তারপর ওর দৃষ্টি ফেরে অন্যদের দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অন্যদের মুখগুলো দেখে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ওর শক্ত মুখ আরো কঠিন হয়ে ওঠে। তারপর দৃঢ় গলায় ও বলে, বেশ, আমি রাজী।

টিমমনস এগিয়ে আসে। জুলিয়ার দিকে একটা কালি প্যাড এগিয়ে দেয়। জুলিয়া সযত্নে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল কালি প্যাডে চেপে কালি লাগায়। টিমমনস ম্যাচিং মেশিনটা খোলে। সেই যন্ত্রের পর্দার বাঁ দিকে ড্রাইভিং লাইসেন্সে দেওয়া আঙ্গুলের ছাপের নমুনা ফুটে রয়েছে। জুলিয়া এগিয়ে যায়। যন্ত্রের সেনসার লেন্সে নিজের বুড়ো আঙুল চেপে ধরে, পর্দায় নতুন দেওয়া ছাপের আকার ফুটে ওঠে। টিমমনস ফলাফল লেখা বোতামে চাপ দেয়। দুদিক থেকে দুটো ছাপ ক্রমে পর্দায় মাঝ বরাবর সরে আসতে থাকে। পুরনো ছাপটার ওপরে নতুন ছাপটা এসে চেপে গায়ে গায়ে লেগে বসে। দুটো ছাপই একটার সঙ্গে অন্যটা হুবহু মিশে যায়। নিমেষে পর্দা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে লাল আলো। ছাপ দুটোর মিশে যাওয়া প্রতিচ্ছবির ওপর বড়বড় অক্ষরে লেখা ফুটে ওঠেনমুনা যাচাই সঠিক মিল চিহ্নিত।

সারা ঘর জুড়ে কয়েক মুহূর্তের চূড়ান্ত নৈঃশব্দ। তারপর, হিরন্ময় নীরবতার সেই মুহূর্তগুলো পার হয়ে বেনডালই প্রথম কথা বলে-স্ট্যানফোর্ড পরিবারে স্বাগত আমাদের সৎ বোন। দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বেনডাল। অন্যেরাও ততক্ষণে স্বতস্ফুর্ত হাততালিতে ঘর ভরিয়ে তুলেছে। জুলিয়ার দুচোখ বেয়ে তখন আনন্দার ঝরঝর ধারা।

.

রাত, রোজ হিলের বাড়ীটা স্তব্ধতায় ঢেকে রয়েছে। বিকেলেই মালপত্র সমেত জুলিয়াকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসেছে ওরা। হোটেলের পাট চুকিয়ে দোতলায় সুন্দর করে সাজানোনা একটা ঘর দেওয়া হয়েছে ওকে থাকার জন্য। রাতের খাওয়ার পর ওরা যে যার ঘরে

ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের সবার চিন্তাতেই ঘুরছিল একটাই বিষয়, ওদের নতুন সৎ বোন জুলিয়া।

ওর নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে ও একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে। যা ঘটছে তা বাস্তব নয়। সত্যি ঘটছে না–টাইলার।

ও ব্যাপারটা কিভাবে সইয়ে নিচ্ছে? বাকী জীবনটাকে এখন এরপর কিভাবে অ্যাডজাস্ট করবে, ভারসাম্য বজায় রাখবে? –বেনডাল।

যেভাবে আমরা সবাই সব কজন হঠাৎ নবাব হওয়া ভাইবোন নিজেদের জীবনকে অ্যাডজাস্ট করব, ও নিশ্চয়ই একইভাবে জীবনের ভারসাম্য ধরে রাখবে–উডি।

অ্যাডজাস্ট ভারসাম্য, এসব কচকচানি নিয়ে কে মাথা ঘামায়? আমার তত্ত্ব হচ্ছে জীবনকে প্রাণ খুলে উপভোগ করে নাও। শ্যাম্পেন, ক্যাভিয়ের, ও নিশ্চয়ই তাই ভাবছে? –মার্ক।

রাত পা বাড়াচ্ছে গভীরতার দিকে, টাইলার দরজা খুলে বের হয়ে আসে। চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যায়। জুলিয়ার ঘরের সামনে এসে দরজায় করাঘাত করে হালকাভাবে। দরজা খোলা আছে, চলে এসো। ঘরের ভেতর থেকে শোনা যায়। টাইলার দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। বিছানায় উঠে বসেছে জুলিয়া, দুজনে কয়েক মুহূর্ত দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর টাইলার দুহাত বাড়িয়ে দেয়, এগিয়ে যায়, জুলিয়াও এগিয়ে আসে। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে এবং ধীর নিঃশব্দ হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে। টাইলার যখন কথা

বলে, শোনা যায় সে বলছে, আমরা পেরেছি মার্গো, আমরা করতে পেরেছি, সফল হয়েছি।

রাত্রি

১৫.

গোটা ব্যাপারটাকে সে প্রায় শিল্পীতুল্য দক্ষতায়, ছবির মত পরিকল্পনা করে, একজন মাস্টার দাবা খেলুড়ের মত খেলেছিল। সম্ভবত, পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে দামী দাবাচাল, বিলিয়ন ডলারের অনেক অনেক বেশি সে দাবা চালটির দাম। এবং সে জিতেছে। জিতে গেছে। এক অপরাজেয় বোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। বাবা, একটা বিরাট বড় ব্যবসায়িক সাফল্যময় চুক্তি করার পরে তোমার মনেও কি এই রকম কোন বোধ হত? অনুভব? যদি তোমার জীবনের যে কোন বড় ব্যবসায়িক ডিল-এর সবচেয়ে বড়টির চেয়েও অনেক-অনেক বড় আমার এই ডিলটি। আমি শতাব্দীর সেরা ক্রাইমটি ঘটাতে চেয়েছিলাম এবং সাফল্যের সঙ্গে সেটা করে বেরিয়ে গেছি।

এটা শুরু হয়েছিল লিকে দিয়ে, অসাধারণ সুন্দরী লি। যাকে সে এই পার্থিব জগতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। লি-এর সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়েছিল বার্লিন, জার্মানীতে। পৃথিবীতে টাইলারের দেখা সবচেয়ে সুন্দরী শ্রেষ্ঠ নারী। যাকে প্রথম দর্শনে দেখা মাত্রই টাইলার মোহিত, মন্ত্রমুগ্ধ চুম্বকের মত আকর্ষিত হয়েছিল, তাদের আলাপ এর শুরুটা ছিল এরকম–আমরা কি এক সঙ্গে এক পাত্র পান করতে পারি। লি ওর দীঘল চোখ তুলে তাকিয়ে এক ঝলক ওকে লক্ষ্য করে। স্মিত হাসে, কেন নয়? প্রথম পাত্র পান করার পর টাইলার প্রস্তাব দেয়, পরের পাত্রটা আমার বাড়িতে গিয়ে পান করলে কেমন হয়? লি ওর দিকে তাকিয়ে বলে, আমি কিন্তু দামী, মহার্ঘ। কথাটা শুনে টাইলার নিজের

সীমিত আর্থিক ক্ষমতার কথা ভেবে একটু থমকে যায়। কতোখানি দামী? পাঁচশ ডলার এক রাতের জন্য। টাইলার প্রাথমিক ভাবে ইতস্তত করে, পাঁচশ ডলার? কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিকে দেখার পর তার মধ্যে জ্বলে ওঠা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, দাউদাউ কামনার আগুনেরই জয় হয়। নিজের ইতস্ততঃ ভাব দ্রুত কাটিয়ে টাইলার বলে, চল যাওয়া যাক। এবং সে রাতটা টাইলারের জীবনের একটা স্মরণীয় রাত। সারাটা রাত লি টাইলারের বাড়িতে কাটিয়েছিল। পরদিন সকালে, বলা ভাল ভোর রাতে লি চলে যাবার পর থেকেই টাইলার বুঝেছিল লি-এর আকর্ষণে প্রায় মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়া এক পতঙ্গের মতই আটকে পড়েছে। পাগলের মত অন্ধভাবে লি-কে ভালবাসে সে।

অথচ নারীর শরীর, নারীর যৌন আকর্ষণের প্রতি কোন দিনই তার কোন আগ্রহ ছিলো । প্রতিরাতে, বিভিন্ন সমকামী আড্ডা থেকে সঙ্গী যোগাড় করে আনত সে। কিন্তু লিকে দেখার পরই সে বুঝেছিল যে, জীবন ও পুরনো অভ্যাস, নিজের বিগত যৌনজীবন সব কিছু বদলে যেতে চলেছে। লি, শুধু লিই তখন তার জীবন জুড়ে। এবং তাই থাকবে। পরদিন সন্ধ্যেতে লি-এর সঙ্গে যখন আবার তার দেখা হলো, আজ রাতে তুমি কী করছ লি? প্রশ্নটা শুনে লি ক্রু কুঁচকে তাকায়। আজ রাতে? আমার একজনের সঙ্গে ডেট আছে। টাইলার কথাটা শুনে কেঁপে ওঠে। ওর তলপেটে কে যেন বিরাশি সিক্কার ঘুষি মারল। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। চরম বিস্ময়ের গলায় সে বলে, কিন্তু...কিন্তু...লি। আমি...আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমায় অথবা দুজনে...। লি উচ্চস্বরে হেসে ওঠে, টাইলার সোনা, বোকার মত কথা বলল না। আমি হচ্ছি অত্যন্ত দামী বস্তু। যে নিলামের সর্বোচ্চ দর হাঁকে আমি তারই হই। তোমায় আমি পছন্দ করি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমাকে পোষবার মত ক্ষমতা তোমার নেই। মোক্ষুস্বকের তীব্র আবেগ তাড়নায় টাইলার ডুকরে ওঠে। ওকথা, বলল না লি। তুমি যা চাও আমি তাই দিতে পারি। যা চাইবে। লি

আবার উচ্চস্বরে হেসে ওঠে, এবার তাতে বিদ্রূপ মেশানো, বেশ, আমি চাই সেন্ট ট্রপেজ দ্বীপে বেড়াতে যেতে, দুধসাদা এক বিলাসবহুল ইয়টে করে সমুদ্র যাত্রায় যেতে চাই। তুমি কি পারবে? নিয়ে চলো তাহলে আমায়। সেই শুরু টাকা। এক অবসেশান হয়ে উঠল টাইলারের কাছে টাকা। লিকে তার চাই-ই আর লিকে পেতে গেলে টাকা চাই। প্রচুর টাকা। কিন্তু কিভাবে? লিকে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে দেখার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না সে। লিকে তার চাই সম্পূর্ণ নিজের জন্য এককভাবে। আর তার জন্য তার টাকা চাই। যে ভাবেই হোক প্রচুর অর্থ রোজগার করতেই হবে তাকে।

বারো বছর বয়স থেকে সে জানত, বুঝে গিয়েছিল যে সে সমকামী। একদিন, তখন সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। ক্লাসেরই একটা ছেলের সঙ্গে যখন...। বাবার কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে যায়। আমি ভাবতে পারছি না, আমার ছেলে একজন... ঘৃণামেশা অন্ধ রাগের দাপট আছড়ে পড়েছিল টাইলারের শরীরে। কিন্তু কিছু তাকে থামাতে পারেনি। অভ্যাস আরো তীব্রতায়, এক নেশার মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে।

ওর বিয়েটা ছিল একটা জঘন্যতর কৌতুক, আমি তোমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করাতে চাই। বাবা একদিন ওকে বললেন, সেটা ছিল বড়দিনের ছুটি। অন্য ভাইবোনেরা ফিরে গেছে ছুটি কাটিয়ে। সে তখন একা, বোমাটা বাবা তখনি ফাটালেন। তোমার বিয়ে দিতে চাই আমি। টাইলার আকাশ থেকে পড়েছিল। সে জানত তা সম্ভব নয়। নিজের অনিচ্ছা বাবাকে জানাতেই তিনি বললেন, শোনো, লোকে তোমার নামে নানা কথা বলছে। আমার সামাজিক সম্মানের পক্ষে তা মোটেই উপযুক্ত নয়। তখন তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে দৃঢ় প্রতিবাদের গলায় সে বলেছিল, লোকে কী বলে, বলেছে, তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হ্যারী স্ট্যানফোর্ড বলেন, বেশ তুমি

তাহলে তোমার নিজের ইচ্ছেতেই চলল। আমি ভেবে ঠিক করে রেখেছিলাম তোমার জন্য একটা ধনী জীবন, প্রচুর পয়সা, আমার বয়স হয়ে আসছে। আর কতদিন.. গাজর আর প্রলোভনের সেই পুরনো গপপো। সুতরাং নাওমি শিওলারের সঙ্গে ওর বিয়েটা হয়েই গেল। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নাওমির কাছে জীবনকে আরো উন্নততর বিলাসবহুল করে তোলার প্রয়োজনে স্ট্যানফোর্ড পরিবারের একজন হয়ে ওঠা একটা জ্বলন্ত স্বপ্ন। আসলে নাওমি যারী স্ট্যানফোর্ডের কয়েক রাতের অঙ্কশায়িনী হয়েছিল। দ্রুতই নাওমি একঘেঁয়ে হয়ে উঠল তার কাছে। এবং ওকে টাইলারের জন্য উপযুক্ত ঠিক করে ফেললেন তিনি।

খুবই সাধারণ একটা বিয়ে, সামান্য কয়েকজন নিমন্ত্রিত অতিথি। বিয়ের পরের রাত গুলোতেই ওর উদ্যোগহীনতায় হতবাক নাওমি মুগ্ধস্বরে বলে, কেমন ধরনের পুরুষ মানুষ তুমি? নিজের পুরুষত্বটা কী জন্য তোমার? টাইলার ঠান্ডা গলায় বলেছিল, আমাদের জীবনে, যৌনতার কোন জায়গা নেই। তুমি তোমার মত থাকো, আমি আমার মত। নাওমি প্রতিশোধটা নিয়েছিল অন্যভাবে। প্রচুর খরচ করতে শুরু করে সে। দামী বহুমূল্য জামাকাপড়, সুগন্ধী, গহনা কিনে ওকে ফতুর করে চলে। এ নিয়ে কোনরকম অভিযোগ করলে সে বলে, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার অর্থ খরচ করার অধিকার আমার আছে। কিন্তু এত খরচ, বিলাসবহুল জীবনের সামর্থ আমার নেই। অত অর্থ আমি রোজগার করি না। তাহলে সেটাকে বাড়াও, সাফ জবাব দিলো নাওমি। এ ব্যাপারে বাবার কাছে অভিযোগ জানিয়ে, তারও সোজা স্পষ্ট কথা শুনেছিল, নারী সব সময়ই দামী বহুমূল্য এবং খরচ প্রবণ। পুরুষের তা সামলানোর ক্ষমতা রাখা উচিত। এভাবেই তাকে রিক্ত প্রায় ফতুর করে দেবার পর, বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল নাওমি।

.

একবার সে তখন একটা জরুরী মামলা নিয়ে ব্যস্ত, বাবা তাকে ডেকে পাঠান। আমার পক্ষে এখন কী করে যাওয়া সম্ভব? আমি একটা জরুরী বিচারের কাজে ব্যস্ত। ফোনে বাবার অন্য রকম গলার আওয়াজ ভেসে এসেছিল। তুমি আমায় হতাশ করছ টাইলার, দেখি আগামী কাল তাহলে ফিৎজেরাল্ডের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমার উইলে কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে। সেই গাজর প্রলোভনের ঝোলা। টাইলার, ভীষণ রকম অসহায় বোধ করেছিল। সারাজীবন ধরে বাবা ওর সঙ্গে এরকম ব্যবহারই করে যাচ্ছেন। সে অবশেষে ইতস্তত করে নিম রাজি হয়ে বলে, তুমি কি তাহলে তোমার ব্যক্তিগত বিমানটা পাঠাবে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে? না, বিচারক টাইলার, এই বিমান, আমার সমস্ত সম্পত্তি সবই একদিন তোমারই হবে। যদি তুমি তোমার দানগুলো ঠিকঠাক মত দিয়ে যেতে পারো। কিন্তু এখন তোমাকে আসতে হবে সাধারণ মানুষের মত, যাত্রী বিমানে।

সে এসে পৌঁছানোর পর বাবা তাকে যা বলেছিল তাতে সে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। আমার কর্মচারীরা প্রত্যেকটা চোর। লুটেপুটে শেষ করে দিচ্ছে আমায়। এই সামান্য কারণের জন্য এত হাজার মাইল দূর থেকে উড়িয়ে আনা হলো তাকে। বিশেষ করে সে যখন একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচারে ব্যস্ত। তখন এই অর্থহীন ব্যাপারটা করে বাবা কী প্রমাণ করতে চাইলেন? টাইলারের পেশাটার কোন গুরুত্বই নেই, অন্তত বাবার কাছে। তুমি এ ব্যাপারটা পুলিশকে জানাচ্ছ না কেন? অথবা কোন বেসরকারী গোয়েন্দা? কারণ তুমি তো আছো তাই। তুমি তো বিচারক। এ ঘটনাটার বিচার করো। এসে যখন

পড়েছে, বাবার অভিযোগটাকে খতিয়ে দেখল টাইলার। যা বুঝল, কোথাও আপত্তিকর কিছু বা কোন গণ্ডগোলই নেই। বাবার নিছক কল্পনাই প্রায় পুরোটা। ব্যতিক্রম দিমিত্রি কামিনস্কি। রাশিয়ান এই পুরুষটিকে বাবা দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। বিচারকের আসনে বসে দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মানুষের মন চরিত্র বুঝতে পারার একটা আশ্চর্য সহজাত বোধ বা ক্ষমতা টাইলারের জন্মে গিয়েছিল। যে বোধ বা ক্ষমতার সাহায্যেই, দিমিত্রিকে নিয়ে কোথায় যেন একটা অবিশ্বাস বা সন্দেহের খটকা তার মনে টিক টিক করে চলল। বিনা কারণেই হেনরি স্ট্যানফোর্ডের আগের দেহরক্ষী চাকরি ছেড়ে দেয় এবং সেই কামিনস্কিকে সুপারশি করে যায়। একদিন নিজের খটকা নিয়েই সে দিমিত্রির মুখোমুখি হয়। প্রায় কুড়ি মিনিট দুজনের নানা বিষয়ে কথা হয়। রাশিয়া ছেড়ে আমেরিকায় কেন এলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রশ্নটাকে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গী করে সে বলে, আরো ভাল সুযোগের জন্য? ভাল সুযোগ? কিসের? ঐ সাক্ষাতকারের পর, নিজের সন্দেহ আরো দৃঢ় তো হয়ই, দিমিত্রি যে কিছু গোপন করছে সে ব্যাপারেও টাইলার নিঃসন্দেহ হয়।

সে ফ্রেড মাস্টারসন নামে এফ বি আই দফতরের এক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। ফ্রেড আমি তোমার কাছে একটা খোঁজ চাই।কী ব্যাপারে? দিমিত্রি কামিনস্কি নামের একজন রুশীর। মাস দুয়েক আগে সে আমেরিকায় এসেছে। মাস্টারসন আশ্বস্ত করে, ঠিক আছে টাইলার। একজন আছে রাশিয়ান এমবাসিতে আমার পরিচিত। তার মাধ্যমে সি আই এ থেকে ব্যাপারটা খোঁজ করে দেখছি। ধন্যবাদ বন্ধু। পরের দিন রাতে মাস্টারসনের ফোন এলো। ওহে বন্ধু তুমি তো বড় মাপের বিরাট মাছ শিকার ধরেছ।– টাইলার আগ্রহের গলায় বলে, কেন? কী ব্যাপার? আমায় সব কিছু বিস্তারিত খুলে বলল। বলছি দোস্ত, বলছি। দিমিত্রি কামিনস্কি পোলগোপুরু নেনস্কায়া-র একজন পেশাদার খুনে,

হিটম্যান। ঐ বদখত রুশী শব্দটা, ওটার মানেটা কি? বলছি, আটটা শক্তিশালী অপরাধ চক্র এখন মস্কোতে শাসন কায়েম করেছে। তোমার ঐ কামিনস্কি দ্বিতীয় দলের হয়ে কাজ করে। তিনমাস আগে ওকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়। একজন শীর্ষ স্থানীয় চেচেন গোষ্ঠীর নেতাকে খুন করার। কিন্তু দিমিত্রি দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আরো বেশি টাকার বিনিময়ে সে খুন না করে শিকারকে ছেড়ে দেয়। ঘটনাটা জানতে পারার পর দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসেবে পোলগোপুরু নেনস্কায়া-র খতম তালিকায় দিমিত্রির নাম ওঠে। দলের সদস্যরা হন্যে হয়ে ওকে পৃথিবী জুড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটা খুনের অপরাধী হিসেবে রাশিয়ান পুলিশও ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ও কোথায় যদি তোমার জানা থাকে তবে ওর পুরনো দল বা পুলিশ যে কোন এক পক্ষকে মোটা দামে সে খবর বেচতে পারো তুমি অনায়াসে।

সেরকম কোন ইচ্ছেই তার নেই। মাফিয়া চক্রের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ একজন বিচারক হিসেবে পেশার পক্ষে বিপজনক। আর পুলিশ? তার মানেই তো সাক্ষ্য দেওয়া, আদালত হাজিরা নিয়মিত। না নষ্ট করার মত অত সময় তার নেই। তাছাড়া...

দিমিত্রিকে তার ঘরেই পেয়ে গেল সে। একটা যৌন পত্রিকায় মুখ ডুবিয়েছিল। তুমি, আজ চলে যাবে এ বাড়ী ছেড়ে। কোন ভনিতা না করে টাইলার সরাসরি কাজের কথায় চলে আসে। অবাক চোখ তুলে তাকিয়ে দিমিত্রি প্রশ্ন করে, কি ব্যাপারটা কি? টাইলার আরো খোলসা হয়। সোজা, তীব্র চোখে তাকায়, আমি তোমাকে দুটো পছন্দ দিচ্ছি। হয় আজ বিকেলের মধ্যে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাও, নাহলে কাকে খবর দিলে তুমি পছন্দ করবে? তোমার পুরনো দল নাকি রাশিয়ার পুলিশ? নিমেষে দিমিত্রির মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। –ঠিক আছে, ঠিক আছে আমি চলে যাবো। দিমিত্রি ঘর থেকে বের হয়ে বাবার

ঘরে আসে। মনটা খুশি, ফুরফুরে মেজাজ, বাবার জন্য একটা বড় কাজ করেছে। বড়। বিপদ থেকে তাকে বাঁচিয়েছে। বাবা, আমি তোমার সমস্ত কর্মচারীদের পরীক্ষা করেছি। আমি দেখলাম...–তাই নাকি? আমি প্রভাবিত। তা কোন শিশুকে খুঁজে পেলে? যাকে নিয়ে তুমি বিছানায় যেতে পারো? আচমকা আক্রমণে (এবং বিনা কারণে) থতমত খেয়ে যায় টাইলার। ওর মুখ অপমানে লাল হয়ে যায়। বাবা... কোন রকমে ধরা গলায় বলে। এধরনের বদমেজাজ, হঠাৎ রাগ, জন্ম থেকেই দেখছে, তাই অবাক হয় না। তুমি একটি অপদার্থ। চিরকালই তুমি একটি অপদার্থ। যাও শিকাগোতে ফিরে যাও এখনি। তোমার নর্দমার পাকের মত দুর্গন্ধী বন্ধু-বান্ধবদের খোঁয়াড়ে ফিরে যাও। আমার ঔরসে যে কী করে এরকম নিষ্কর্মার জন্ম হয়। হতে পারে, তা এক রহস্য আমার কাছে। টাইলার দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের রাগকে দমন করতে চেষ্টা করে। তারপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে শীতল কাটা কাটা গলায় বলে, বেশ, আমি চলেই যাচ্ছি। সে যখন ঘুরে চলে যাচ্ছে। বাবার ধারালো গলা শুনতে পায়, আমার কর্মচারীদের সম্পর্কে তুমি যেসব তথ্য আবিষ্কার করেছ তার মধ্যে কি এমন কিছু আছে যা আমার শোনা উচিত? জানা প্রয়োজন? এক তীব্রতর বিবমিষা ওকে তাড়িত করে। তিক্ত গলায় ও বলে, না তেমন কিছুই নয়।

ও যখন ঘরে ঢোকে কামিনস্কির জিনিসপত্র গোছানো শেষ। আমি চলে যাচ্ছি, ধীর গলায় বলে সে। না, যেতে হচ্ছে না তোমায়। আমি মত বদল করেছি। কি? হতভম্ব ধাঁধাগ্রস্ত চোখে তাকায় কামিনস্কি। তুমি কোথাও যাচ্ছে না। আমি চাই তুমি আমার বাবার দেহরক্ষী হিসেবেই বহাল থাকে। তাহলে...ঐ ব্যাপারগুলো...যেগুলো তুমি জানো আমার সম্পর্কে? যদি তুমি আমার কথা মত কাজ করতে রাজী থাকো। কামিনস্কি স্থির চোখে কয়েক পলক ওকে লক্ষ্য করে, আমাকে কি করতে হবে? আমি চাই আমার চোখ এবং

কান এখানে থাকুক। কেউ একজন সারাক্ষণ আমার বাবাকে নজরে রাখবে, আমার হয়ে তোমাকে সেই কাজ করতে হবে। কী ঘটছে না ঘটছে তার বিস্তারিত বর্ণনা তুমি আমাকে জানাবে। সহসা এক আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কামিনস্কির দুচোখ, যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেল। বেশ, আমি থাকছি। ওটাই ছিল তার প্রথম দান। এক গভীর খননের প্রথম ধাপ।

ওটা ছিলো দুবছর আগের ঘটনা। গত দুবছর ধরে দিমিত্রি তাকে নানা খবর দিয়ে গেছে। যার বেশির ভাগ তার বাবার নিত্যনতুন নারীসঙ্গ বিষয়ে। দিনের পর দিন এসব খবর পেতে পেতে টাইলার বিরক্তি বোধ শুরু করেছিল। কবে আসবে সময়? দিমিত্রিকে কাজে লাগিয়ে কি তবে সে ভুল করল? অবশেষে, তার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো। সৌভাগ্য-সূচক ফোনটা এলো একদিন অবশেষে। সারদানিয়ার ঘটনার খবর পেলো সে। তার আগে দিমিত্রি অবশ্য তাকে সবই জানিয়ে ছিল। জানাচ্ছিলো। আপনার বাবার ইয়টে সমুদ্র যাত্রায় আমি সঙ্গী হয়েছি। এবং তারপর, উনি এই মাত্র ওনার নিজস্ব অ্যাটনীকে ফোন করলেন। সোমবার বস্টনে দেখা করতে বলেছেন তাকে। উইলে পরিবর্তন করবেন কিছু একটা। উইল পরিবর্তন? এত বছর ধরে অপেক্ষায় জল ঢেলে দিতে চলেছে কি বাবা? এত বছর ধরে বাবার লাঞ্ছনা অত্যাচার নীরব প্রতিবাদহীনভাবে সহ্য করার তাহলে তো কোন দামই পাবে না সে। ঐ একটি আশাতেই তো দিনের পর দিন মুখ বুজে সব সহ্য করেছে। নাহ, বাবাকে থামতে হবে। থামাতেই হবে। দিমিত্রি, তুমি শনিবার অবশ্যই আমাকে ফোন করবে। অবশ্যই। ফোন ছেড়ে দিয়ে টাইলার গভীর চিন্তায় ডুবে যায় ভবিষ্যত পরিকল্পনায়।

এটাই বোডের চালটা দেবার যথার্থ, উপযুক্ত সময় এসেছে।

.

১৬.

বিচারক টাইলারের ঘরে একটা মামলা এসেছিল যেটা একটু অন্য ধরনের। হ্যাল বেকার মামলা। বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনে বেকার কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, মহামান্য বিচারপতি মহোদয়, আমি জানি আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু আমি যা করেছি আমার পরিবারের জন্য করেছি। আমার অল্প বয়সী স্ত্রী, চারটি ছোট্ট বাচ্চা ছেলেমেয়ে। মহামান্য বিচারপতি, আমি যা করেছি ওদের জন্য করেছি। এই বস্তাপচা আবেগের প্যানপ্যানানি বিচারকের মন ভেজাবে, শাস্তি কমবে? বিরক্ত মনে ভাবছিলো নিজের বিচারকের আসনে বসে টাইলার। ঠিক তখনি বেকার বলে, আমার অন্যায় আমি স্বীকার করছি হুজুর। কিন্তু নিজের স্ত্রী-সন্তানদের জন্য আমি যে অপরাধ করেছি, আপনি যদি আমার ভুল শোধরানোর সুযোগ দেন, তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আপনি যা করতে বলবেন তাই করব মাননীয় বিচারপতি। শেষের কথাগুলো টাইলারের কান পার হয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে আঘাত করে। আপনি যা করতে বলবেন আমি তাই করব। প্রায় তাৎক্ষণিক ভাবেই ওর মনে একটা বোধ জন্ম নেয়। সেটা প্রথমবার দিমিত্রি কামিনস্কিকে দেখার পরেও তার হয়েছিল। এই মানুষটি কোন একদিন হয়ত তার ভীষণ রকম কাজেদরকারে লাগবে।

–সবাই, আদালতে যে কজন উপস্থিত ছিলেন নিশ্চিত ছিলো যে কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচ বছরের জেল হবে হ্যাল বেকারের। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিচারক

টাইলার তার রায়ে বললেন–অপরাধী শ্রী বেকারকে, যদিও এটা তার দ্বিতীয়বার ধরা পড়ার ঘটনা এবং অপরাধ যথেষ্টই গুরুতর, তবু অপরাধী বেকারের নিজেকে শুধরানোর তীব্র আকাঙ্খাকে গুরুত্ব দিয়ে, আমি ওকে পাঁচ বছরের প্রবেশন দিলাম। এই পাঁচ বছর ওকে মোট একশো ঘণ্টা নানারকম জনসেবামূলক কাজে অংশ নিতে সময় দিতে হবে। এবং এই পাঁচ বছরে সে যদি কোনরকম অপরাধমূলক কাজ করে তাহলে সে আদালতের থেকে দ্বিগুণ কঠোর সাজা পাবে। প্রবেশনের শর্তাবলী আলোচনার জন্য আসামীকে আমার ব্যক্তিগত ঘরে আসতে বলা হচ্ছে।

এবং সেই ব্যক্তিগত ঘরের আলোচনায় বিচারক টাইলার অপরাধী বেকারকে সোজা সাপটা স্পষ্টই বলে দেন যে, বেশ কয়েক বছর নিশ্চিত জেলের হাত থেকে তিনি যে ওকে বাঁচিয়ে দিলেন তার কৃতজ্ঞতাবশত প্রতিদান সে কিভাবে দিতে পারে। যদি কখনন তিনি সেরকম কোন প্রতিদানের প্রয়োজন বা আশা বেকারের থেকে করেন? কি করতে হবে আপনি শুধু সেটুকু বলবেন, এবং ধরে নেবেন সে কাজ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, সে রকম কোন প্রয়োজনে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বলব। ততদিন পর্যন্ত চিরজীবন আজ এ ঘরে যে কথাবার্তা হলো, তা তুমি গোপন রাখবে। আমি আমার সন্তানদের নামে প্রতিজ্ঞা করছি।

এই ঘটনাটার দিন কয়েক পরই দিমিত্রির ফোনটা এসেছিল। আপনার বাবা অ্যাটর্নীকে ফোন করলেন। সোমবার বস্টনে...। টাইলার বুঝেছিল। এই মুহূর্তে প্রথম প্রয়োজন বাবার উইলটাতে চোখ বোলানো। এবং হ্যাল বেকারকে তলব করার যথার্থ সময় এসেছে।...অ্যাটর্নী ফার্মের নাম রেনকুইস্ট। রেনকুইস্ট এবং ফিৎজেরাল্ডরা উইলটার

এবং নতুন যে উইলটা হবে, দুটোরই ফটোকপি চাই আমার। কোন অসুবিধা নেই বিচারপতি মহাশয়, আমি ব্যবস্থা করছি।

বারো ঘন্টা পর। দুটো উইলের কপিই তার হাতে পৌঁছে গেল। প্রথম উইলে দেখা গেল হ্যারী স্ট্যানফোর্ড সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছেন তার তিন ছেলেমেয়েকে। এবং সোমবার বাবা যে পরিবর্তিত উইল করতে চলেছেন, সেটার খসড়া তিনি আগেই ছকে রেখে গেছেন। সেটা পড়ে রাগের আগুন জ্বলে উঠল টাইলারের সারা শরীরে। বেজন্মা কয়েকশো বিলিয়ন ডলারের পরম সৌভাগ্য ওদের হাত থেকে কেড়ে নেবার উদ্যোগ করেছেন তিনি। অথচ যা ওদের, ওদেরই। শুধুই ওদের প্রাপ্য, তিক্ত কষাটে স্বাদে মুখটা ভরে ওঠে। বেজন্মা ভীমরতি ধরা বুড়োটাকে থামানোর একটাই উপায় আছে। টাইলার চরম সিদ্ধান্তটা তাৎক্ষণিক ভাবেই নিয়ে ফেলে। অপেক্ষা করতে থাকে দিমিত্রির পরের টেলিফোনের এবং শনিবার সেটা আসামাত্র সে চরম নির্দেশটা দিয়ে দেয়। আজ রাতে ওকে খুন করবে, তুমি। দীর্ঘ নীরবতার পর দিমিত্রি কথা বলে, যদি, আমি ধরা পড়ে যাই?..গলায় সামান্য অনিশ্চয়তার কাঁপুনি। ধরা পড়বে না। তোমরা তো এখন সমুদ্রে। আর সমুদ্রের জলে তো কত কিছুই ঘটে। ঘটতে পারে। তাই না? আবার এক দীর্ঘ নীরবতা এবং ঠিক আছে। কিন্তু কাজটা হয়ে যাবার পর? অস্ট্রেলিয়ার বিমান টিকিট আর প্রাপ্য। টাকা দুটোই তোমার হাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে।

তারপর, সেই সুসংবাদবাহী ফোনটি। রাতের তখন ভোরে পা রাখা। কাজটা সেরে ফেলেছি। খুব সহজে হয়ে গেল দিমিত্রির গলায় খুশির ছোঁয়া। না, না, অত সংক্ষেপে নয়। আমায় সব কিছু নিখুঁত ভাবে বিস্তারিত জানাও। কিছু বাদ দিও না। আজ এই সুন্দর খবরটা শোনবার জন্য সে কত বছর জীবনের দীর্ঘসময় অপেক্ষায় রয়েছে।

দিমিত্রির বলে চলা বর্ণনা, কথাগুলো তার চোখের সামনে যেন জীবন্ত দৃশ্যায়নে ফুটে ওঠে। ঘন রাত, । আমরা প্রবল ঝড়ের মধ্যে দিয়ে করসিকার দিকে এগোচ্ছিলাম।

ঢেউয়ের দোলায় প্রচণ্ড জল স্রোতে ইয়টটা যেন কাগজের নৌকোর মত উথাল পাতাল করছিলো। স্ট্যানফোর্ড একটা ব্যথায় মালিশ করে দেবার জন্য দিমিত্রিকে ডেকেছেন। স্ট্যানফোর্ডের কেবিনের দিকে হেঁটে যেতে যেতে নৌকোর প্রবল দুলুনিতে টাল সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। দিমিত্রি কেবিনে ঢুকে দেখল হ্যারী স্ট্যানফোর্ড মালিশের টেবিলে উপুড় হয়ে শুয়ে তারই প্রতীক্ষা করছেন। ব্যথায় কাতর মুখে তিনি বলেন, এটা কোমরের নিচের দিকে। চিন্তা করবেন না আমি দেখছি। দিমিত্রির সক্ষম নিপুণ আঙুল দ্রুত কাজে নেমে যায়। আরামে চোখ বুজে আসে স্ট্যানফোর্ডের। প্রায় ঘন্টা খানেক মালিশ নেবার পর, স্ট্যানফোর্ড প্রায় অলসতা জড়ানো ঘুমের ঘোরে, দিমিত্রি বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। টাব ভরে দেয় ঠান্ডা গরম জলের নিখুঁত মিশ্রণে। তারপর ঘরে ফিরে এসে বলে, আপনার স্নানের জল তৈরি। স্ট্যানফোর্ড উঠে দাঁড়ান। দিমিত্রির কাঁধে ভর রেখে তিনি বাথরুমে এসে দাঁড়ান। দিমিত্রি ওঁর জলের ভেতর ক্রমশ ডুবে যেতে থাকা শরীরটাকে লক্ষ্য করতে থাকে। স্ট্যানফোর্ড তাকালেন, ঠিক এই সময়েই, দিমিত্রির শীতল চোখের সঙ্গে তার চোখ মেলে। তাৎক্ষণিকতায়, সহজাত প্রবৃত্তির বোধ ওঁকে বলে দেয় কী ঘটতে চলেছে। দিমিত্রির চোখে খুনীর শীতল ছায়া নড়তে দেখেন তিনি। না, না, কাতর মিনতি করে, দ্রুত বাথটব থেকে উঠে পড়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু দৈত্যকায় প্রবল শক্তিশালী দিমিত্রির সঙ্গে তার শক্তির কোন প্রতিরোধই দেওয়া সম্ভব ছিল না।

বাথটবের জলে বলিষ্ঠ শক্ত হাতে সে হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের মাথাটাকে চেপে ধরে। যতক্ষণ পর্যন্ত না, ফুসফুস ভরে ওঠে হাওয়ার বদলে সমুদ্রের লবণাক্ত জলে। প্রবল ভাবে, হাত

পা ছুঁড়ে বাধা দেবার আপ্রাণ প্রতিরোধে মৃত্যুর কবল থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টাটা এক সময় নিথর হয়ে পড়ে। সব সঞ্চালন চেষ্টা, প্রাণের স্পন্দন মুছে যাবার পর দিমিত্রি, হাত গুটিয়ে নেয়। ভেতরের ঘরে ফিরে আসে। দেরাজ খুলে কিছু কাগজপত্র বের করে এবং সেগুলো হাহাকার তোলা সশব্দ ঝড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। তারপর স্ট্যানফোর্ডের মৃতদেহটাকে বাথরোবে জড়িয়ে নেয়। তারপর তাঁকে কাঁধে তুলে ইয়টের বারান্দাতে নিয়ে আসে। চোখের পলকে রেলিং টপকে শরীরটাকে জলের গভীর অতলতায় ছুঁড়ে দেয়। ডুবন্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে সে একটা নিঃশ্বাস টানে।

দিমিত্রির মুখে খুনের বর্ণনা শুনতে শুনতে, টাইলার যেন তীব্র যৌন আনন্দের মত সুখ উপভোগ করে। বাবার ফুসফুস ভরে উঠছে সমুদ্র জলে। নিশ্বাসের জন্যে আপ্রাণ ছটফটানি, আতঙ্ক জমে ওঠা, তারপর এক চিরনৈশব্দ। সব কিছু নিখুঁত অনুভবে ধরা দেয় টাইলারের মনোযাক সব কিছু চুকে গেছে, মিটে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। তারপরই নিজেকে সংশোধন করে নেয় সে। না, না খেলা তো সবে শুরু হলো, শুরু।

এবার, সময় এসেছে, রানীর চাল এগিয়ে দেবার, কিস্তিমাতের দিকে।

.

১৭.

বেনডাল এবং উডরোও ওরই সমান মাপে সম্পত্তির ভাগীদার হবে। ব্যাপারটা মন থেকে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না টাইলার। একটা তীব্র বিরাগ তৈরি হচ্ছিল ওর মনে। টাইলারই এত কাণ্ড করল আর দুধের সরটুকু খাবে ওরাও সমান পরিমাণে? তা

কেন হবে? টাইলার যদি দাবার চাল খেলে না চলত, ওরা তো স্ট্যানফোর্ড সম্পত্তির কানাকড়িও পেতো না। সুতরাং...না, যা ঘটছে মোটেই যথার্থ, উচিত কাজ হচ্ছে না। ওর মনে পড়ে, মায়ের একটা শেয়ার ওর দখলে আছে। এও মনে পড়ে মা সেই শেয়ারটা ওকে দিয়ে দিয়েছে জেনে বাবার ব্যঙ্গভরা বক্রোক্তি। ঐ শেয়ারটা দিয়ে হতচ্ছাড়াটা কি করবেটা কি? কোম্পানির দখল নেবে? এক সাথে, উডি আর বেনডালের দখলে থাকছে বাবার স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের দুই তৃতীয়াংশ শেয়ার। নিজের একভাগ শেয়ার নিয়ে কোম্পানি সমূহের কর্তৃত্বের দখল সে কিভাবে নিতে পারে-পারবে? মাত্র একটি অতিরিক্ত শেয়ার তার দখলে থাকছে যেক্ষেত্রে। এবং তখনি প্রায় আচমকা ওর মনে উত্তরটা ভেসে উঠল। চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্র নিজের উদ্ভাবনী শক্তিতে সে নিজেই মোহিত হতবাক হয়ে পড়ল।

এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি আপনারা তিন ভাই বোন ছাড়াও আপনার বাবার সম্পত্তির আরো একজন উত্তরাধিকারী রয়েছে...একজন গভর্নেস যিনি এবাড়ীতে বাস করতেন...তার সন্তান...ভবিষ্যতে তিনি যদি কখনো এসে হাজির হন...সমান সম্পত্তির অধিকারী হিসেবে আইন তাকে মেনে নেবে...

যদি জুলিয়া দেখা দেয় তাহলে আমরা চারজন, প্রত্যেকের ভাগে তেত্রিশ শতাংশের বদলে পঁচিশ শতাংশ শেয়ার থাকবে। এবং যদি জুলিয়ার শেয়ারের দখল তার হাতে চলে আসে? একান্ন শতাংশ শেয়ার। যা অনায়াসেই স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের দখল তার হাতে। তুলে দেবে। বাবার চেয়ারে বসতে আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। তাৎক্ষণিকভাবেই তার মাথায় চিন্তাটার বা পরিকল্পনাটার পরের স্তর ভেসে উঠল।

রোজমেরি নিশ্চয়ই তার মেয়েকে জানায়নি বাবার পরিচয়? এবং এখন রোজমেরি মৃত, সুতরাং কে আসল, সত্যি জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড কে...তাহলে কে?

উত্তরটা তৈরিই ছিল টাইলারের কাছে, মার্গো পসনার।

.

প্রথমবার, টাইলার তাকে দেখেছিল নিজের আদালত কক্ষে। দুটোর পর সেদিনই আবার আদালত শুরু হয়েছিল। প্রথম মামলাটিই ছিলো ইলোয়িনিস রাজ্য প্রশাসন বনাম মার্গো পসনার। অভিযোগ–খুনের চেষ্টা, নিগ্রহ, গন্ডগোল বাঁধানো। সরকারী উকিলের বক্তব্য থেকে জানা গেল, মাননীয় বিচারপতি মহোদয়, অভিযুক্ত একজন দাগী অপরাধী। এবং সমাজে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ানোর পক্ষে অযোগ্যই শুধু নয়, বিপজ্জনক। শিকাগোতে নানা ধরনের গণ্ডগোল বাঁধানন, দোকানে চুরি করা, ছিনতাই, এসবের জন্য বেশ কয়েকবার ধরাও পড়েছিল। ও ঠান্ডা মাথায় তার দুই পুরুষ সঙ্গী খদ্দেরকে গুলি করে। দুজনেই কি মারা গেছে ঐ ঘটনায়? বিচারক টাইলার প্রশ্ন করে। না বিচারপতি মহোদয়, গুরুতর আহত অবস্থায় তারা হাসপাতালে ভর্তি। যে বন্দুকটি দিয়ে গুলি করা হয়েছিল মেরি পসনারের কাছ থেকেই সেটি পাওয়া যায়। এবং সেটি ছিল বেআইনি অস্ত্র। টাইলার অভিযুক্তার দিকে তাকাল এবং এক বিস্ময় ঝলক তাকে ছুঁয়ে গেল। এতক্ষণ যা সে শুনল অভিযুক্তার চেহারার, প্রতিচ্ছবির সঙ্গে তা মোটেই মিল খায় না। সুন্দর পোষাক পরা, সুসজ্জিত, রুচিশীল, ভদ্রসভ্য চেহারার একজন আকর্ষণীয়া সুন্দরী যুবতী আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর চেহারার শালীন রুচিময় নমনীয়তা যেন ওর বিরুদ্ধে করা সমস্ত অভিযোগকেই টাইলারের মন মিথ্যে বলে ঘোষণা করতে চাইছে। টাইলারের মন,

বিচারক নিরপেক্ষ সত্ত্বা বিদ্রোহ করতে চাইল। সমস্ত তথ্য প্রমাণ সাক্ষ্য অস্বীকার করতে চাইল।

বাকী প্রতিবাদী পক্ষের উকিলের সওয়াল জবাব সে শুনছিল। কিন্তু তার চোখ স্থির নিবদ্ধ ছিলো মেয়েটির প্রতি। দুপক্ষের আইনবিদদের সওয়াল জবাব শেষ হলো। বিচারকের পক্ষে মামলা হিসেবে অত্যন্ত সহজ মামলা ছিলো। আমি উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিচারের পর অপরাধী মার্গো পসনারকে পাঁচ বছর ডিওয়াইট সংশোধনাগারে কাটাবার আদেশ দিচ্ছি। টাইলার নিজের রায়ে জানিয়েছিল। মেয়েটিকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পরও বারবার তার চেহারাটা টাইলারের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। বেনডালের সঙ্গে মেয়েটির প্রচণ্ড মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন। এই মেয়েটিও তার বোনেরই মত ধূসররঙা চোখ। স্ট্যানফোর্ড চোখ।

মার্গো পসনারের কথা সে তারপর ভুলেই গিয়েছিল। আবার তার মনে পড়ল দিমিত্রির ফোনের পর। দাবার প্রাথমিক চালগুলো পরিকল্পনা মাফিক নিখুঁত ভাবে চমৎকার দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী চাল, দানগুলোও নিখুঁতভাবে ছকে পরিকল্পনা করে রেখেছিল সে। এবার রানীর চাল দেবার আগে মিডল, গেমে দান দেবার সময় হয়েছে। টাইলারের মনে ভেসে উঠেছিল মার্গো (আসলে ওর মনের অবচেতনে সব সময়েই মার্গো পসনার, বিশেষ করে তার ধূসর রঙা স্ট্যানফোর্ড চোখ, হাজির ছিল ঝাঁপ বন্ধ অবস্থায়)। টাইলার সোজা মহিলা সংশোধনাগারে গিয়ে হাজির হলো। মার্গো পসনারের মুখোমুখি। আমায় চিনতে পারছ? কি করে ভুলব? আমার এখানে আসার জন্য তো আপনিই। ভুল কথা। নিজের কর্মফলের কারণে তুমি আজ এখানে। থাক, সেসব নিয়ে তর্ক করতে আমি এখানে আসিনি। তুমি এখানে কেমন আছো? আপনি কি ঠাট্টা করছেন? এটা একটা নরকের

মত? আমি যদি এখান থেকে তোমায় বের হবার ব্যবস্থা করি? মার্গো সন্দিহান চোখে তাকায়, কী করে? আপনি ঠাট্টা করছেন নাকি? টাইলার তার বিচারক সুলভ দাপুটে গলার ভঙ্গীতে বলে, না, আমি ঠাট্টা করছি না। তোমাকে আমি সত্যিই বের করে নিয়ে যেতে পারি। যদি তুমিও আমার জন্য কিছু করতে রাজী থাকো। মার্গো হেসে ওঠে। তার চোখে ঝিলিক মারে চাপা যৌনতার ছায়া। যৌন উত্তেজক ভঙ্গী শরীরে ফুটিয়ে সে বলে,– ওহ এই ব্যাপার? ঠিক আছে বিচারক মহোদয়, আপনি যদি সত্যিই আমায় এখান থেকে বের করে নিয়ে যান তাহলে আমি আপনার জন্য সব কিছু করতে অবশ্যই রাজি আছি। কথা শেষ করেও নিঃশব্দে হেসে চলে মার্গো।

টাইলার বিরক্ত ভঙ্গীতে বলে। তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমি তোমার থেকে অন্য কিছু চাই। খুবই সিরিয়াস ব্যাপারটা। নিমেষে ভঙ্গী বদলে ফেলে আগ্রহের কৌতূহলের গলায় ভাব-গম্ভীর ভঙ্গীতে বলে, তাহলে? আমাকে দিয়ে আপনি কী করাতে চান? তোমাকে একজনকে নকল করতে হবে। আমি একজনের সঙ্গে একটা খেলা খেলতে চাই। তোমায় তাতে সাহায্য করতে হবে। মার্গো অবাক গলায় বলে, নকল করতে হবে? কাকে? সেসব তোমায় যথা সময়ে জানিয়ে বুঝিয়ে দেবো। এখন শুধু এইটুকুই জেনে রাখো, কাজটা যদি ঠিকঠাক ভাবে করতে পার, উতরে দিতে পার, পঁচিশ হাজার ডলার পাবে। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ হয়ে ওঠে মার্গোর। গলা দিয়ে কথাগুলো আর্তচিৎকারের মত বের হয়ে আসে ছিটকে ছিটকে।

এরপর টাইলার জেলা আদালতের প্রধান বিচারপতি কিথ পারসির সঙ্গে দেখা করে। তাকে বোঝায়, নিজের যুক্তির জালে বিশ্বাস করাতে বাধ্য করায়। আমি জানতে পেরেছি, মেয়েটি একজন দক্ষ শিল্পী। আর সে সভাবে সাধারণ জীবন যাপনে আগ্রহী হয়ে

উঠেছে। আমাদের কি উচিত নয় এ ধরনের অনুতাপ জর্জরিত অপরাধীদের নতুন ভাবে বাঁচাবার, নতুন করে সঞ্জীবন শুরু করার সুযোগ করে দেওয়া? টাইলারের তার্কিক যুক্তির জালে অভিভূত প্রধান বিচারপতি বললেন,–নিশ্চয়ই। তোমার এই অসাধারণ সৃজনমুখী সমাজ উন্নয়নশীল চিন্তা ভাবনার সঙ্গে আমি অবশ্যই একমত। সুতরাং মার্গোর জামিনে ছাড়া পেতে দেরী হলো না। টাইলার খুব গোপনে তাকে এনে তুলল নিজের বাড়ীতে। সবার চোখের আড়ালে রেখে, কাক পক্ষীকেও জানতে না দিয়ে শুরু হলো তার প্রশিক্ষণ। স্ট্যানফোর্ড পরিবারের মানচিত্রকে তার যাবতীয় খুটিনাটিসহ চেনানো, পাখি পড়ানো। প্রায়। নির্মম ভাবেই কোনরকম মায়াদয়াহীন ভাবে চলল এই প্রশিক্ষণ পর্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত না টাইলারের মনে নিশ্চিত ধারণা জন্মালো মার্গো পসনার নয়, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের অবৈধ সন্তান জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড। হ্যাঁ তুমি এবার তৈরি, তার আগে অবশ্য মার্গোকে দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সই সাবুদ করিয়ে রাখল। যাতে, আইনগত ভাবে জুলিয়া তার অংশের শেয়ার হস্তান্তর করছে টাইলারকে। একশো বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি নিয়ে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া যায় না। যদি শেয়ার দখল নেবার পর মার্গো তা টাইলারের হাতে তুলে দিতে রাজী না হয়? ঐ বিশাল পরিমাণ সম্পত্তি কোন মূর্খ ছেড়ে দিতে চায়? তাই আগে ভাগই জুলিয়ারূপী মার্গো সম্পত্তির দখল পাবার আগেই আইনত তা টাইলারের দখলে চলে এলো। এরপর তৈরি হলো জাল কাগজ পত্র, জুলিয়ার আত্মপরিচয়ের জাল প্রমাণ তথ্য। সেসবও নিখুঁত ভাবে তৈরি হয়ে যাবার পর টাইলার। মার্গোকে বলল, এবার রওনা হবার জন্য তুমি পুরোপুরি তৈরি। পাঁচ হাজার ডলার ওর হাতে দিয়ে সে বলল,–এটা আগাম, বাকিটা পাবে কাজ সফল ভাবে শেষ করতে পারলে, যদি তুমি ওদের বিশ্বাস করাতে পারো তুমিই জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড।

যে মুহূর্তে মার্গো জুলিয়া হয়ে মঞ্চে প্রবেশ করল, রোজ হিলের বাড়ীতে হাজির হলো, টাইলার তার নিখুঁতভাবে ডেভিলস অ্যাডভোকেট-এর ভূমিকা পালন করতে শুরু করল। নিখুঁত এক দাবার মস্তিষ্ক যুদ্ধ। একদিকে ভাইবোনদের পক্ষে, জুলিয়া বিরোধী হিংস্রভাবে, অন্য দিকে মার্গোর প্রতিটি পদক্ষেপই নিয়ন্ত্রিত তারই অঙ্গুলি হেলনে, ইশারায়। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থা বুঝতে পারছেন মিস...ইয়ে...কোন যথার্থ বাস্তব প্রমাণ ছাড়া আমরা... আমার মনে হয় মেয়েটি জালিয়াত...আমরা যখন শিশু, এ বাড়ীতে কতজন চাকর বাকর কাজ করত?...ওদেরই কেউ যে এসব ঘটনা মেয়েটিকে বলেনি...ঐ ছবিটাও, তাদেরই কেউ হয়ত চুরি করেছিল, যা এখন সে মেয়েটিকে দিয়েছে...ভুললে চলবে না যে অকল্পনীয় পরিমাণ টাকা জড়িয়ে আছে এই ঘটনার সঙ্গে...

ওর রাজার চাল ছিল ডি এন এ টেস্ট-এর দাবী। যদিও তার আগেই হ্যাল বেকারকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের দেহটা খুঁড়ে তুলে যেন নষ্ট করে ফেলে। যাতে ডি এন এ পরীক্ষা সম্ভবই হবে না। তারপর, আরো একটা বোড়ের চাল। অন্য ভাইবোনদের সামনে ঢাক ঢোল পিটিয়ে জেলা অ্যাটর্নীর দফতরে ফোন করা, বেসরকারী গোয়েন্দা ফ্রাঙ্ক টিমমনস-এর ফোন নম্বর নেওয়া, তাকে ফোন করা এবং জুলিয়ার পূর্ব জীবনের খোঁজ বের করতে লাগানো। ফ্রাঙ্ক টিমমনস নামে যাকে সে ভাইবোনদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সে আর কেউ নয়। হাল বেকার, তদন্তের নামে, টাইলারের আগেই তৈরি করে রাখা যাবতীয় জাল নথিপত্রগুলোকেই (আঙ্গুলের ছাপও) সত্যি প্রমাণ হিসেবে দাখিল করে বেকার। অনন্যরা যাকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। মার্গোও তার কাজ নিখুঁত ভাবে করে। পুরো পরিকল্পনা (অথবা ষড়যন্ত্র) বিস্ময়হীন, নিখুঁত ভাবে উতরে যায়।

মার্গোকে সবাই জুলিয়া হিসেবে মেনে নেবার পর, মার্গোর আঙ্গুলের ছাপই জুলিয়ারূপী মার্গোর আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে মিলে যাবার পর, সবাই দ্বিধাহীন মনে ওকে তাদের সৎ বোন মেনে নেবার পর, ছোট্ট ঘরোয়া মিলনোৎসবের পর সবাই যখন শুয়ে পড়েছে, একশো মিলিয়ন ডলার এবং নিজেদের উজ্জ্বল সুখস্বপ্ন দেখছে টাইলার। সবার চোখ এড়িয়ে গোপনে দোতলায় উঠে যায়। জুলিয়ার ঘরের দরজায় ঠেলা দেয়। ভেজান দরজা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকে আসে। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল মার্গো অথবা জুলিয়া। টাইলার দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে যায়। দুজনে দুজনকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে, নিঃশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ে। আমরা পেরেছি মার্গো, আমরা পেরেছি।

.

১৮.

রেনকুইস্ট, রেনকুইস্ট এবং ফিৎজেরাল্ড এর অ্যাটর্নী অফিস। দুজন মুখোমুখি কফি পান করছিলেন। সাইমন ফিৎজেরাল্ড প্রশ্ন করেন, কী ভাবছ? সোলানে মাথা নাড়ে,– স্ট্যানফোর্ড পরিবার। আমি নিশ্চন্ত নই, তবে কোথাও যেন একটা গন্ডগোল আছে। একটা বাধা। ফিৎজেরাল্ড প্রশ্ন করেন, যেমন? একটি প্রশ্ন বারবার মনে ফিরে ফিরে আসছে। ফিজেরাল্ড-এর চোখে কৌতূহল তীব্রতর হলো, কী প্রশ্ন? স্টিভ সোলানে নিজের কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নেয়। তারপর বলে, স্ট্যানফোর্ডরা নতুন মেয়েটির ডি এন এ পরীক্ষা করার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের মৃতদেহকে উধাও করে দেবার একটাই মাত্র কারণ থাকতে পারে। মহিলাটির ডি এন এ পরীক্ষা হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের কোষের সঙ্গে তা মেলানো হতে না দেওয়া এবং তাতে লাভ

সবচেয়ে কার বেশি? ঐ জুলিয়া স্ট্যানফোর্ডের। যদি সে একজন প্রতারক জালিয়াত হয়। একমাত্র মেয়েটিরই মোটিভ থাকতে পারে। উদ্দেশ্য লাভ থাকতে পারে হ্যারীর মৃতদেহ গায়েব করে দেওয়ায়। গম্ভীর চিন্তাশীল মুখে ফিৎজেরাল্ড মাথা নাড়েন, ঠিক বলেছ। এখন দেখো বেসরকারী গোয়েন্দাটি ফ্রাঙ্ক টিমমনস। আমি জেলা অ্যাটনীর অফিসে খোঁজ নিয়ে জেনেছি লোকটির যথেষ্ট সুনাম রয়েছে গোয়েন্দা হিসেবে। সে যাচাই করে যখন বলেছে আঙুলের ছাপ মিলে গেছে তাহলে তার কথার ওপর ভরসা রাখাই যায়। আমার প্রশ্ন হলো তাই যদি হয় অর্থাৎ ঐ জুলিয়া মেয়েটি যদি জালিয়াত, না হয়, সত্যি জুলিয়াই হয়, তাহলে মৃতদেহটাকে কে এবং কেন গায়েব করল? কার লাভ এতে? তীব্র গলায় প্রশ্ন করে সোলানে।

ফিৎজেরাল্ড চিন্তামগ্ন কুঞ্চিত কপালসহ উত্তর দেন, লাখ ডলারের প্রশ্ন। যদি... ঠিক তখনি ফোনটা বেজে ওঠে। সোলানেই ফোনটা তোলে। হালো জজ টাইলার বলছি। আপনি কি একবার রোজ হিলের বাড়িতে আসতে পারবেন? সোলানে আড় চোখে ফিৎজেরাল্ডের দিকে তাকায়। কখন? ফিৎজেরাল্ড প্রশ্নাতুর চোখে ওদের কথোপকথন বোঝার চেষ্টা করছে। টাইলার অন্য প্রান্তে বলে, ধরুন ঘণ্টা খানেক পরে?–ঠিক আছে, আমি পৌঁছে যাব। ধন্যবাদ সোলানে। রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিৎজেরাল্ডের দিকে তাকিয়ে সোলানে বলে, ডাক এসেছে। স্ট্যানফোর্ডদের বাড়ীতে হাজির হতে হবে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ফিৎজেরাল্ড বলে, এখন আবার কী চায় ওরা? সোলানে হাসে, বাজী ধরতে রাজি আছি। উইলের প্রবেটটা যাতে তাড়াতাড়ি সারা হয় সে ব্যাপারে তাড়া দেবার জন্যে। দ্রুত প্রবেট পেয়ে ওরা যাতে নিজেদের ভাগ বুঝে নিতে পারে।

লি, আমি টাইলার বলছি, কেমন আছো তুমি? ধন্যবাদ। আমি ভালই আছি। সোনা আমি তোমায় খুব মিস করছি। এক নীরব দীর্ঘ বিরতি। তারপর, আমিও তোমায় মিস করছি টাইলার। কথাগুলো ওর শরীরে রোমাঞ্চের কাটা তোলে। উৎসাহের আতিশয্যে ভরা গলায় সে বলে, শোনো লি, একটা দারুণ ভাল খবর আছে। কিন্তু ফোনে সেকথা বলা যাবে না। তুমি কথাটা শুনলে ভীষণ...। টাইলার আমি একটু ব্যস্ত। একজন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ফোনটা সশব্দে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলো।

রোজ হিলের বাড়ীর বসবার ঘরে সবাই হাজির ছিলো। সোলানে ওদের মুখগুলো খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল। জজ টাইলারকে বেশ খোশমেজাজ, দুশ্চিন্তাহীন দেখাচ্ছিল। বেনডালকে কিছুটা উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তুলনায়। কেমন অস্বাভাবিক রকম যেন সেই নার্ভাসনেস। ওর স্বামী মার্ক সে তুলনায় বেশ শান্ত, সংযত এবং জুলিয়া? সে এই পরিবারে অবশেষে। আচমকা সদ্য এক বিলিয়ন ডলারের উত্তরাধিকারী হয়েছে। সে আর একটু উত্তেজিত অস্থির হলেই কি ব্যাপারটা মানানসই বেশি হতো না? সোলানে প্রশ্ন করে নিজের বোধকেই। এই ঘরে অনুপস্থিতের তালিকায় উডরোও এবং তার স্ত্রী পেগি। স্টিভ সবার মুখগুলো আবার ভাল করে নিরীক্ষণ করে। এদেরই মধ্যে কেউ, কোন একজন হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের মৃতদেহ গায়েব করেছে। কে সে, এবং কেন? ফিৎজেরাল্ড-এর মতে বিলিয়ন ডলার প্রশ্ন। হয়ত সত্যিই তাই। টাইলার কথা বলে, সোলানে, একজন বিচারক হিসেবে প্রবেট আইনের ব্যাপারে আমি কিছুটা ওয়াকিবহাল। কার্যধারা পদ্ধতিটাকে কি আর একটু দ্রুতগামী করা যায় না? সোলানে মনে মনে ভাবে ফিজেরাল্ডকে বাজিটা গ্রহণ করতে রাজি করানো উচিত ছিল তার। ভাবনাটা মনে চেপে রেখে সে জবাব দেয়, আমরা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি, অনেকটা এগিয়েও গেছি। টাইলার বলে।

দেখুন আমরা চাই ব্যাপারটা যতো তাড়াতাড়ি হয় মিটে যাক। কোন চিন্তা করবেন না, আমরা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়িই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছি।

ঠিক এই সময়েই ঘরের বাইরে থেকে, সিঁড়ির দিক থেকে শোনা গেল একটা তীব্র আস্ফালন যুক্ত চিৎকার, চুপ, একদম চুপ। নোংরা কুত্তী, আর একটা কথা বললে আমি মেরে তোর হাড় গুড়ো গুড়ো করে দেব। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে উডি আর পেগি। উডি হাসবার চেষ্টা করে। আশা করি কথাবার্তা সব শেষ হয়ে যায়নি? ঘরের সবাই পেগিকে দেখে চমকে ওঠে। মুখটা ফুলে উঠেছে। চোখের পাশে রক্ত জমা কালসিটে। বেনডাল শিউরে ওঠা গলায় প্রশ্ন করে, তোমার কী হয়েছে? কিছু না, পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। সামান্য চোট লেগেছে। উডি বসে, পেগি গিয়ে তার পাশেই বসে। উডি স্ত্রীয়ের হাতে সামান্য চাপ দেয়। এখন তুমি ঠিক আছে তো সোনা? পেগি মাথা নেড়ে সায় দেয়। হয়ত কথা বলার মত আত্মবিশ্বাস পায় না। উডি বলে, তাঁ, তাহলে কী নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল? টাইলার বলে,–আমি ওনাকে বলছিলাম, প্রবেটের ব্যাপারটাকে যতটা দ্রুত মিটিয়ে ফেলা যায়। সোলানে উঠে দাঁড়ায়, ঠিক আছে ভদ্রমহোদয়েরা, তাহলে ঐ কথাই রইল। আমাদের ফার্ম আপনাদের সম্পত্তির দখল দানের ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে ফেলে আপনাদের জানাবে। কথা শেষ করেই দ্রুত পায়ে ঘরের থেকে বেরিয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কী এই অর্থ লোলুপতা স্বার্থসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক পরিবেশের গুমোট হাওয়ায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বাইরের মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছিল।

পেগি বাথরুমের কল খুলে তার মুখের ফোলা জায়গাটায় ঠান্ডা জল ছিটোচ্ছিল। বেনডাল লঘু পায়ে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে চমকে ঘুরে তাকায়। পেগি, তুমি ঠিক আছো?

চমক ধরা ভঙ্গীতে পেগি উত্তর দেয়, হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ। বেনডাল ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর বরফ কাটা গলায় বলে, এই মারধোর কতদিন ধরে চলেছে? পেগি বিব্রত গলায় বলে, আমায় মারেনি। আমি পা পিছলে পড়ে... বেনডাল বাধা দিয়ে বলে ওঠে,–কেন? কেন পেগি, এসব কেন মুখ বুজে সহ্য করে চলেছ? প্রতিবাদ করো না, রাগে ফেটে পড়ো না কেন? ঝুলে পড়া মাথাটা তুলে পেগি তাকায়। শান্ত চোখ দুটো নীরব কান্নায় ভিজে উঠেছে। কারণ, কারণ আমি ওকে ভালবাসি, ভীষণরকম ভালবাসি। চোখে মুখে জলের কয়েকটা ঝাঁপটা দিয়ে সে আবার বেনডালের দিকে ফিরে তাকায়। বিশ্বাস করো, ও নিজেও আমাকে ভীষণ ভালবাসে। সব সময় এরকম ব্যবহার ও করে না। শুধু মাঝে মাঝে... পেগির গলায় ইতস্ততা, কী বলবে যথার্থ শব্দ যেন খুঁজে পায় না। বেনডাল ধীর শান্ত গলায় বলে, বিশেষ সময়...যখন মাদক নেয়। তাই না?

পেগি কথাটা শুনে আঁতকে ওঠে, তুমি...তুমি...জানলে কী করে। থতমত খেয়ে তোতলাতে থাকে সে। সেটা কি খুব জরুরী প্রশ্ন? এসব কতদিন ধরে চলছে? বেনডাল ঠান্ডা ধীর ভাবটা বজায় রেখে প্রশ্ন করে, পেগি প্রথমটায় ইতস্তত করে বলে, আমাদের বিয়ের পর থেকেই। তারপর একটু থেমে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করে, ওর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল। সে সময় হাসপাতালে ওরা ব্যথা কমানোর জন্য মাদক জাতীয় ওষুধ দিতো...সুতরাং...দোষটা ওর নয়। বেনডাল বিস্ময় সূচক শব্দ করে, পেগি, পেগি, এটা সাফাই গাইবার সময় নয়। তুমি কি বুঝতে পারছ না, উডির সাহায্য প্রয়োজন। ভীষণ প্রয়োজন। কী নেয় ও, কোকেন? না, হেরোইন। হে ভগবান, বেনডালের মুখ দিয়ে আর্তনাদের মত বের হয়ে আসে শব্দটা। যতরকম ভাবে

পারা যায় চেষ্টা করেছি আমি। রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে দীর্ঘদিন রেখেছি পর্যন্ত। কোনরকম চেষ্টাই বাদ দিইনি। জলভরা চোখে বেনডালের দিকে তাকিয়ে বলে পেগি।

বেনডাল ওর হাতটা চেপে ধরে আলতো চাপ দেয়, ঠিক আছে পেগি। শান্ত হও, শান্ত হও। আমরা বরং পরে আবার এ বিষয়ে আলোচনা করব। কথা বলব। পেগি মাথা নাড়ে। নিজের ঘরের দিকে ফিরে আসতে আসতে বেড়ালের মনে পড়ে–তুই হবি পৃথিবীর অন্যতম সেরা ফ্যাশান ডিজাইনার। আর আমি হবো বিখ্যাত খেলোয়াড়, অ্যাথলিট। কিশোর বয়সের এই স্বপ্ন দেখা উডির একি শোচনীয় পরিণতি? যদিও এ মুহূর্তে উডি না পেগি, কার জন্যে বেশি দুঃখিতবোধ করা উচিত, বুঝে উঠতে পারছিল না। সিঁড়ির মুখেই তার । দেখা হলো ক্লার্কের সঙ্গে। হাতের ট্রে-এর উপর একটা খাম। ট্রে সহ খামটাকে এগিয়ে দিয়ে বলে, আপনার চিঠি। এই মাত্র বাইরে একজন এসে দিয়ে গেলো। বেনডাল খামটা তুলে নেয়, ধন্যবাদ ক্লার্ক। খামটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ওর মুখে একই সঙ্গে পর পর বিস্ময় চিন্তা-সন্দেহের রেখা ফুটে ওঠে। চিঠিটা খুলে পড়তে পড়তে ওর মুখ আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। না, চাপা আর্তচিৎকার ছিটকে বের হয় ওর মুখ দিয়ে। হন্তদন্ত হয়ে নিজেদের ঘরে এসে হাজির হয় সে। মার্কও ততক্ষণে ফিরে এসেছে। আতঙ্কিত মুখে চিঠিটা মার্কের দিকে এগিয়ে দেয় সে। খামটা খুলে মার্ক চিঠিটা পড়তে শুরু করে।

প্রিয় শ্রীমতি রেগনর,

অভিনন্দন, আমাদের বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ সমিতির ভবন থেকে আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার ভাগ্যের উজ্জ্বল পরিবর্তনের সুসংবাদ পেয়ে আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

আশা করি আগেও যেমন আমাদের সমিতি আপনার উষ্ণতম সাহায্য পেয়েছে ভবিষ্যতেও পাবে।

সেইমত আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, আমাদের সমিতির সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বরে এক লক্ষ ডলার সাহায্য বাবদ অর্থ জমা দিতে, দশদিনের মধ্যে।

প্রতিটি, অন্য এই চিঠিগুলোর মতই, এ চিঠিতেও টাইপ করা অক্ষরগুলোর মধ্যে E অক্ষরটা ভাঙা। চিঠিটা পড়ে মার্ক দাঁতে দাঁত পিষে বলে, বেজন্মার বাচ্চাগুলো। বেনডাল আতঙ্কিত মুখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফাঁসফেঁসে কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে ওরা জানল কী করে, আমি যে এখানে? মার্ক তেতো গলায় বলে, কী করে? যে কোন একটা খবরের কাগজ তুলে নাও, তাহলেই উত্তরটা পেয়ে যাবে। চিঠিটা আবার পড়ে সে, ক্ষোভে মাথা নাড়ে। নাহ, এবার দেখছি পুলিশকে জানাতেই হবে। না, চাপা আর্তচিৎকার করে ওঠে বেনডাল। বড় দেরী হয়ে গেছে। এখন আর সে উপায় নেই। তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে, আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। মার্ক স্ত্রীয়ের হাতটাকে নিজের মুঠোয় নেয়। শক্ত করে চেপে ধরে, ঠিক আছে সোনা, আমরা এ সমস্যা সমাধানের অন্য কোন একটা উপায় খুঁজে বের করব। কিন্তু বেনডাল জানে, কোন পথই নেই বের হবার।

এটার শুরু বেশ কয়েক মাস আগে। এক উজ্জ্বল বসন্ত দিনে বেনডাল রিডেজ ফিলড কানেকটিকাটে এক জন্মদিনের উৎসবে গিয়েছিল। সেটা একটা দারুণ উৎসব। পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা, গল্পগুজব হয়েছিল। সময় যে কোনখান দিয়ে বয়ে গিয়েছিল ওর খেয়ালই ছিল না। একসময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠে। হে ভগবান অনেক দেরী হয়ে গেছে যে, মার্ক আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। সবার থেকে দ্রুত বিদায়

নিয়ে বেনডাল গাড়ীতে উঠে বসেছিল নিউইয়র্কে ফিরে আসার জন্য। সে তাড়াতাড়ি করার জন্য হাইওয়ে ছেড়ে আই ৬৪৮-এর সরু গ্রাম্য পথ ধরেছিল। এতে সময় অনেক বাঁচবে। প্রায় ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে গাড়ী ছুটছিল। একটা বাঁকের মুখে আচমকা তার গাড়ীর সামনে এসে পড়ে এক গ্রাম্য মহিলা। বেনডাল প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল গাড়ীটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে, দুর্ঘটনা এড়াতে। কিন্তু পারেনি, চোখের পলক পড়ারও কম সময়ের মধ্যে যেন ঘটে গেল ব্যাপারটা। ভদ্রমহিলা,ছিটকে পড়লেন। বেনডালের সারা শরীর বিশ্রীভাবে কাঁপছিল নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। বেশ কিছুটা এগিয়ে যাবার পর গাড়ীটাকে থামাতে পারে। বেশ কিছুক্ষণ গাড়ীতে বসেই থরথর করে কাঁপে। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফিরে আসে ঘটনাস্থলে। সেখানে রক্তে মাখামাখি হয়ে ভদ্রমহিলা পড়েছিলেন, ওর স্থির পলকহীন চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল শরীরে প্রাণ নেই।হে ভগবান, ওর গলা দিয়ে চাপা আর্তনাদটা বের হয়ে আসে। ওর গলায় যেন একটা পাথর আটকে রয়েছে। কী করবে? এ মুহূর্তে কী করা উচিত বুঝে উঠতে না পেরে অসহায়ের মত সে চার পাশে তাকাতে থাকে। না, কেউ তাকে দেখেনি এখনো, পালাতে হবে। না এটা ওর দোষ নয়। কিন্তু ওরা যদি তাকে ধরে অভিযুক্ত করবেই। তার নিঃশ্বাসে অ্যালকোহলের গন্ধ পাবেই। মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া গাড়ী চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো, মানুষ খুন করার অভিযোগে জেল হবে।

সে দ্রুত গাড়ীতে ফিরে আসে। সামনের বাঁ দিকের ফেনডারটি তুবড়ে গেছে। রক্তের দাগও লেগেছে। সে দ্রুত গাড়ী চালিয়ে নিউইয়র্কে ফিরে আসার পুরো পথটা ভিউ মিরারে বারবার আতঙ্কিত চোখ রাখছিল। পেছনে পুলিশের গাড়ী তাড়া করে আসছে কিনা। শহরে ফিরেই তার প্রথম কাজ গাড়ীটাকে সারানো কোন গ্যারেজে দিয়ে। পুলিশ নিশ্চয়ই খুঁজবে এই গাড়ীটাকে। ৯৬তম স্ট্রীটের একটা ছোট্ট গ্যারেজে গাড়ীটাকে সারাই

করতে ঢোকাল। দুজন কর্মচারী এগিয়ে এলো, আহ বেশ ভালই তো চোট লেগেছে বাঁ দিকের সামনের ফেনডারটাতে। ওদের মধ্যে লালচুলো লোকটি বলে। ধূসর চোখের অন্য মেকানিকটি বলে, রক্তের দাগ লেগেছে দেখছি। বেনডাল দাঁতে দাঁত চেপে ঢেকুর খাওয়া সামলে প্রাণপণ সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে হাসে, হ্যাঁ, আসবার পথে একটা হরিণকে জঙ্গলের পথে ধাক্কা দিয়েছিলাম। লালচুলো হাসে সে তুলনায় গাড়ীতে চোট খুবই কম লেগেছে বলতে হবে। আমার এক বন্ধু একবার একটা হরিণকে ধাক্কা মেরেছিল। পুরো গাড়ীটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বেনডাল গাড়ীটা রেখে বের হয়ে আসার সময় পিছন ফিরে দেখে মিস্ত্রি দুজন সন্দেহজনক মনোযোগের সঙ্গে ওর গাড়ীর ফেনডারটির দিকে তাকিয়ে আছে।

যখন বাড়ী ফিরে মার্ককে সে এই সাংঘাতিক ঘটনাটার কথা বলল, মার্ক আঁতকে উঠল। সে কী? মার্ক সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ঠিক আছে সোনা, এতে তোমার কোন দোষ নেই, এটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা। চলো পুলিশে ঘটনাটার রিপোর্ট করে আসি। বেনডাল একথার উত্তরে দীর্ঘসময় নীরব হয়ে থাকে। তারপর বলে, ব্যাপারটা কি পুলিশকে জানাতেই হবে? মার্ক অবাক গলায় বলে, মানে? বেনডাল যেন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, দেখো মার্ক, যা হবার হয়ে গেছে, তাই না? কোন কিছুই তো আর ভদ্রমহিলাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না, তাই না? সুতরাং সব কিছু ভুলে গেলেই তো হয়। ধরেই নাও না ব্যাপারটা ঘটেনি। মার্ক স্থির চোখে তাকায়। বেনডাল, ওরা যদি কোনদিন কখনো তোমার খোঁজ পায়...। কি করে মার্ক? কি করে? ঘটনার সময় ধারে কাছে কেউ ছিল না। কোন সাক্ষী নেই। কি করে পুলিশ আমার খোঁজ পাবে? দেখো, এখন যদি আমি ঘটনার রির্পোট করি, পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার করবে। আমার জেল হবে, কিসের জন্য? যা ঘটে গেছে, যাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। অন্য দিকে ওরা যদি আমায় গ্রেপ্তার করে,

আমার ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাবে। এত বছর ধরে গড়ে তোলা স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মার্ক ওর কাছে সরে আসবে। শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরে–ঠিক আছে, সোনা, তুমি যা চাও তাই হবে।

পরদিন, সবকটা খবরের কাগজেই ব্যাপারটা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হলো। ঘটনাটার মধ্যে বাড়তি নাটকীয়তা যেটা ফেলা হলো, সেই তথ্যটি হল মৃত মেয়েটি ম্যানহাটান যাচ্ছিল বিয়ে করতে। সবকটি কাগজেই ঘটনাটাকে যতটা পারা যায় মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক কাহিনী বানিয়ে ছাপল। প্রায় প্রতিটি কাগজেরই একটা করে সংখ্যা বেনডাল কিনে আনল। লেখাগুলো পড়ে আরো ভেঙ্গে পড়ল সে নিজের কৃতকর্মের জন্য। মহিলাটির প্রতি, তার বাগদত্তাটির প্রতি কী অন্যায় করেছে সে ভেবে রীতমত অসুস্থ বোধ করতে লাগল। কাগজেই পড়ল এই দুর্ঘটনাটির ব্যাপার কেউ কোন তথ্য দিতে পারে কিনা পুলিশ জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছে, ওরা কোনভাবেই আমার খোঁজ পাবে না। বেনডাল ভাবে, আমায় শুধু এমন ভাব করে যেতে হবে যেন ব্যাপারটা ঘটেইনি। ঘটনার পরের দিন দুপুরে বেনডাল যখন গাড়ীটাকে আনতে গ্যারেজে গেল সেখানে তখন শুধু লালচুলো নিজের নাম বলেছিল রেড (চুলের জন্যই কি?)। সে একাই ছিলো, রক্তের দাগগুলো আমি তুলে মুছে দিয়েছি। সামনের দোমড়ানোটাও সারাই করে দিয়েছি। তবে আরো কিছু টুকটাক কাজ করতে হবে। তার কৌতূহলে ভরা স্থির চোখ বেড়ালের ওপর স্থির হয়। একটু আগেই, আমার সহকর্মী স্যামের সঙ্গে তোমার গাড়ীটা নিয়ে কথা বলছিলাম। একটা হরিণের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে আরো বড় ক্ষতি হওয়ার কথা। তোমার কপাল ভাল। রেড অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। নাকি সবটাই ওর কল্পনা? ওর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে। গলাটা এত শুকিয়ে যায় যে কথা বলতেই অসুবিধা হয়। হাসবার চেষ্টা করে ব্যাপারটা হালকা করে দিয়ে। উড়িয়ে দেবার মত

গুরুত্বহীন বোঝাবার চেষ্টা করে শুকনো গলা দিয়ে কোনরকমে বলতে পারে, হরিণটা ছোট ছিল। রেড মাথা নাড়ে, হা, খুবই ছোট হবে, না হলে ক্ষয়ক্ষতি আরো অনেক বেশি হবার কথা। বেনডাল গ্যারেজ ছেড়ে বের হয়ে আসবার সময়, দুটো কৌতূহল সন্দেহ সংশয় ভরা চোখ পেছন থেকে ওর ওপর স্থির হয়ে রয়েছে, অনুমান করতে পারে।

ঐ দুর্ঘটনা ঘটবার ঠিক তিন দিনের দিনে প্রথম চিঠিটা এসেছিল।

প্রিয় শ্রীমতী রেগনর
আমি পশুক্লেশ নিবারণ সমিতির সভাপতি। বর্তমানে আমরা অত্যন্ত আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে চলেছি। আমরা জানি, আপনি আমাদের সংগঠনকে সাহায্য করতে আপত্তি করবেন না। সংগঠনের বণ্য প্রাণী নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের কাজে সাহায্য করতে পঞ্চাশ হাজার ডলার আর্থিক সাহায্য অতি অবশ্যই পাঠাতে দ্বিধা করবেন না। টাকাটা জুরিখের ক্রেডিট সুইস ব্যাঙ্ক-এর অ্যাকাউন্ট নম্বর ৮০৪০৭২-এ তে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে পৌঁছে দেবার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

চিঠির শেষে কোন নাম নেই। সই বিহীন। আর একটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার, টাইপ করা চিঠিটার সবকটি অ শব্দ ভাঙ্গা, মানে ঐ টাইপের অ অক্ষরটি ক্ষতিগ্রস্ত। চিঠিটার সঙ্গে কাগজে প্রকাশিত তিন দিন আগে বেনডালের গাড়ীতে হওয়া, এখনো পুলিশের অজানা দুর্ঘটনার খবরটার কেটে নেওয়া অংশ জুড়ে দেওয়া। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। বেনডাল বার কয়েক আগাগোড়া চিঠিটাকে পড়ে। নাহ, ভুল হবার কোন সুযোগই নেই। এখন, তার মনে হতে থাকে, মার্ক ঠিকই বলেছিল। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের মত কাজ হতো। এখনো তো সে পুলিশকে সব জানাতে পারে? পর মুহূর্তেই তার মনে

হয়, না, তা হয় না। অনেক দেরী হয়ে গেছে। আইনের চোখে এখন সে একজন পলাতক। এখন তার নিরপরাধতা বিশ্বাস করবে না পুলিশ। দুর্ঘটনাটা অনিচ্ছাকৃত, সে যে মাতাল হয়ে গাড়ী চালাচ্ছিল, এসব প্রমাণই বা এখন কি করে করবে সে? অতএব, এখন একমাত্র যে কাজটা করার আছে সেটাই করে বেনডাল। তার ব্যাঙ্কে ফোন করে, আমার অ্যাকাউন্ট থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার হস্তান্তর হবে। জুরিখের সুইস ক্রেডিট ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বরে...

সে রাতে বাড়ীতে ফিরে বেনডাল চিঠিটা মার্ককে দেখাল। হে ভগবান, চিঠিটা আগাগোড়া পড়বার পরে মার্কের প্রতিক্রিয়া, কে পাঠাতে পারে চিঠিটা? কে দেখেছে, জানে ঘটনাটা? আর্তস্বরে প্রশ্ন করে সে। কেউ না বিশ্বাস করো। তখন ধারে কাছে জন প্রাণী ছিল না। অসহায় গলায় কেঁদে ওঠে বেনডাল। অথচ, কেউ কেউ তো নিশ্চয়ই জানে। মার্ক আমি জোর গলায় বলতে পারি সে সময় ওখানে একজনও কেউ ছিল না। মার্ক কি যেন ভেবে নেয়, এক মিনিট। ঘটনার পর ঠিক ঠিক কি কি ঘটেছিল। তুমি কি কি করেছিল, বিস্তারিত ভাবে বলতো। সব খুলে বলবে মনে করে। কিছু ভুলে না গিয়ে বাদ না দিয়ে বলবে। বেনডাল সমস্ত ঘটনা শহরে ফেরার পর থেকে গুছিয়ে বলে মার্ককে। গ্যারেজ, রেড আর স্যাম, ওদের কথাবার্তা সংশয়। অফিসে তার সেক্রেটারী নাদিনকেও বলেছিল, ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা হয়েছে গত রাতে যখন ওর চেহারা বিপর্যস্ত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে বলে নাদিন জানিয়েছিল। এই তিন জনের মধ্যে কেউ কি? মার্ক গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। তারপর মুখ তোলে, হতে পারে ঐ তিন জনেরই কেউ একজন। আবার এমনও হতে পারে তোমার প্রতি সন্দেহ হওয়ায় ঘটনাটা সে অন্য কাউকে বলেছিল। সে কাগজে দুর্ঘটনাটার খবর পড়ে, তারপর দুই আর দুইতে চার করেছে। আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে চিঠিটা ভাওতা। তোমায় পরীক্ষা করার জন্য চিঠিটা পাঠান হয়েছিল। কথা শেষ করে

সজোরে নিজের তালুতে ঘুষি মারে মার্ক, উফ বেনডাল। সেক্ষেত্রে টাকাটা চট করে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি চরম বোকামির কাজ করেছে। কেন? বেনডাল অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। কারণ তুমি টাকাটা পাঠিয়ে ওদের মনে যে দ্বিধা সন্দেহ ছিল তোমার অপরাধ সম্পর্কে তা কাটিয়ে দিয়েছে। নিজের অপরাধ স্বীকার করে ওদের হাতে প্রমাণ তুলে দিয়েছে। বেনডাল ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, এখন তাহলে আমি কি করব? মার্ক গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করার পরে বলে, ঐ নোংরা লোকটাকে খুঁজে বের করার একটা পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে।

পরের দিন সকাল দশটা, বেনডাল আর মার্ক রাসেল গিবসনের অফিসে তার মুখোমুখি বসেছিল। গিবসন ম্যানহাটান ফাস্ট সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক এর সহঅধিকর্তা। বলুন, আপনাদের জন্য কি করতে পারি? গিবসন হাসি খুশি ভাবে প্রশ্ন করেন। মার্ক উত্তর দেয়,–দেখুন, শ্রীযুক্ত গিবসন, আমরা সুইস ক্রেডিট ব্যাঙ্কের একটা বিশেষ নাম্বার, জুরিখ শাখার ঐ নাম্বারটার আসল মালিক কে, সে ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছি। কথাগুলো শুনেই রাসেল গিবসনের কপাল কুঁচকে যায়। এটা কি অপরাধ সংক্রান্ত কোন তদন্ত? মার্ক চট জলদি উত্তর দেয়, না, না, সেরকম কিছু নয়। মুহূর্তে গিবসনকে দুশ্চিন্তামুক্ত শান্ত দেখায়। সেক্ষেত্রে আমি দুঃখিত। আমি আপনাদের কোন সাহায্যই করতে পারব না। সুইস ব্যাঙ্কগুলো, তাদের সদস্যদের নাম পরিচয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত গোপনীয়তা পালন করে। একমাত্র অপরাধজনিত অথবা প্রতারণা তদন্তের ক্ষেত্র ছাড়া ওরা ওদের ক্লায়েন্টদের ব্যাপারে কোন কথাই দেয় না, দেবে না। মার্ক ঝুঁকে পড়ে উদগ্রীব গলায় বলে, কোন পথই কি নেই তবে? কোন উপায়? ব্যাপারটা খুবই জরুরী। মরণ বাঁচন সমস্যা ভাবতে পারেন। গিবসন হাত উলটোয়, অন্য পথ? দুঃখিত, আমার মনে হয় না

সেরকম কিছু সম্ভব বলে। বেনডাল ও মার্ক দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকায়। বেনডালের মুখ ছাপিয়ে উঠেছে। তীব্র হতাশার ছায়ামেঘ।

গাড়ীটাকে নিয়ে আসতে রেড-এর গ্যারেজে গিয়েছিল। তখন সন্ধ্যে। ধারে কাছে স্যাম অথবা রেড কাউকেই দেখতে পেলো না। অফিস ঘরে উঁকি মারল। না, সেটাও ফাঁকা। আর তখনি অফিস ঘরের টেবিলটায় টাইপ রাইটারের ওপর তার নজর পড়ল। নিমেষে একটা দোলায় তীব্র একটা সম্ভাবনায় দুলে ওঠে ওর মন। সতর্ক ভঙ্গীতে আশেপাশে নজর বুলিয়ে নেয়। না, ধারে কাছ কেউ নেই। দ্রুত পায়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে টেবিলটার দিকে এগিয়ে যায়। টাইপরাইটারটাতে একটা কাগজ ভরে অ অক্ষরটায় কয়েকবার আঙুলে টোকা দিতে যায়। ঠিক এই সময়েই বাইরে পায়ের শব্দ হয়। দ্রুত টাইপরাইটারটার সামনে থেকে সরে আসে। স্যাম ঘরে ঢোকে। টাইপরাইটারের অ অক্ষরটা ভাঙ্গা কিনা জানবার সুযোগ হয় না। স্যাম ওকে দেখে বলে, কী ব্যাপার ম্যাডাম? –আমি গাড়ীটাকে ফেরত নিতে এসেছি। স্যাম একবার ওকে আর একবার টাইপরাইটারের দিকে সন্দেহ কুটিল চোখে তাকায়। তারপর মাথা নাড়ে, এখন তো হবে না। আরো কিছু কাজ বাকি রয়েছে। পরের দিন বিকেলে যখন আবার সে গ্যারেজে যায় অফিস ঘরে রেড় বসেছিল। বেনডাল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে টেবিলের ওপর পুরনো টাইপরাইটারটা নেই। সেখানে ঝকঝক করছে একটা নতুন আধুনিক কম্পিউটার। একটা চাপা শ্বাস ছাড়ে বেনডাল। তাহলে, এখন কম্পিউটারও? ভাঙ্গা, লঝরে খদ্দেরহীন একটা গ্যারেজের মালিকের আচমকা এতখানি সক্ষমতা কী করে হয়, হলে, হতে পারে?

রাতে ব্যাপারটা মার্ককে বলতে সে মাথা নাড়ে। চিন্তান্বিত ভঙ্গীতে, ব্যাপারটা শুধুই একটা সম্ভাবনা। নিশ্চিত প্রমাণ কিছু নেই, যা আমাদের প্রয়োজন। পরের দিন অফিসে গিয়ে

নাদিনকে দেখে বেনডাল চমকে উঠল, নাদিনের গায়ের মহার্ঘ্য কোটটা ওর নজর কেড়ে নিলো। এর আগে নাদিনকে কখনো এত দামী জামাকাপড় পরতে দেখেনি সে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে নাদিন হাসে, গর্বমাখা গলায় বলে, কাল আমার জন্মদিন ছিলো। আমার স্বামী আমাকে এই দারুণ কোটটা উপহার দিয়েছে। বেনডাল শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। কোটটার দাম কমপক্ষে দু থেকে আড়াই হাজার ডলার।

.

১৯.

জুলিয়া স্ট্যানফোর্ডের রুমমেট ছিলো স্যালি। হাসিখুশি প্রাণবন্ত, ফুর্তিবাজ স্যালিকে জুলিয়া পছন্দই করত। ওর একটা খারাপ বিয়ের অভিজ্ঞতা ছিল। যে কারণে স্যালি আর কখনোই কোন পুরুষের সঙ্গে নিজেকে জড়াবে না। যদিও এ প্রতিজ্ঞা স্যালি কতদিন রক্ষা করতে পারবে সে ব্যাপারে ঘোরতর সন্দেহ ছিল জুলিয়ার মনে। কারণ পুরুষসঙ্গ স্যালি অত্যন্ত পছন্দ করত। এবং পছন্দের ব্যাপারটায় সে অটল থাকত না। প্রতি সপ্তাহেই তাকে নতুন পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে সপ্তাহান্তের ডেটিংয়ে যেতে দেখত জুলিয়া। ব্যাপারটা ওর মনে মজা জোগাত। তবে স্যালি পুরুষ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে, পছন্দের সিদ্ধান্তে একটি ক্ষেত্রে সবিশেষ কঠোর থাকত। তার নিত্যনতুন প্রেমিকেরা সবাই হতো বিবাহিত পুরুষ। বিবাহিত পুরুষেরাই নিরাপদ। দার্শনিকভাবে স্যালি উত্তর দিতো। ওরা সব সময় অপরাধবোধে ভোগে। ফলে, সঙ্গিনীকে তোয়াজে ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া ওরা তোমাকে বিয়ে করবে বলে ঘ্যানঘ্যান করে বিরক্তও করবে না। স্যালি, জুলিয়া কেন কোন পুরুষের সঙ্গে মেশে না এ ব্যাপারে মাঝে মাঝেই অনুরোধই করত। জুলিয়া মনে

মনে হাসত, তাকে নিয়ে ডেটিং-য়ে যেতে চাইবে কোন পুরুষ? তাছাড়া জুলিয়া শুধু ডেট করার জন্যই কোনো পুরুষের সঙ্গে মিশবার পক্ষপাতি ছিল না। ওর বিশ্বাস ছিল ভালবাসায়। ও মিশবে এমন কোন পুরুষের সঙ্গে যে সত্যি সত্যি জুলিয়াকে মন দিয়ে ভালবাসবে। জুলিয়ার জন্যে যার আন্তরিকতা, সহানুভূতি আবেগ, যত্ন থাকবে।

স্যালি মাঝে মাঝেই তার পুরুষ বন্ধুদের কারো কারো সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিত। ডেটিং করতে পাঠানোর জন্য উদগ্রীব হতো। সচেষ্ট তৎপর হতো। কিন্তু জুলিয়া আমল দেয়নি। রাজী হয়নি। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল অন্যভাবে। হেনরি ওয়েসসনের সঙ্গে তার দেখা হতো প্রায়ই অফিসের লিফটে। একই বাড়ীর চারতলায় ছিলো জুলিয়ার অফিস। আর সাততলায় ছিলো হেনরির অফিস। মাঝে মধ্যেই দেখা হতো। তাই একদিন হেনরি মৃদু হেসে সুপ্রভাত জানায়। উত্তরে জুলিয়াও সু-প্রভাত বলে। এভাবেই সাত-আট মাস পর লিফটে সেদিন আর কেউ ছিলো না। একান্তে জুলিয়াকে হেনরি বলে, সন্ধ্যেতে কী করছেন? আমরা কি একসাথে আজ রাতের খাবারটা খেতে পারি? কী জানি কী ভেবে, হয়ত হেনরি ওয়েসসনকে ততদিনে মনে মনে পছন্দ করতেও শুরু করেছিল জুলিয়া। রাজী হয়ে যায়। সেই সন্ধ্যেতে জুলিয়াকে ইবিটি, কানসাসসিটির অন্যতম সেরা রেস্তোরাঁয় নিয়ে যায় সে। মহার্ঘ্য বিশাল পরিবেশে দুর্দান্ত রান্না খাবার খেতে খেতে হেনরি ওয়েসসন নিজের ব্যাপারে সব কিছু জানায়। এই শহরেই তার বড় হওয়া, জন্ম থেকে যুবক হওয়া। নিজের একার চেষ্টাতেই আজ সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সম্পূর্ণভাবেই আত্মপ্রতিষ্ঠিত মানুষ সে। আজ সে নিজের চাটার্ড ফার্ম খুলেছে। নিজস্ব ফার্ম। সব কথা জানিয়ে মৃদু হেসে জুলিয়ার দিকে তাকায়। এবার তোমার কথা বলো, জুলিয়া স্থির চোখে হেনরির দিকে তাকায়। নিজের কথা? পৃথিবীর অন্যতম ধনী পুরুষের, সারা আমেরিকা, পৃথিবী যাকে এক ডাকে চেনে তার অবৈধ সন্তান আমি। প্রেমিকা,

অথবা রক্ষিতার সন্তান। তার বিপুল বিশাল সীমাহীন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। এসব বলবে? বলা যায়?

হেনরি আগ্রহী চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিল, সুতরাং যতটুকু যা বলা যায়। আমার জন্ম মিলাউঁকি শহরে, ছোটবেলায় আমার বাবা মারা যান... সব কথা শুনে হেনরি ওর হাতটাকে আলতো করে চেপে ধরে। তার মানে, তোমার জীবনে কোন পুরুষ মানুষ আসেনি। কখনন, যে তোমায় আগলে রাখবে। সব দায়িত্ব নেবে তোমার। একটু থেমে দ্রুততর কয়েকটা শ্বাসের পর হেনরি যোগ করে, আমি এবার সারা জীবনের জন্য তোমার দায়িত্ব নিতে চাই। তোমায় আগলে রাখতে, ভালবাসতে চাই। জুলিয়া তুমি কি আমায় সে সুযোগটা দেবে?

সেদিন ছিল শনিবার, গত চারমাস ধরেই শনি-রবিবার হেনরি তাকে নিয়ে বের হচ্ছে। আজও সে সেজেগুজে তৈরি হচ্ছে, বিছানায় আধশোয়া হয়ে স্যালি তাকে লক্ষ্য করছিল। এবার কৌতুক জড়ানো গলায় সে বলল, হু, তাহলে আরো একটা দারুণ দুর্দান্ত হেনরি রাতে যাচ্ছো তুমি? তো আজ তোমরা কোথায় যাবে? জুলিয়া লাজুক ভঙ্গীতে হাসে, আজ সিমফনি হলে যাবো আমরা। ক্লিও লেইনির বাজনা শুনতে। তারপর স্যালির দিকে তাকিয়ে বলে, আর তুমি? তুমি কখন বের হবে? স্যালি আড়মোড়া ভাঙ্গে, হ্যাঁ এবার আমারও তৈরি হবার সময় এসে গেল। বিছানায় উঠে বসে সে, তারপর মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে সে বলে, আমি আজ কালো পোষাকটা পরছি, তোমার কালো উঁচু হিলের জুতোটা কি আজ রাতের জন্য ধার নিতে পারি? জুলিয়া হাসে, স্বচ্ছন্দে, দেখো কাঠের আলমারীতে আছে নিয়ে নাও। আমি তবে আসি? শুভরাত্রি। জুলিয়া বের হয় যায়। স্যালি উঠে জুলিয়ার কাঠের আলমারিটা খোলে, যে

জুতোটা খুঁজছে সেটার মাথার ওপর তাকটার রয়েছে। স্যালি হাত বাড়ায় জুতো দুটো ধরে টান মারে। জুতো দুটোর সঙ্গে সঙ্গে একটা কার্ড বোর্ডের বাক্স নেমে আসে এবং মেঝেতে আছড়ে পড়ে। মেঝেতে পড়ার পরই ডালাটা খুলে গিয়ে বাক্সটা থেকে একরাশ নানা আকারের টুকরো কাগজ সারা ঘরময় ছড়িয়ে যায়। ধুত্তোরি। বিরক্তিতে মেঝেতে পা ঠোকে স্যালি। তারপর নিচু হয়ে কাগজগুলো তুলে বাক্সটায় গুছিয়ে রাখতে থাকে। ঠিক এই সময়ে ওর পেছনে দরজাটা আবার খুলে যায়। স্যালি মাথা ঘুরিয়ে দেখে জুলিয়া ঢুকছে, কি ব্যাপার, তুমি? সবিস্ময় প্রশ্ন করতে জুলিয়া হাসে,–আরে পার্সটা ফেলে গেছি। তারপরই তার নজর পড়ে বাক্সটার দিকে। নজর পড়তেই রুক্ষ গলায় সে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, তুমি ওটা নিয়ে কী করছ?

জুলিয়ার প্রতিক্রিয়ায় স্যালি অবাক হয়, অপরাধীর গলায় বলে,দুঃখিত, জুতোটা টানতে গিয়ে বাক্সটা... জুলিয়া ততক্ষণে নিচু হয়ে বসে পড়েছে। স্যালিকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দ্রুত হাতে কাগজগুলোকে বাক্সে তুলে ভরে রাখছে। ওর মুখে গালে রক্তাভা। স্যালি একটু সরে বসে জুলিয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল। বিস্ময় জড়ানো কিছুটা ধাঁধাগ্রস্ত গলায় সে বলে, তুমি যে বড়লোকদের নিয়ে, তাদের বাপারে এতটা আগ্রহী, জানতাম না। জুলিয়া নীরবে কাগজগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে রাখছিল। ওগুলো আসলে নানা খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া খবরের ছবির কাটা অংশ। ছবিসহ খবরগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে বাক্সে রাখার পর, সে যত্ন করে জামায় ঘষে ঘষে মুছে বাক্সে ভরল হৃদয় আকৃতির লকেট লাগানো সোনার চেনটাকে। মা এটা ওকে দিয়ে গেছেন। স্যালি হঠাৎ নিচু চাপা স্বরে প্রশ্ন করে, জুলিয়া তুমি হ্যারী স্ট্যানফোর্ড-এর ব্যাপারে এত উৎসাহী কেন? আমি নই... আমার মা। এসব তিনিই আমায় দিয়ে গেছেন। স্যালিকে স্থির, অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে জুলিয়া দুঃখ মেশানো মৃদু হাসে। খুব

কৌতূহল হচ্ছে তাই না? কাগজের দঙ্গল থেকে সে একটা মাঝামাঝি আকারের কাটা টুকরো বের করে স্যালির দিকে এগিয়ে দেয়। একটা কেচ্ছা কেলেঙ্কারী প্রধান পত্রিকার প্রথম পাতা। বড় বড় শিরোনাম বিখ্যাত শিল্পপতির বাড়ীর গভর্নেস অন্তসত্ত্বা, কন্যা শিশুর জন্ম। মা, শিশু কোথায়?

কাগজটা, খবরের কাটা টুকরোটা পড়া শেষ হলে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে স্যালি চেঁচিয়ে ওঠে। উত্তেজনায় ঠাসা গলা, তুমি, তুমি কোটিপতি ব্যবসায়ী, তিনি দিন কয়েক আগে জলে ডুবে মারা গেছেন তার মেয়ে। জুলিয়া ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসে থাকে। স্যালি মাথা ঝাঁকায়, কী হলো? কথা বলছ না কেন? জুলিয়া দাঁতে দাঁত পিয়ে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে করতে বলে, দয়া করে অন্য কথা বলো স্যালি। এ বিষয়ে কোন কথা বলতে চাই না আমি, প্লিজ। সালি প্রায় আঁতকে ওঠে-এ বিষয়ে কথা বলতে চাও না তুমি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? বদ্ধ উন্মাদ নাকি তুমি?

জুলিয়া ধমকের সুরে বলে, স্যালি। তুমি জানো, তুমি যদি সত্যিই ওর সন্তান হও, তার অর্থ কত বিলিয়ন ডলার? আমার তাতে কিছু যায় আসে না। হ্যারী স্ট্যানফোর্ড একজন অতি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আমার মাকে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। তাছাড়া, ঐ পরিবার, ওরা আমাকে ঘৃণা করে। আমিও হ্যারী স্ট্যানফোর্ডকে ঘৃণা করি। যেভাবে তিনি ঘৃণা করতেন আমার মাকে ও আমাকেও। এত টাকা যেখানে জড়িত, ঐ ঘৃণা মান অভিমান এসব খুবই তুচ্ছ জুলিয়া, খুবই তুচ্ছ। ওরা জানেই না যে আমি বেঁচে আছি। তুমি ওদের বলবে, জানাবে। জুলিয়া তিতিবিরক্ত ভঙ্গীতে বলে, স্যালি, এবার এ প্রসঙ্গ টাকে বাদ দাও, ছাড়ো।

স্যালি দীর্ঘক্ষণ স্থির চোখে জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর মাথা নেড়ে একটা গভীর শ্বাস ছাড়ে। প্রবল হতাশার।

.

২০.

টাইলার প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। দিশেহারাও। গত চব্বিশ ঘণ্টায় সে না হোক কম করেও কুড়ি বার লি-এর ফ্ল্যাটে ফোন করেছে। অথচ এক ঘেয়ে উত্তর যন্ত্র বেজেই চলেছে। টাইলার কুল কিনারা পায় না। ও কার সাথে এতক্ষণ ধরে কী করছে? আবার আরো একবার লি-এর নম্বর ঘোরায় সে। দীর্ঘক্ষণ রিং বাজবার পর টাইলার যখন আবার মনে মনে উত্তর যন্ত্রের নিরস জবাব শোনবার জন্য তৈরি হচ্ছে, ফোন তোলে লি, হালো? লি তুমি কেমন আছো? আপনি কে বলছেন? লি-এর গলায় একরাশ বিরক্তি। আমি, আমি টাইলার সোনামনি। টাইলার। অন্যপ্রান্তে এবার বেশ লম্বা বিরতি, তারপর আবার লি বলে, হ্যাঁ বলল। তুমি কেমন আছছ সোনা? খুব ভালো। মনে আছে লি সোনা, অমি তোমায় বলেছিলাম তুমি যা চাও চাইবে, একদিন সেসব তোমায় আমি দেবো, দিতে পারব। অন্য প্রান্তে লি শব্দহীন, নিঃশ্বাসের শব্দও পায় না। টাইলার বলে চলে, তুমি একদিন বলেছিলে, বিলাসবহুল প্রমোদ তরণীতে সওয়ার হয়ে সেন্ট ট্রপেজ দ্বীপে বেড়াতে যাবার ইচ্ছের কথা। কবে যেতে চাও? নিঃশ্বাস ছাড়ার শব্দের সঙ্গে মিশে যায় লি-এর বিস্ময় অবিশ্বাস মাখা কথাগুলো। তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ না? নিশ্চিত ভাবেই না। এবার শব্দ করে হেসে ওঠে, না ওসব ভাবনা ফেলে দাও। আমি নিজেই একটা ইয়ট কিনছি। তুমি...ইয়ট...। টানা কয়েক মুহর্তের নীরবতার পর লি-এর বিরক্তি মাখা

গলা ভেসে আসে, তুমি নিশ্চয়ই নেশা করেছ। তাই না? নেশা? টাইলার আবার সশব্দে হেসে ওঠে, না লি সোনা। তুমি যা ভাবছ সেসব কিছুই নয়। আসলে আমি হঠাৎ করেই কিছু টাকা হাতে পেয়েছি। অনেক টাকা। এবার লি-এর গলায় আগ্রহ ফুটে ওঠে,–বেশ। আমি রাজী তোমার সঙ্গে যেতে।

টাইলার একটা হাফ ছাড়ার তীব্র অনুভুতি বোধ করে। ঠিক আছে। তুমি আমায়...নাহ... ভুলেও এ কাজটা করার কথা মাথায় আনতেই পারে না সে। দ্রুত নিজেকে সংশোধন করে নেয়, ঠিক আছে, আমি তাহলে সময় মত তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবো। ফোন ছেড়ে দিয়ে যথা স্থানে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে, বিছানার নরম গদিতে শরীর ছেড়ে দেয়। আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজী আছি। পরপর দৃশ্যগুলোকে যেন চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখতে পায় টাইলার। তারা দুজনে বিলাসবহুল একটা প্রমোতরণীতে করে ভেসে বেড়াচ্ছে ফেনিল, সগর্জন, ঢেউ তোলা, সমুদ্রের বুকে। তারা দুজনে শুধু এক সাথে।

.

উডি পোলো পনির বিষয়ে ভাবছিল। এতদিন তাকে পোলো মাঠে নামতে হতো অন্যের পনিতে চড়ে। বন্ধুদের কারো। আহ এতদিনে, এতদিন এবার সে মাঠে নামবে নিজস্ব পনিতে সওয়ার হয়ে। পৃথিবীর অন্যতম সেরা পনি, হ্যাঁ এখন সে, উডরোও স্ট্যানফোর্ড সে ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা রাখে। সে ফোনটা তুলে মিমি কারসনের নম্বর ঘোরায়। অন্য দিকে মিমির সাড়া পাওয়া মাত্র কোন ভনিতা না করে সরাসরি কাজের কথা বলে– আমি তোমার পনিগুলো কিনে নিতে চাই। ওর কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় টগবগ করে ওঠে।

অন্যদিকে মিমির গলায় কিছুটা দ্বিধা সংশয়। উডি জোর আনে নিজের দাবীতে, আমি কিন্তু একেবারেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত। স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েই কথাগুলো বলছি। এরপর প্রায় আধঘণ্টা দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ চলে। কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রাখবার পর উডিকে খুশিতে উজ্জ্বল দেখায়। পেগি কোথায়? ওকে কথাটা বলা দরকার। খুঁজতে খুঁজতে ওকে বারান্দায় পায়। একা দাঁড়িয়ে আছে নির্জন বারান্দাটাতে, দূর থেকেই পেগির মুখের ক্ষতচিহ্নগুলোফোলা, দাগ, কালশিটে, দেখতে পায়। ওর হাতে মার খাবার স্মারক। উডি পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। নরম গলায় ডাকে, পেগি? চমকে ফিরে তাকায় পেগি, তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটে যেন। কোন ঘুম ঘোর থেকে জেগে ওঠা পেগি তাকায়। উডি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। নরম গলায় বলে, পেগি, আমার তোমায় কিছু কথা বলার আছে, জানি না কি ভাবে বলব... কোনখান থেকে শুরু করব। পেগি তাকিয়ে থাকে, ওর মুখে সাবধানী ছাপ। সে অপেক্ষা করতে থাকে। উডি শুরু করে, দেখো পেগি, জানি আমি স্বামী হিসেবে অত্যন্ত খারাপ। এমন কিছু কিছু ব্যবহার তোমার সঙ্গে আমি করেছি যার কোন ক্ষমা নেই। কিন্তু প্রিয়তমা এখন সব কিছু বদলে গেছে। এখন সুসময় এসেছে। আমাদের হাতে এখন প্রচুর টাকা। স্ত্রীয়ের হাতটাকে নিজের হাতে তুলে নেয় সে, আলতো চাপ দেয়। পেগি আমি কথা দিচ্ছি, আমিও বদলে ফেলব নিজেকে। মাদক নেশা ছেড়ে দেবো। তুমি যদি চাও কোন মাদকাস থেকে চিকিৎসা করাতেও রাজী আছি আমি। এবার জীবন বদলে যাবে পেগি, অন্যরকম হয়ে উঠবে।

প্রখর অথচ শান্ত গভীর চোখে উডির চোখে চোখ রাখে। নির্মোহ গলায় বলে, সত্যি কি তা হবে উডি? উডি আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে, জোরালো গলায় বলে, হ্যাঁ প্রিয়তমা, আমি কথা দিচ্ছি। সব বদলে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে। ওর গলায় ভেসে ওঠে মরীয়া বেপরোয়া জেদের ভাব। পেগি দীর্ঘক্ষণ ধরে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর স্বামীর

হাতটাকে চেপে ধরে। বিশ্বাস জোগানোর গলায় বলে, আঁ উডি সোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি সেরে উঠবে। আমাদের জীবন আবার..আমি তোমার সঙ্গে আছি, থাকব একাজে।

মার্গো পসনারের বিদায় নেবার সময় এসে পড়ল। বসবার ঘরে টাইলার ওকে পেলো। দরজাটা বন্ধ করে সে মার্গোর সামনে এসে দাঁড়ালো, অনেক ধন্যবাদ মার্গো। আমার জন্য তুমি যা করলে তা আমি কখনো ভুলব না। মার্গো হাসে, কাজটায় বেশ উত্তেজনা রোমাঞ্চ ছিল। আমি বেশ মজা পেয়েছি। কথা শেষ করে কৌতুকের গলায় সে আবার যোগ করে, হয়ত আমার অভিনেত্রী হওয়া উচিত ছিলো। জীবনটা হয়ত অন্যরকম হতো তাহলে। টাইলার রাত পোশাকের পকেট থেকে একটা চেক বের করে এগিয়ে দেয়, এই নাও। বাকি টাকাটা। তারপর অন্য পকেট থেকে আর একটা খাম বার করে। আর এই যে তোমার শিকাগো ফিরে যাবার বিমান টিকিট। নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, আর দেরী করা উচিত নয়। তুমি এবার রওনা হও। পসনার মাথা নাড়ে, ধন্যবাদ, আমায় জেল থেকে বের করার এবং অন্য সব কিছুর জন্য, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জজ টাইলার। টাইলার হাসে। সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে, তোমার যাত্রা শুভ হোক। টাইলার মার্গোকে নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করে নেবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে। ওর মুখে ফুটে ওঠে একটা বিচিত্র হাসি।

খেলা শেষ।

চেক অ্যান্ড চেকমেট

মার্গো যখন তার ঘরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত, বেনডাল ঘরে ঢোকে। জুলিয়া আমি...কথা শেষ না করে থমকে যায়। তারপর ফিরতি প্রশ্ন করে, এসব কী করছ তুমি? মার্গো ওর দিকে ফিরে তাকায়, আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। জুলিয়া বিস্ময়ের গলায় বলে এত তাড়াতাড়ি? কেন? এত তাড়া কিসের? এত বছর বাদে আমাদের দেখা হলো সবাই এক সাথে হলাম। তোমার সঙ্গে তো জীবনে প্রথম দেখা। ভেবেছিলাম ভাই বোনেরা একসঙ্গে কয়েক দিন থাকব। হৈ চৈ হুল্লোড় মজা করব। মার্গো মাথা নাড়ে,–নিশ্চয়ই। পরে কোন সময় নিশ্চয়ই আবার সুযোগ হবে। বেনডাল বিছানার পাশে গিয়ে বসে। সব কিছু কেমন স্বপ্নের মত ঘটে গেল তাই না? এত বছর পর আবার ভাই বোনেরা একসঙ্গে হলাম, দেখা হলো, বিরাট সম্পত্তির অংশ পেলাম। মার্গো নিজের কাজ সারতে সারতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। বেনডাল হাসতে হাসতে বলে, আর তোমার কথা তো একেবারেই আলাদা। নিজেকে তোমার সিন্ডারেলা মনে হচ্ছে না? মানে এক মুহূর্ত আগে তুমি ছিলে একজন গড়পড়তা মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ। আর পরের মুহূর্তে...বিলিয়ন ডলারের চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য অঙ্কের মালকিন, উত্তরাধিকারী, স্বপ্নও বোধহয় এতটা দুঃসাহসী হবার স্পর্ধা দেখাতে পারে না। তাই না? নিমেষে মার্গোর হাত থেমে যায়। মুখের ভাব বদলে যায়। কি? বিলিয়ন ডলার? বেনডাল হাসতে হাসতেই বলে, হ্যাঁ, বাবার উইল অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকে মোটামুটি ভাবে বিলিয়ন সওয়া বিলিয়ন ডলার করে সম্পত্তির অংশীদারী হচ্ছি। কেন? তুমি একথা জানো না? মার্গোর মুখে উত্তেজনায় ঘাম চিক চিক করে। স্তম্ভিত মুখে সে বলে, তুমি বলতে চাও আমার ভাগেও বিলিয়ন ডলারের বেশি থাকছে? জুলিয়া দৃঢ় গলায় বলে, হ্যাঁ। নিশ্চিত ভাবেই। কেন ওরা

তোমায় কিছু বলেনি। মার্গোর মুখে গভীর রহস্যের ছোঁয়ামাখা অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে, না, ওরা কেউ আমায় কিন্তু একথা জানায়নি। ওর মুখে অন্যরকম এক ছায়া খেলা করতে থাকে। বেনডালের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সে বলে, বেনডাল, আমি ভেবে দেখলাম তুমি ঠিকই বলেছ। এত বছর পর, জীবনে প্রথমবার তোমাদের সঙ্গে দেখা পরিচয় হলো। এভাবে চলে যাওয়া উচিত নয়, আরো কটা দিন কাটিয়েই যাই।

প্রমোদতরণী কেনার ব্যাপারটা অনেকটা পাকাপাকি হয়ে গেছে। নিজের ঘরে বসে একটা ক্যাটালগে কিছু বাছাই করা ইয়টের ছবি দেখছিল। এর থেকে পছন্দ করে জানিয়ে দিলেই এজেন্সি দাম মিটিয়ে দেবার পর ওর নামে নথিবদ্ধ করে নেবে নৌকোটাকে। ঠিক এমন সময়ে ফোনটা বাজল। হ্য লো, টাইলার স্ট্যানফোর্ড বলছি। টাইলার শিকাগো থেকে কিথ পার্সি বলছি। শরীরের অসুস্থতার কারণে আমি কয়েক মাস আগেই অবসর নিচ্ছি। তুমি আমার পরে প্রধান বিচারপতি হতে রাজী আছে? কয়েক সেকেন্ড, দ্রুত ভেবে নেয় টাইলার। তার পর যথাসম্ভব আন্তরিকতার গলায় জবাব দেয়, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কেন নয়? এতো দারুণ একটা সুযোগ। ঠিক আছে। তাহলে ঐ কথাই রইল, তুমি তাহলে পরের প্রধান বিচারপতির পদ পাচ্ছো। ফোনটা রেখে দিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে, হ্যাঁ, এটা ঠিক, একটা সময় ঐ চেয়ারটার দিকে তৃষ্ণার্ত চাতকের মত লোভী চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকত সে। এখন ঐ ছোট্ট নোংরা চেয়ার বা পদটার দিকে তার কোন আগ্রহ নেই। সে আজ কোটিপতি। ঐ ঘিঞ্জি শিকাগো কোর্টঘরে মানায় কোন কোটিপতিকে? আহ সে তো সেই সময়গুলোয় বরং নিজের প্রমোদতরণীতে ভেসে বেড়াবে সমুদ্র থেকে সমুদ্রে স্বপ্নসফরে। সঙ্গে থাকবে লি, শুধু লি, স্বপ্ন সঙ্গিনী। এসব সুখস্বপ্ন থেকে তাকে এক ঝটিকায় বাস্তবের রুঢ় মাটিতে টেনে নামায় মার্গো। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে চমকে ওঠে সে। একি? তুমি এখনো রওনা হওনি? বিস্ময়ের গলায় বলে

সে। মার্গোর ঠোঁটে এক বিচিত্র হাসি, কৌতুকের সঙ্গে। আরো কি যেন অজানা ইঙ্গিতের মিশ্রণ সে হাসিতে, নাহ। গোছগাছ খুলে রাখলাম। আমি এখন যাচ্ছি না। টাইলার আঁতকে ওঠে। সে কি? কেন? সেই আশ্চর্য্যতর হাসিটা মার্গোর ঠোঁটে আরও চওড়া হয়। এই নাটকটা করার কথা প্রথম যখন হয়, তুমি আমাকে বলেছিলে এটা করার প্রয়োজন একজনের সঙ্গে সামান্য একটা ঠাট্টা করার জন্য। হ্যাঁ তাই। সেই ঠাট্টাটা তুমি করেছ আমার সঙ্গে। আমি বিলিয়ন ডলার দামী, আর আমাকে সামনে রেখে তুমি সেটা আত্মসাৎ করেছ। কথাগুলো শুনতে শুনতে টাইলারের মুখের ভাব শক্ত হয়ে ওঠে। কঠিন গলায় সে বলে, বেরিয়ে যাও, এই মুহূর্তে তুমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। তুমি তাই ভাবছ বুঝি? আমি তখনই এ বাড়ী থেকে চলে যাবো যখন বুঝব উপযুক্ত সময় হয়েছে। যা এখন হয়নি। কঠিন প্রত্যয়ী গলায় বলে।

টাইলার ঠান্ডা ধীর চোখে কয়েক মুহূর্ত ওকে জরীপ করে। তারপর ধীর বরফ কাটা গলায় বলে, বেশ তুমি কি চাও? মার্গোর চোখের তারা ঝিলিক দিয়ে ওঠে, আহ, এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা। বিলিয়ন ডলার, ওহু আমি ভাবতেই পারছি না। এসো টাইলার একটা রফায় আসা যাক।

.

পরদিন থেকেই রোজ হিলের বাড়ীতে বাক্সের পর বাক্স এসে পৌঁছাতে লাগল। বিখ্যাত সব পোশাক প্রস্তুতকারক সংস্থার দামী দামী পোশাকের বাক্স। কিন্তু টাইলার হুড়মুড় করে মার্গোর ঘরে ঢুকে এসে চাপা গলায় হিসহিস করে ধমকে ওঠে, কি ব্যাপার, নিজেকে ভেবেছ কি তুমি? মার্গো নিঃশব্দে হেসে, রাগ করছ কেন? যতই হোক তোমার

বোন, স্ট্যানফোর্ড পরিবারের একজন যদি কমদামী সাধারণ পোশাক পরে থাকে, সম্মান থাকবে তোমাদের পরিবারের? একটু খরচ না হয় করলে নিজের বোনের জন্য। কথা শেষ করে সে কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়ে। মার্গো... ক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে ওঠে টাইলার। মার্গো হাসিটা ধরে রেখেই জ্বালা ধরানো গলায় বলে, উঁহু জুলিয়া, ভুল করছ। তারপর আচমকা চোখা গলায় মার্গো বলে, ভাল কথা, তোমার টেবিলে কতগুলো ইয়টের ছবি দেখলাম। তুমি কি কোন ইয়ট কিনবার পরিকল্পনা করছ? সেটা তোমার ভাবার বা মাথা গলানোর ব্যাপার নয়।

মার্গো দার্শনিকের গলায় বলে, নিশ্চিত করে কে বলতে পারে? হয়ত তুমি আর আমি সেই ইয়টে পৃথিবী ভ্রমণে বের হবো। নৌকোটার নাম দেবো আমরা মার্গো। নাকি জুলিয়া? স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দাঁতে দাঁত পিষে রাগ জর্জর গলায় টাইলার বলে, আমি তোমায় মাপতে ভুল করেছিলাম। কম হিসেব ধরেছিলাম তোমার বুদ্ধির, তুমি একজন চতুর, ধূর্ত মহিলা। মার্গো হাসে, এটাকে প্রশংসা হিসেবেই নিচ্ছি আমি।

স্থির পলকহীন চোখে বেশ খানিকটা সময় ধরে ওকে জরীপ করে টাইলার। তীব্রতর, প্রায় রুক্ষ হয়ে ওঠা দৃষ্টিতে যেন মার্গোর বুদ্ধির গভীরতা মাপতে চায়। তারপর ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলে, তুমি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমতী, সঙ্গে বাস্তব বিচারবোধ সম্পন্নও কি? মার্গোও একই ভাবে কেটে কেটে বলে, সেটা নির্ভর করে আমার বাস্তব বিচার যুক্তিবোধকে কে কি দাম দেয় তার ওপর। ধরো একলক্ষ ডলার। মার্গোর হৃদস্পন্দনের গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে। এতখানি? না এতটা সত্যি সে আশা করেনি। নিজের উত্তেজনা প্রাণপণে চেপে রাখতে রাখতে, দমন করার চেষ্টা চালাতে চালাতে, নিজেকে স্বাভাবিক

রাখবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে উত্তর দেয়, মন্দ নয়। বেশ তাহলে ঐ কথাই রইল। টাইলার পকেট থেকে একটা চাবির রিঙ বের করে, পরের বিমানেই তুমি শিকাগো ফিরে যাও। এটা আমার শিকাগোর বাড়ীর চাবি। তুমি ঐ বাড়ীতে কয়েক দিন থাকো। দিন কয়েকের মধ্যে আমি শিকাগো আসছি, তোমার টাকা তুমি সে সময়ই হাতে পেয়ে যাবে। একটা দ্বিধার কাটা এ মুহূর্তে মার্গোর মনে খচখচ করতে থাকে। সে কি খুব সস্তা দরে রাজী হয়ে গেল? টাইলারের উদ্বেগহীন নিশ্চিন্ত অভিব্যক্তিই প্রমাণ করে দিচ্ছে মার্গো বোকামী করছে। কিছুটা দরাদরি করে তার আরো কিছুটা দর বাড়ানো উচিত ছিল। চাপ দিয়ে যখন হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছেই টাইলারকে, আরো কিছু বাড়তি অর্থ আদায় করে নেওয়া উচিত ছিল।

এবার আর কোন ভুল করল না টাইলার। নিজে সঙ্গে করে মার্গোকে শিকাগোগামী বিমানে তুলে দিলো। এবং ততক্ষণ অপেক্ষা করল যতক্ষণ না বিমান আকাশে উড়ছে। বাড়ী ফিরে প্রথম কাজ যেটা সে করল, শিকাগোতে কিথ পার্সিকে ফোন করল। হ্যালো টাইলার, তুমি কবে ফিরছ? আমরা প্রধান বিচারপতি হিসেবে তোমার স্বাগত বরণ উৎসবের আয়োজন করব ঠিক করে রেখেছি। টাইলার নিজেকে অনুত্তেজিত, আন্তরিক, স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে করতে বলে, খুব তাড়াতাড়ি আমি ফিরছি। কিথ, তার আগে একটা ঝামেলায় আমি তোমার সাহায্য পেতে পারি? কিথ পার্সি বলে, নিশ্চয়ই। কি ব্যাপার বলল তো? তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মার্গো পসনার নামের এক প্রতারক দাগী ক্রিমিনালকে সংশোধন করার, সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দেবার চেষ্টায় আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার জামিনের ব্যবস্থা করেছিলাম। হা হা মনে পড়েছে। মেয়েটা কি কোন সমস্যা করেছে? টাইলার একটা গভীর শ্বাস ফেলে শব্দ করে, ফোনেও যাতে ওর বিষণ্ণতার রেশ কিথের কাছে পৌঁছায়। মেয়েটা মারাত্মক, আমার পিছু তাড়া করে ও

এখানে এসে পৌঁছেছে। নিজেকে ও আমার বোন বলে দাবী করেছে। আমার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে প্রচুর জিনিসপত্র কেনাকাটি করেছে। আমায় প্রায় সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। আমি প্রতিবাদ করলে, বাধা দিতে গেলে আমায় এবং আমার গোটা পরিবারকে খুন করতে গিয়েছিল। এখন আমার শিকাগোর বাড়ীর চাবি চুরি করে সেখানেই গেছে। জানিনা ওর কি উদ্দেশ্য আছে। কিথ পার্সি ওপাশ থেকে আশ্বাস দেয় তুমি কোন চিন্তা করো না টাইলার। আমরা ওকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করছি অবিলম্বে।

মেয়েটা ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ৩০৭ বি নম্বরের বিমানে রয়েছে, খুব সাবধান কিথ। মেয়েটা কিন্তু মারাত্মক। হিংস্র ধরনের পাগল। গ্রেফতারের পর ওকে রিড মানসিক হাসপাতাল-এ ভর্তি করে দেবে। ওর গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া মাত্রই আমি ফ্যাক্স করে মেয়েটার মানসিক চিকিৎসার আদেশ সই করে তোমায় পাঠিয়ে দেব। আমি চাই বেশ কয়েক মাস ওকে মানসিক চিকিৎসকের অধীনে রিড মানসিক হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করা হোক। ওপাশ থেকে কিথ বলে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো টাইলার। তোমার কথা মতই কাজ হবে। মেয়েটাকে গ্রেফতার করার পরই তোমায় খবর পাঠাব। বিমান বন্দরেই ওকে জালে ফেলা হবে।

সে রাতের খাবার টেবিলে বেনডাল বলে, কি ব্যাপার, জুলিয়াকে দেখছি না? টাইলার খাবারের থালা থেকে মুখ তোলে, ও হ্যাঁ বলতেই ভুলে গেছি। জুলিয়াকে হঠাৎ আচমকা চলে যেতে হয়েছে। ও তোমাদের সবাইকে ওর হয়ে বিদায় জানাবার কথা বলে গিয়েছিল আমায়। ওর এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় ওকে একেবারেই হঠাৎ করে চলে যেতে হয়েছে। কাউকে কিছু জানাবার ফুরসতই করে উঠতে পারেনি। বেনডাল বিস্ময়ের গলায় বলে, কিন্তু উইলটা তো... টাইলার আশ্বাস

দেবার গলায় বলে, চিন্তা করো না। ও আমায় ওর ভাগটা তুলে ওর নামে জমা করে দেবার জন্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নী আর ব্যাঙ্ক অথরিটি লিখে দিয়ে গেছে।

ঘণ্টা কয়েক পরই খবরটা এসে পৌঁছল। বিমান বন্দর থেকেই তুলে নেওয়া হয়েছে মার্গোকে। মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। বিমান বন্দর থেকেই খবরটা পেয়েই সশব্দে হেসে ওঠে সে। লোভী কুত্তীটাকে এখন বাকি জীবন মানসিক হাসপাতালের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে কাটাতে হবে। বেচারি দুঃখী মেয়েটাকে আর খাওয়া পরা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে না। এতক্ষণে, এতক্ষণে সত্যিই খেল খতম। কিস্তিমাত। আহ, বুড়ো ভাম নিশ্চয়ই তার কবরে গড়াগড়ি দিচ্ছে যখন জানছে তার সাধের স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের কর্তৃত্ব মালিকানার দখল নিচ্ছে টাইলার। আনন্দের উচ্ছ্বাস থেকে ওর মনে এক তীব্রতর যৌনবোধ জেগে উঠল। সুটকেসের একেবারে নিচ থেকে একটা পত্রিকা বের করল। সারা দেশের সমকামী ক্লাবগুলোর ঠিকানা দেওয়া রয়েছে এতে। বস্টনের একটা ক্লাব বেছে নিলো সে। আজ রাতে...। শরীরে আচমকা জেগে ওঠা তীব্রতর যৌনবোধ চাহিদা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার।

.

জুলিয়া আর স্যালি দুজনেই কাজে বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। কাল হেনরির সঙ্গে সন্ধ্যেটা কেমন কাটল? স্যালির প্রশ্নে জুলিয়া কাঁধ ঝাঁকায়, ঐ একরকম। তোমাদের বিয়ের ব্যাপারটা পাকাপাকি করছ না কেন? জুলিয়া নত মুখে কি যেন চিন্তা করে। নাহ, আসলে হেনরি বোধহয় আমার মত, আমরা জন্য নয়। স্যালি মাথা নাড়ে, হবে হয়ত। তবে এগুলো নিশ্চিত ভাবেই তোমার জন্য। পাঁচটা খাম এগিয়ে দেয় ও, জুলিয়া একটা

একটা করে খামগুলো খোলে। সব কটাই ধার শোধ করার বিল বা নোটিশ। বেশ কয়েকটা লাল অক্ষরে ওভার ডিউ লেখা। দুটোতে মোটা মোটা অক্ষরে ছাপানোশেষ নোটিশ। অসহায় চোখে স্যালির দিকে তাকিয়ে সে বলে, আমায়...আমায় কিছু ধার দিতে পারো? স্যালি ওর দিকে অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। বিশ্বাস করা সত্যিই কষ্টকর। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের একজনের উত্তরাধিকারী এভাবে জীবন ধারনের মত ক্রীতদাসের মত পরিশ্রম করে? ধার দেনায় জড়িয়ে জর্জরিত হয়ে অসহ্যকর জীবন কাটাতে পারে? একজন গড়পড়তা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক খারাপভাবে বাঁচতে পারে? যখন সে ইচ্ছে করলেই...। জুলিয়া শান্ত গলায় বলে, ভুলে যাও ওসব কথা। আমি তোমায় আগেই বলেছি, লোকটি আমার মায়ের সঙ্গে কি নিষ্ঠুর নিকৃষ্টতর ব্যবহার করেছে। আমার খোঁজও নেয়নি কোনদিন। বাবা হিসেবে যাকে স্বীকারই করি না, যার প্রতি কোনরকম ভালবাসা সহানুভূতিই নেই, তার সম্পত্তি টাকা-পয়সার প্রতি আগ্রহ বা দাবী আমার নেই।

স্যালি কেন যেন কিছুতেই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছিলো না। এক রাজকন্যা, যে জানতই না যে সে একজন সত্যি রাজকন্যা। এবং যখন সে জানল তা, বোকা মেয়েটা তার ফাঁপা গুমোর, অর্থহীন এক অহঙ্কার আঁকড়ে ধরে বসে রয়েছে। নাহ, ব্যাপারটা সত্যিই উচিত হচ্ছে না। সবাই, অন্যেরা যে যার ভাগ বুঝে নেবে শুধু বোকা মেয়েটা...। নাহ, কিছু একটা করা উচিত। মিথ্যে অহংকারের অসুখে ভুগতে থাকা মেয়েটা নিজে যদি কিছু না করে, তবে তাকেই উদ্যোগ নিতে হবে। এবং পরে একদিন বোকা মেয়েটা নিশ্চয়ই এজন্য ধন্যবাদ দেবে তাকে।

সেই সন্ধ্যার দৈনিকপত্রে স্যালি দেখল, খবর রয়েছে, হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের উত্তরাধিকারীরা তাদের পারিবারিক বাড়ী রোজহিলেতে জড়ো হয়েছে তাদের বাবার অন্ত্যোষ্টিতে যোগ দিতে। (এবং অবশ্যই তাদের বিলিয়ন ডলার সম্পত্তির ভাগ বুঝে নিতে)। স্যালি মনে মনে দাঁত কামড়ায়, বোকা মেয়েটা সোনার ডিম পাড়া হাঁসটাকে খুন করতে চলেছে। না, এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। তাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। জুলিয়া এখনো কাজ থেকে ফেরেনি। এই সুযোগেই তাকে কাজ সারতে হবে। কাগজ কমল টেনে নিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসে। জজ টাইলার স্ট্যানফোর্ড, জুলিয়ার বড় দাদাকে উদ্দেশ্য করে।

.

২১.

খেলার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়, সন্ধি সময়ে এসে দাঁড়িয়ে, আবার পুরো ব্যাপারটাকে একেবারে গোড়া থেকে খতিয়ে দেখে। পর্যালোচনা করে টাইলার স্ট্যানফোর্ড। না, এখনো পর্যন্ত কোন গলতি নেই। আলগা নেই কোন সুতো। দিমিত্রি অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েছে এবং জন অরণ্যে মিশে গেছে। মার্গো পসনার, বাকি জীবন ওকে উন্মাদ রোগী হিসেবে মানসিক হাসপাতলে কাটাতে হবে। একমাত্র বাকি রয়েছে একটাই গিঁট, হ্যাল বেকার। তবে ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোন অবকাশই নেই। ওর সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটার খোঁজ–সে পেয়ে গেছে। ওর পরিবার বেকার কখনোই মুখ খুলবে না। পরিবার থেকে দূরে, জেলে গিয়ে ঢুকতে আবার মোটেই চাইবে না সে। আর সে ভালই জানে, পুতুল নাচের সুতো বাঁধা আছে টাইলারের হাতের আঙুলে। বেচাল করলেই.. টাইলারের আঙুলের ইশারায় নাচতে বাধ্য সে। নাহ, ওকে নিয়ে ভয় পাবার

একদমই কোন কারণ নেই। সব কিছু একেবারে ঠিকঠাক, তার পরিকল্পনা মতই ঘটে চলেছে। উইল প্রবেট হয়ে যাওয়ামাত্র সে লিকে নিয়ে সেন্ট ট্রপেজ দ্বীপে পাড়ি জমাবে। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে নিজের বিলাস বহুল চোখ ধাঁধানো প্রমোদতরণীতে। ভেনিস দেখার অনেক দিনের সুপ্ত বাসনা এবার পূর্ণ হবে। পসিটানো...কাপরি...রিও...কেনিয়া সাফারী...তাজমহল...সুইস আলপস এবং এসবের জন্য কাকে ধন্যবাদ দেবে সে? অবশ্যই তার বাবা, প্রিয়তম বাবাকে।

তুমি একটা অপদার্থ টাইলার। চিরজীবনই অপদার্থই থেকে যাবে। আমার ঔরসে যে কি করে তোমার মত একটা কুপমুণ্ডক জন্ম নিলো...। প্রিয়তম বাবা, শেষ হাসিটা কে হাসল। পরিবারের সকলের সঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়া খাচ্ছিল সে। অন্যদের মুখের দিকে গোপন চোখে তাকিয়ে নিয়ে কৌতুকে ভরে ওঠে ওর মন। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ মুখগুলো। এখন ও যদি উঠে দাঁড়ায়, ঘোষণা করে..স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের কর্তৃত্ব মালিকানার দখল নিচ্ছি আমি। আমাদের বাবাকে আমিই খুন করিয়েছি। আমাদের সঙ্গে বোন সাজিয়ে এক প্রতারককে এনে...। চিন্তাটায় ওর পেটের মধ্যে হাসির রোল ওঠে। কথাগুলো শুনলে, এই নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত মুখগুলোর অবস্থা কেমন হবে? আহ, সত্যিই এরকম একটা গোপন খবর যেটা সে নিজের মনে লুকিয়ে রেখেছে, সেরকম কোন খবর লুকিয়ে গোপন রাখার মধ্যে কি এক তীব্র রোমাঞ্চকর আনন্দ আছে, অবর্ণনীয় সে আনন্দ।

দুপুরের খাবার খেয়ে ঘরে ফেরার পর পরিচালক ক্লার্ক ঘরে এলো। আপনার নামে একটা চিঠি আছে। বোধহয় কিথ পার্সির চিঠি। ধন্যবাদ ক্লার্ক। চিঠিটা হাতে নেয়।

কানসাস ডাকঘরের ছাপমারা। অর্থাৎ কিথ পার্সির চিঠি নয়। খামটাকে খুলে সে চিঠিতে চোখ রাখে।

মাননীয় বিচারপতি স্ট্যানফোর্ড, আমার মনে হয়, আপনার জানা উচিত যে আপনার এক সৎ বোন আছে, জুলিয়া। সে আপনার বাবা এবং গভর্নেস নোজমেরী নেলসনের কন্যা। সে কানসাস শহরে বাস করে। তার ঠিকানা-১৪২৫, মেটকালশ এভিনিউ। অ্যাপার্টমেন্ট-৩বি, কানসাস সিটি।
শুভেচ্ছাসহ।
এক জনৈক বন্ধু।

.

টাইলার তড়িতাহতর মত তীব্র বিস্ময়ের চোখে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিষাক্ত কোন মহাসর্প যেন হাতে ধরে রেখেছে। এমন আতঙ্ক ভরা দৃষ্টিতে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। একেবারে কিস্তিমাতের মুখে এসে পাশা উল্টে যাবে। তার চেয়ে বড় কথা, তীব্র বিপদ সঙ্কেতের মত এক বোধ কেন জানিনা তার মনে টিক টিক করে জানাতে থাকে যে এ মেয়েটা প্রতারক বা নকল নয়। কিছুতেই নয়, এ আসল। না, চাপা আর্তনাদের মত শব্দটা তার গলা চিরে বের হয়ে আসে। শেষ মুহূর্তে এসে এভাবে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেতে দিতে পারে না সে। কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এবং খুব তাড়াতাড়ি। নিশ্চিত, ব্যর্থতা সম্ভাবনাহীন কিছু। টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ায় বিচারপতি টাইলার।

.

২২.

ত্বক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, নাহ আপনার রোগটা সত্যিই অদ্ভুত। আগে এরকম কোন কেস আমার নজরে আসেনি। হ্যাল বেকার হাত চুলকোতে চুলকোতে হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তার ভদ্রলোক আরো বলেন, দেখুন শ্রী বেকার, আমার সামনে এখন তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার চুলকানি ছত্রাকজনিত কারণে হতে পারে। এছাড়া অ্যালার্জী হতে পারে। অথবা আর একটি সম্ভাবনা হতে পারে নিউরোডারমা টাইটিস। কথা শেষ করে কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে কি যেন ভাবেন ডাক্তার। তারপর আবার বলেন, আপনার ক্ষত থেকে যে চেঁছে নেওয়া চামড়ার নমুনা মাইক্রোস্কোপের নিচে বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করার পর দেখা যাচ্ছে, এটি ছত্রাক জাতীয় সংক্রমণ নয়। সুতরাং আর দুটো সম্ভাবনা এখন হতে পারে। প্রথমত লিচেন সিমপ্লেক্স ক্রনিক্যাস অথবা হয়ত লোকালাইজড নিউরোডারমা টাইটিস।

বাড়ী ফেরা মাত্র, ওর স্ত্রী হেলেন জানালো, তোমার একটা ফোন এসেছিল। কে একজন মিঃ জোন্স। বলেন খুবই জরুরী। বেকারের হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে। সে কিছু অন্যায় কাজ করেছে। কিন্তু নিজের পরিবারের জন্যে তা করতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু এখন সে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফোনে এখন তাকে যা করতে বলা হচ্ছে, ঠান্ডা মাথায় খুন, যা সে করতে পছন্দ করে না। সে তার অপছন্দ জানায়ও, না, বিচারপতি টাইলার, এ কাজ আমি পারব না। অন্য কাউকে বাছুন আপনি। একটা লম্বা দীর্ঘতর নীরবতা ফোনে ছেয়ে থাকে। তারপর কঠোর গলায় ওপাশ থেকে শোনা যায়, তোমার পরিবারের সবাই কেমন

আছে বেকার? জবাব দেবার আগেই বেকার তার মেরুদণ্ড বেয়ে বয়ে যাওয়া হিম বরফ স্রোতটা টের পায়। সে বোঝে হেরে যাচ্ছে।

.

কানসাস সিটিতে পৌঁছনটা ঘটনাহীন। জজ স্ট্যানফোর্ড তাকে বিস্তারিত ভাবে সব কিছু বলে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বাড়ীটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। মেয়েটার নাম জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড এবং একা থাকে সে। এক বান্ধবীর সঙ্গে। সুতরাং সহজ কাজ।

ঘন্টা খানেক পর একটা জনসাধারণের জন্য ফোনকেন্দ্র থেকে টাইলারকে ফোন করে, হা বিচারপতি টাইলার, আমি কানসাস থেকে বলছি। পাখী উড়ে গেছে। অন্য প্রান্ত থেকে টাইলার বিস্ময়ের গলায় বলে, মানে?

জুলিয়ার রুমমেট বলল, মেয়েটা কোথায় যেন চলে গেছে। রুমমেট মেয়েটিকেও কিছু বলে যায়নি। গতকালই সকালে রুমমেট মেয়েটি ঘুম থেকে উঠে দেখে জুলিয়া নেই। নিজের জিনিষপত্র নিয়ে সে আচমকা কোথাও চলে গেছে।

ফোনের রিসিভারটি নামিয়ে রাখতে রাখতে টাইলারের সারা শরীরে ভূমিকম্প হতে শুরু করে। মেয়েটা নিশ্চয়ই এখানে আসবার উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছে। হে ভগবান! সব কিছু একদম ছবির মত নিখুঁত ভাবে ঘটে চলেছিল। হঠাৎ কোথা থেকে সব দান ওলোট পালোট হয়ে গেল। মেয়েটাকে থামাতেই হবে। নাহলে সে পথে বসবে। এই দ্বিতীয় জুলিয়ার কি ব্যাখ্যা দেবে সে অন্যদের কাছে? কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বের হয়ে আসবেই। স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইসের মালিকানার বদলে দুহাতে হাত কড়া এবং বাকি

জীবন জেলখানা জুটবে তার ভাগ্যে। মেয়েটাকে থামাতেই হবে। সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কিভাবে? উদ্বেগে সারা মুখ কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। হৃৎপিণ্ডের অতি দ্রুততর গতি নিজের কানেই যেন ধরা পড়ে। খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কিভাবে? এই চিন্তায় সে যখন উন্মত্ত প্রায় হয়ে উঠেছে, তখনি ক্লার্ক ঘরে ঢোকে। টাইলার প্রশ্ন করে, কি হয়েছে? ক্লার্ককে বিমূঢ় সংশয়গ্রস্ত দেখায়। জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

.

২৩.

ওর মত পালটানোর জন্য বেনডালই দায়ী। একদিন সে একটা পোষাকের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। দোকানের বাইরের কাছে জানালার ভেতরে একটা দুর্দান্ত ঝলমলে পোষাক ঝুলছিল। ডিজাইনার হিসেবে পোষাকটায় বেনডালের নাম লাগানো ছিল। পোষাকটার দিকে তাকিয়ে জুলিয়া মনে মনে ভাবে আমার বোন কত সফল মানুষ। এবং সে মুহূর্তে নিজের মনে একটা তীব্র ওলোট-পালোট টের পায় সে। নিজের ভেতর আবেগের স্রোত তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। বাবা আমার মায়ের সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে, অথবা আমায় কেন মেয়ে হিসেবে মেনে নেয়নি, খোঁজ নেয়নি, তার জন্য আমার সৎ ভাইবোনদের দোষ দিতে অথবা দায়ী করতে পারি না। ওরা হয়ত আমায় ভালভাবেই গ্রহণ করবে। হয়ত ওরা আমারই জন্য অপেক্ষা করছে। হঠাৎ, হঠাত্র নিজের কোনদিন না দেখা ভাই বোনদের সঙ্গে দেখা করার, মিলিত হবার দুর্নিবার, অপ্রতিরোধ্য বাসনা–ইচ্ছে অনুভব করতে থাকে, যা প্রায় তাড়নার মত।

সেদিন, যখন সে বাড়ী ফিরল, স্যালি তখনো ফেরেনি। সে দ্রুত নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়। স্যালি সকালে তাকে দেখতে না পেয়ে হয়ত অবাক হবে। কিন্তু কিছু করার নেই। স্যালিকে জানানোর জন্য দেরী করতে পারবে না সে। ততক্ষণে যদি তার এই আকাঙ্খ তাড়না আবার মরে যায়? এই যে অপ্রতিরোধ্য দুর্বলতা জন্মেছে তার মনে নিজের ভাই বোনদের দেখার জন্য, তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য, সেটা যদি নিস্তেজ হয়ে পড়ে? নাহ, সে সময় নষ্ট বা দেরী করতে পারবে না, সে রাতেই রওনা হয়ে পড়তে হবে তাকে। জুলিয়া তাই দেরী করেনি।

.

২৪.

টাইলার অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে ক্লার্কের দিকে তাকিয়ে থাকে। জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড...মানে কি? নিজের গল্পটা ওর নিজের কাছেই অপ্রকৃতিস্থ শোনায়। পরিচারকটি এ রহস্যের উত্তর কি করে জানবে? সে হতচকিত স্তম্ভিত প্রায় মুখে টাইলারের দিকেই তাকিয়ে থাকে এবং যোগ করে, ইনি কিন্তু আগের, যিনি এত দিন থেকে গেলেন সেই একই মিস স্ট্যানফোর্ড নন। জোর করে, হাসি ফুটিয়ে তোলা মুখে টাইলার বলে, নিশ্চিত ভাবেই নয়। তা হবেই বা কি করে। নিশ্চয়ই এ কোন জালিয়াত। ক্লার্ক বিস্মিত মুখে বলে, জালিয়াত! তাহলে কি পুলিশে খবর দেবো স্যার? সর্বনাশ। বলছে কি? টাইলার তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না, না, আমিই ব্যাপারটা সামলে নিতে পারব। এত বিলিয়ন ডলার সম্পত্তির গন্ধে গন্ধে এরকম দু-চারটে উটকো ঝামেলা তো এসে হাজির হবেই। কতবার

এ নিয়ে তুমি পুলিশকে বিরক্ত করবে? তুমি বরং মেয়েটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ক্লার্ক বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। টাইলার কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মোছে। কেলেঙ্কারীর একশেষ। ওর মনে ঝড়ের মত উখাল পাথাল ঘটতে থাকে চিন্তার ঢেউ। আসল জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড তাহলে দেখা দিলো? তবু ভালো এ মুহূর্তে অন্য ভাই বোনেদের কেউ একজনও বাড়ীতে নেই। এই ভগবানপ্রদত্ত অভাবিত সুযোগটাকে পুরোপুরি সদ্ব্যাবহার করতে হবে। কিছু একটা করতে হবে, এবং তা অতি দ্রুত।

ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় মেয়েটি, প্রথমেই তার চোখ চলে যায় ঘরের ডান দেওয়ালে ঝুলন্ত হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের বিশাল তৈলচিত্রের দিকে। ছবিটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে, এক মনে খুঁটিয়ে দেখার পর সে ফেরে। টাইলারের দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যালো, আপনি টাইলার? মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সে ফিরতি প্রশ্ন করে, কিন্তু আপনি কে? নিমেষে মেয়েটির মুখের হাসিটা ফিকে হয়ে আসে, আমাকে...? আমি জুলিয়া...স্ট্যানফোর্ড। এ ব্যাপারটা প্রমাণ করার মত কোন তথ্য আছে আপনার কাছে?

প্রমাণ? না...হয়ত সেভাবে কিছু...আসলে এসবের দরকার হবে... টাইলার মেয়েটির কাছে সরে গিয়ে দাঁড়ায়, কেন এসেছেন আপনি? আমার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে, আমার ভাই-বোনদের দেখতে। হঠাৎ করে? ছাব্বিশ বছর পর? মেয়েটি দৃঢ় গলায় বলে, হা। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে টাইলারের মনে আর কোন প্রশ্ন থাকে না। মেয়েটি নিশ্চিত ভাবেই আসল জুলিয়া। ভয়ঙ্কর। বিপজ্জনক। এর খুব তাড়াতাড়ি কোন একটা ব্যবস্থা করতে হবে। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বলে, এভাবে হঠাৎ করে, প্রায় শূন্য থেকে আপনার এই এসে পড়াটা, আমার পক্ষে যে কতটা অবাক করা, হতচকিত করে দেবার মত...।

জানি, দুঃখিত, আমার বোধহয় একটা ফোন করে আসা উচিত ছিলো। টাইলার খুব নির্বিকার গলায় সাধারণ প্রশ্ন করার মত জানতে চায়, এখানে আপনি কি একা এসেছেন? হ্যাঁ। আপনি বস্টন আসছেন কেউ জানে আর? না, সেভাবে কেউ নয়। শুধু আমার রুমমেট স্যালি, কানসাস সিটিতে।

এরপর কোন হোটেলে মেয়েটি উঠেছে তা জেনে নেয়। কপলে স্কোয়ার হোটেল, ঘর নম্বর–৪১৯। ঠিক আছে জুলিয়া, তুমি এখন হোটেলে ফিরে যাও, পরিবারের অন্যদের তোমার কথা জানাবো আমি। তারপর তোমায় ডেকে পাঠাব। এত বছর পর আমাদের আরো এক বোনকে পেয়ে ওরাও নিশ্চয়ই আমার মত খুশি হবে। আবেগে যেন গলা বুজে আসে টাইলারের।

হোটেলে ফিরেও বারবার স্যালির কথাটা ঘুরে ফিরে মনে হতে থাকে জুলিয়ার। ছুরি হাতে আততায়ী? ওকে খুন করতে এসেছিল? জুলিয়ার খোঁজ কেন করবে কোন আততায়ী? ছদ্ম পরিচয় দিয়ে একজন ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল...স্যালিকে জুলিয়া ভেবে...তার হাতে ছুরি ছিল...শেষ মুহূর্তে স্যালি জুলিয়া নয় বুঝতে পেরে,..জলের গ্লাস নিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই লোকটার হাতের ছুরিটা স্যালি দেখতে পায়। জুলিয়া ভেবে কোন কুল কিনারা পায় না। স্যালির কল্পনা এত দীর্ঘতর হবে? এবং কল্পনা আজগুবি ভাবনা কখনো এত নিখুঁত। ছবির মত স্পষ্ট যুক্তিসম্মত হতে পারে? কিন্তু কে এবং কেন? জুলিয়ার মত এক অতি সাধারণ মেয়েকে খুন করতে কে চাইবে? তবে কি? হঠাৎ বিশাল বিত্তশালী স্ট্যানফোর্ড পরিবারের সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠায়, ঐ আততায়ীর আগমন? জুলিয়াকে খুনের চেষ্টার সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত? স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের উত্তরাধিকারী

হিসেবে, স্ট্যানফোর্ড পরিবারের সদস্য হিসেবে কেউ কি জুলিয়াকে মেনে নিতে চায় না? মেনে নিতে পারছে না?

.

হ্যাল বেকার সবে ফিরেছে হোটেলের ঘরে। ফোনটা শব্দ করে সক্রিয় হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দেয়। হ্যালো, সাড়া দিতেই অন্যপ্রান্ত থেকে ভেসে আসে, হাল? আমি দুঃখিত বিচারক। না এখনো দেবার মত কোন খবর নেই। হাঁদারাম, ও এখানে, বস্টনে। কি? বেকারের বিস্ময় ভরা স্বরটাকে আর্ত চিৎকারের মত শোনায়। শোনো, মেয়েটা কপলে স্কোয়ার হোটেলের ৪১৯ নম্বর ঘরে উঠেছে। আশা করি কি করতে হবে... ইচ্ছে করেই কথা শেষ না করে থেমে যায়। আমি বুঝেছি স্যার। শোনো, আজ রাতেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবে। একটা কথা মাথায় রেখো, বার বার ব্যর্থদের আমি ক্ষমা করি না। টেলিফোনের অন্য প্রান্তে বেকারের ঢোক গেলার শব্দ শুনতে পায় টাইলার, ইয়ে...মানে...গতবার...। তাড়াতাড়ি, কাজটা সারো। দড়াম করে ফোনটা রেখে দেয় টাইলার।

জুলিয়া রাতের খাবার খেতে রিইজ কার্লটন হোটেলে গিয়েছিল। সত্যি অসাধারণ সুন্দর হোটেল। মায়ের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে দৃশ্য। প্রতি রবিবার বাচ্চাদের নিয়ে আমি ঐ হোটেলে খেতে যেতাম। খাবার ঘরে বসে জুলিয়া যেন স্পষ্ট দেখতে পায় দৃশ্যটা। একটা টেবিল ঘিরে চেয়ারগুলোয় বসে মায়ের সাথে ছোট্ট টাইলার, উডি, বেনডাল। কত বছর ধরে মনে মনে খুব গোপনে সযত্নে যে ইচ্ছেটাকে সে লালিত করে এসেছে, আজ তা সত্যি হতে চলেছে, নিজের ভাইবোনদের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে সে। আজ সকালে টাইলারের সঙ্গে সাক্ষাৎটা মনে পড়ে। বড্ড বেশি শীতল আবেগহীন

ছিল যেন টাইলার। হয়ত সেটাই স্বাভাবিক। হঠাৎ করে আকাশ থেকে টুপ করে খসে পড়ার মত যার সঙ্গে দেখা হয়, নিজের বোন বলে তাকে মেনে নিতে একটু অসুবিধা হবার, একটু সময় লাগার কথাই। রাতের খাওয়া শেষ করে দাম মিটিয়ে বাইরে বের হয়েই সামনে একটা ট্যুর বাস দেখতে পায় সে। বাসটা ছাড়ব ছাড়ব করছে। কি এক খেয়ালে একটা টিকিট কিনে সে বাসটায় উঠে পড়ে। ফিরে যাবার আগে যতটা পারে শহরটাকে দেখে নিতে চায় সে। মায়ের শহরকে।

মধ্যরাত পেরিয়ে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর কপলে স্কোয়ার হোটেলের ৪১৯ নম্বর ঘরের মাঝখানে অন্ধকারে হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল হ্যাল বেকারকে। হোটেলের ঘর, স্নানঘর সব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে সে। অথচ মেয়েটা কোথাও নেই।

ভোররাতের দিকে, হালকা একটা পায়ের শব্দ পায় বেকার। টানটান হয়ে ওঠে ওর অপেক্ষায় থাকা সারা শরীরটা। ছিটকে উঠেছিল ছেঁড়া ধনুকের মত, পকেট থেকে ছুরিটা বের করে তৈরি হয়ে দাঁড়ায়। দরজা খুলে যায়। জুলিয়া ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেকার। হাতের ছুরিটা মাথার ওপরে হাতসহ তুলে আঘাতে প্রস্তুত হয়। ঠিক তখনি আলো জ্বলে ওঠে। বেকার শোনে জুলিয়া বলছে, এবার আপনারা আসুন। হতবাক বেকারের স্তম্ভিত চোখের সামনে দিয়ে ঘরে ঢুকে আসে দলে দলে রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারের ঝক।

.

২৫.

গর্ডন ওয়েলমান, কপলে স্কোয়ার হোটেলের রাতের শিফটের ম্যানেজারের জন্যই জুলিয়ার প্রাণটা বেঁচে গেল। সন্ধ্যে ছটা নাগাদ তিনি হোটেলের দায়িত্ব বুঝে নেন। নিয়ম মত রেজিস্টার দেখতে গিয়ে তার চোখ আটকে যায় জুলিয়া স্ট্যানফোর্ডের নামে। উত্তেজনায় থমকে যায় ওয়েলমান। হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের মৃত্যুর পর থেকেই খবরের কাগজগুলোতে ওর সম্পর্কে রোজই নানারকম লেখা পড়ছে। গোটা পরিবার সম্পর্কেই নিত্যনতুন তথ্য, মুখরোচক গল্পও জানতে পারা যাচ্ছে। গভর্নেসের সঙ্গে হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের স্ক্যান্ডাল, অবৈধ সন্তান, তার নাম জুলিয়া সব জানত, পড়েছে ওয়েলমান। সেই জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড তাদের এই ছোট্ট হোটেলে। এর মানে কি বিশাল প্রচার, তা কি হোটেল কর্তৃপক্ষ জানে? মিনিট কয়েক পর থেকে সে ফোন করতে শুরু করে। নানা সংবাদপত্র টিভি চ্যানেলের অফিসে।

জুলিয়া যখন হোটেলে ফেরে দেখে, লবি ভরা সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, ক্যামেরাম্যান। মিস স্ট্যানফোর্ড আমি বোস্টন জার্নাল পত্রিকা থেকে...টেলিভিশন ক্যামেরাগুলোর একটা তার মুখের ওপর স্থির হয়। মুখের সামনে একটা মাইক্রোফোন, ম্যাডাম আমি এন সি ভি বি টি ভি তে একটা সাক্ষাৎকার চাইছি। ম্যাডাম, আমি বোস্টন গ্লোব দৈনিক পত্রিকা থেকে আসছি। আমরা শুনেছিলাম আপনি নাকি শহর থেকে... ব্যাপার স্যাপার দেখে জুলিয়া রীতিমত হকচকিয়ে যায়। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ক্রমাগত ঝলসে উঠছে ওকে তাক করে। নানা প্রশ্ন, টিভি ক্যামেরার স্পষ্ট আলো, রীতিমত বিশৃঙ্খলা, হট্টগোলে ভরা এক বিপর্যস্ত পরিস্থিতি। দ্রুত পায়ে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যায় সে। পেছনে পেছনে প্রায় তাড়া করে আসে সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান, ফটোগ্রাফারের দল। চারতলায় নিজের ঘর পর্যন্ত ওকে তাড়া করে আসে ওরা। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জুলিয়া হাল ছেড়ে দেয়। দরজা খুলে আলো জ্বালে। তারপর বলে, এবার আপনারা আসুন।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বেকারের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে, ঘাম জমে ওঠে কপালে। দ্রুত হাত নামিয়ে ছুরিটাকে পকেটে পুরে ফেলে সে। জুলিয়া ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর সমবেত জটলাটার দিকে ফিরে তাকিয়ে। বলে,– ঠিক আছে, বলুন কি জানবার আছে আপনাদের? তবে একজন একজন করে, একসঙ্গে সবাই নয়। ভীড়ের পিছনে আড়ালে পড়ে যাওয়া বেকার প্রবলতর হতাশায় ক্ষোভে মাটিতে পা ঠোকে। বিরক্তিতে গজগজ করতে করতেই দরজা দিয়ে চট করে বের হয়ে যায়। বিচারক টাইলার মোটেই খুশি হবেন না। তাকে কি জবাব দেবে সে? এবং তাতে তার প্রতিক্রিয়া কতখানি কঠোর হবে ভেবেই ওর হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে।

.

পরের দিন সকালের খবরের কাগজগুলোর সবকটার সচিত্র প্রতিবেদনে ছয়লাপ হয়ে থাকে জুলিয়া আর জুলিয়া। টেলিভিশন চ্যানেলের খবরেও একই ব্যাপার। টাইলার খবরের কাগজগুলো, টেলিভিশন দেখতে দেখতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। সারা পরিবারই এখন জেনে গেছে গতকাল রাতে এই মেয়েটা তাদের বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিল। আমি বুঝতে পারছি না এরকম একজন জালিয়াত কি করে ও নিজেকে জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড বলে দাবী করছে? আর তুমি কাল ওকে হাতে পেয়ে কি করে ছেড়ে দিলে? টাইলার বিব্রত গলায় বলে, কাল সে এসেছিল। নিজেকে জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড দাবী করে কিছু টাকা-পয়সা চাইছিলো। আমি ওকে ভাগিয়ে দিয়েছি। ও যে এরকম একটা সস্তা পাবলিসিটি স্ট্যান্ট এর খেলায় যাবে তা আমি বুঝিনি। যাক তোমরা ওসব নিয়ে চিন্তা করো না। ব্যাপারটা আমি ঠিক সামলে নেবো। ভাইবোনেরা সরে যেতেই ফাঁক বুঝে

সোজা সাইমন ফিজেরালন্ডকে ফোন করে। সকালের কাগজ দেখছেন তো? হ্যাঁ, আরো একজন জুলিয়া স্ট্যানফোর্ডের উদ্ভব হয়েছে। হ্যাঁ, এই নকল জুলিয়াকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আমি কি পুলিশে খবর দেবো? না, তাতে একপ্রস্থ অবাঞ্ছিত মিডিয়া স্ক্যান্ডাল ছড়াবে। আমরা সেটা চাই না। আপনি ওকে অন্যভাবে সামলান, ওকে শহরের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

ফিৎজেরাল্ড উত্তর দেয়, ঠিক আছে স্যার, আমি দেখছি। ফোন ছেড়ে সাইমন ফিজেরাল্ড স্টিভ সোলানের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, সমস্যা। গভীর সমস্যা। সোলানে সায় দেয়, জানি। সকালের কাগজে পড়েছি। স্ট্যানফোর্ড চান ব্যাপারটা আমরা দেখি। তুমি কি দায়িত্বটা নিতে পারবে? সানন্দে! স্টিভ চিন্তিত মুখে বলে।

ঘণ্টাখানেক বাদে স্টিভ সোলানকে জুলিয়ার হোটেলের ঘরের দরজায় দেখা গেল। দরজা খুলে তাকে দেখেই ভ্রু কুঁচকে জুলিয়া বলে, দুঃখিত। আমি আর কোন পত্রিকাতে সাক্ষাৎকার দেবো না। সোলানে মাথা নাড়ে, নাহ ম্যাডাম, আমি সাংবাদিক নই। সাক্ষাৎকারের জন্যও আসিনি। বিস্মিত চোখে জুলিয়া প্রশ্ন করে, তবে? কে আপনি? কি চান? ভেতরে আসতে পারি? সন্দিগ্ধ চোখে দরজা ছেড়ে দাঁড়ায় জুলিয়া, স্টিভকে ঢুকতে দেয়। যদিও ওর অভিব্যক্তি জুড়ে সংশয়মেশা কৌতূহল ছড়িয়ে থাকে। আমি স্টিভ সোলানে। প্রয়াত হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের জমি সম্পত্তি বিষয়ক আইনজীবী। জুলিয়া মাথা নাড়ে, ওহ, তা আপনি আমার কাছে কি চান? স্টিভ তীব্র চোখে তাকায়। আপনি কেন সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেছেন, যে আপনি জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড? বিব্রত মুখে তাকিয়ে, সারা মুখে ফুটে ওঠে অস্বস্তি। জুলিয়া বলে, ইয়ে...মানে হঠাৎ করে এমন...ধরা পড়ে গেলাম...বিশ্বাস করুন আমি নিজে থেকে প্রেসের কাছে যাইনি। ওদের কিছু জানাতেও

চাইনি। বলতে চাইনি। কিন্তু আপনি তো নিজেকে হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের মেয়ে বলে দাবী করছেন? জুলিয়া আরক্ত মুখে বলে, দাবী করছি মানে কি! আমি সত্যিই। নিশ্চিত ভাবেই তাই। এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ আপনার কাছে আছে? ওর মিথ্যের পেরেক দিয়েই ওকে বিদ্ধ করতে চায় সোলানে। প্রমাণ? জুলিয়া সামান্য ইতস্তত করে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, না, সেরকম কিছু সত্যিই নেই আমার কাছে। স্টিভ আণুবীক্ষনিক দৃষ্টিতে মেয়েটিকে যাচাই ও জরীপ করতে থাকে। যতই খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সে অবাক হয়। এখানে আসার আগে যেরকমটা আন্দাজ করে এসেছিল মেয়েটি আদৌও সেরকম নয়। মেয়েটিকে দেখে সরল স্পষ্টভাষী। বিদ্বেষহীন বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের মনে হচ্ছে। এবং বুদ্ধিমতী। এরকম চলে আসার মত অবিবেচক হঠকারী এবং চুড়ান্ত বুদ্ধিহীনতার কাজ করতে পারে।

স্টিভ কেশে গলা পরিষ্কার করে নেবার তালে নিজের বক্তব্যকে গুছিয়ে নেয়। সেক্ষেত্রে অত্যন্ত দুঃখের কথা। জজ টাইলারের নির্দেশ বা ইচ্ছে, আপনাকে এখনি এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। এভাবে পারিবারিক কুৎসা, বদনামের প্রচার তারা মেনে নেবেন না। জুলিয়া বিস্ফারিত চোখে বলে, সেকি? তাহলে যে জন্য এতদূর থেকে এতটা পথ অতিক্রম করে এলাম আমার ভাইবোনদের সঙ্গে দেখা করতে, তাদের কাউকেই তো এখনো দেখতেই পেলাম না। তাহলে এই মিথ্যচার মেয়েটি চালিয়েই যেতে চায়? চালিয়েই যাবে? স্টিভ তার পরের চালটা দেয়, দেখুন, আপনি ঠিক কে আমি জানি না। তবে আপনি যে খেলাটা চালাতে চাইছেন সেটা কিন্তু শেষ হচ্ছে জেলের কুঠুরীতে গিয়ে। আমরা আপনাকে একটা সুযোগ দিতে চাইছি। আপনি যা করছেন, সেটা সরাসরি আইন বিরুদ্ধ কাজ। এবার বেছে নিন, আপনি কি চান। হয় এই শহর ছেড়ে চলে যান। নাহলে আমরা আপনাকে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।

জুলিয়া বিদ্যুতাহতের মতো বলে, গ্রেপ্তার? কি বলছেন আপনি? সোলানে ব্যক্তিত্ব ব্যাঙ্গক গলায় বলে, পছন্দটা আপনার হাতে। জুলিয়া বিষণ্ণ গলায় বলে, ওরা একবার আমাকে দেখতেও চায় না? এবার কোন জবাব সোলানের কাছে নেই, তাই নীরবতাকেই শ্রেয় মনে করে সে। জুলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, একরাশ বিষণ্ণতা মেশা হতাশা ঝরে পড়ে ওর উচ্চারণে, বেশ, আমার ভাই-বোনদের যদি তাই ইচ্ছে হয়, তাহলে আমি কানসাসে ফিরে যাচ্ছি। আমি কথা দিচ্ছি আর কোনদিন ওদের বিরক্ত করব না। কানসাস? এতদূর মেয়েটা ছুটে এসেছে এই প্রতারণা কেলেঙ্কারী ঘটাতে? স্টিভ চমকিত হয়।

.

সেদিনই, শেষ বিকেলে সাইমন ফিজেরাল্ডের অফিসে মুখোমুখি বসেছিল স্টিভ আর সাইমন। আমার একটা ব্যাপার ক্রমাগত কাঁটার মত খোঁচা দিয়ে চলেছে, সোলানে বলে। ফিজেরাল্ড ভুরু কুঁচকে তাকায়, সেটা কি? কুকুরটা কেন ডাকল না? সাইমন বিস্ময়ে বিষম খাওয়া গলায় বলে, মানে? কি বলছ কি? সোলানে হাসে, শার্লক হোমসের গল্পে। কুট ছিল যা ঘটেনি। স্টিভ কোথাকার জল কোথায় নিয়ে গড়াচ্ছো? কথা হচ্ছিল জালিয়াত মেয়েটার...। মেয়েটা এখানে এসেছিল কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই? স্টিভ সাইমনকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে। ধাঁধাগ্রস্ত মুখে সাইমন ফিৎজেরাল্ড বলে, আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। ওটাতেই তুমি বুঝেছ প্রমাণ পেয়েছ মেয়েটা প্রতারক। গোপনে গভীর চিন্তার ভাঁজময় কপালসহ মাথা নাড়ে। ঠিক উলটো। কেন মেয়েটা কানসাস সিটি থেকে এত দুর কয়েক হাজার মাইল পথ কোন প্রমাণ তথ্য সঙ্গে না নিয়েই নিজেকে হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের মেয়ে বলে দাবী করতে চলে এলো, কেন?

মেয়েটিকে দেখে এতটা নির্বোধ বলে তো মনে হয় না। এবার ভুরু কুচকে যাবার পালা সাইমনের, ঠিকই তো। এদিকটা তো আমি ভেবে দেখিনি। কথা শেষ করে দু চোখ বুজে কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে থাকে। তার পর সাইমন । আবার বলতে শুরু করে, প্রথম থেকেই বেশ কয়েকটা ব্যাপার আমার কাছে দুর্বোধ্য। সত্যি বলতে কি রহস্যময়ই বলব, মনে হচ্ছে। স্টিভ সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, ঠিক, আমারও তাই। প্রথমতঃ হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের মৃতদেহ। ওটা উধাও হয়ে গেল। কবর থেকে কফিনবন্দী মৃতদেহ কোথায় উধাও হয়ে গেল সে রহস্যের এখনো কোন কিনারা হল না। মৃতদেহটা কার এত দরকার হয়ে উঠল? তারপর স্ট্যানফোর্ডের মৃত্যুর ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ওনার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দিমিত্রি কামিনস্কি। সে অস্ট্রেলিয়ায় কোন ঠিকানাহীন গন্তব্যে উধাও হয়ে গেল। এবং তাতেও শেষ নয়। যাকে আসলে জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড বলা হচ্ছে, সেই প্রথম মেয়েটি, সে হঠাৎ করে কোথায় উধাও হয়ে গেল? সে এখন কোথায়? কেউ জানে না। এসব হচ্ছেটা কি?

সাইমন গভীর চিন্তান্বিত মুখে সন্দিগ্ধ গলায় বলে, তুমি কি ভাবছ? স্টিভ কপালের চিন্তার না। মেলানো ভাজসহ মাথাটা দ্রুত তালে কয়েকবার দুপাশে নাড়ায়, না সাইমন, ব্যাপারটা আমরা যত সহজ ভেবেছিলাম তা আদৌও নয়। কোথায় নিশ্চয়ই জল উঁচু নিচু আছে। সেই সুতোর আলগা মুখটা আমায় খুঁজে পেতেই হবে। তাহলেই রহস্যের জট পর্যন্ত পৌঁছতে পারার কাজটা সহজ হবে আমাদের পক্ষে।

স্টিভ সোলানে পরদিন একটু বেলার দিকে আবার কপলে স্কোয়ার হোটেলে হাজির হলেন। অভ্যর্থনা টেবিলে বসে থাকা কর্মীটিকে সে বলে, আমি জুলিয়া স্ট্যানফোর্ডের সঙ্গে ...ওকে কথা শেষ করতে না দিয়েই কর্মীটি মাথা নাড়ে, দুঃখিত, আজ সকালেই

উনি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। উনি কি ওনার কোন ঠিকানা দিয়েছেন? রেখে গেছেন? না স্যার। স্টিভ হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে। তার আর কিছুই করার নেই। যাক, হয়ত আমিই ভুল করছিলাম। দার্শনিক ভাবে ব্যাপারটাকে ভাবতে চায়। হয়ত সত্যিই জালিয়াতই ছিল মেয়েটা। কোনটা সত্যি, কি সত্যি, যা আর কোনদিনই জানা যাবে না। হোটেলের দরজা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই সামান্য বকশিসের প্রত্যাশায় দাবোয়ানটি বলে, আপনাকে ট্যাক্সী ধরে দেব স্যার? লোকটার দিকে চোখ পড়তেই, স্টিভের মাথায় একটা সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সকালে, মিস স্ট্যানফোর্ড যখন হোটেল ছেড়ে যান। তখন তুমিই কি ডিউটিতে ছিলে? সে প্রশ্ন করে। উত্তরে দারোয়ানটি বিনীতভাবে বলে, হ্যাঁ স্যার, আমিই তো ওনাকে ট্যাক্সি ধরে দিলাম। আমার খুবই অবাক লেগেছিল। এত বড়লোকের মেয়ে অথচ ট্যাক্সী... স্টিভ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, মিস স্ট্যানফোর্ড ট্যাক্সী চালককে গন্তব্যের জায়গার নাম কি বলেছিলেন শুনতে পেরেছিলে? হ্যাঁ স্যার। উনি গ্রেহাউন্ড বাস টার্মিনাসে যাবার জন্য বলেছিলেন চালককে। ধন্যবাদ। স্টিভ দারোয়ানের হাতে একটা পাঁচ ডলারের নোট খুঁজে দিয়ে বলে, আমাকে একটা ট্যাক্সী ধরে দাও, জলদি।

এর কিছুক্ষণ পরই গ্রেহাউন্ড বাস টার্মিনাসে দূর পাল্লার বাস ছাড়ার চত্বরে স্টিভকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। অপেক্ষমান যাত্রীদের ভীড়ে সে দ্রুত ত্বরিত নজর বুলিয়ে যাচ্ছিল। সকালে বলতে নিশ্চয়ই ভোর রাতে হোটেল ছাড়েনি জুলিয়া? তাহলে, সে পৌঁছাবার এক দেড় ঘন্টার মধ্যে ও যদি হোটেল ছেড়ে বের হয়...।

ভাবতে ভাবতে, স্টিভ শুনতে পায় কানসাস সিটির বাস ১৬ নম্বর টারমিনাস... আর কিছু শোনার প্রয়োজন বোধ করে না সে। প্রায় চোখ নাক কান বুঝে, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে।

জুলিয়াকে পেয়ে যায়, সে বাসে উঠতে যাচ্ছিল। দাঁড়ান, ডাক শুনে সে ফিরে তাকায়, অবাক ভঙ্গীতে তাকিয়েই থাকে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। জুলিয়া কঠোর চোখে তাকায়, রাগী গলায় বলে,–আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা বলার নেই। সে ঘুরে দাঁড়ায়, বাসে উঠতে শুরু করে, স্টিভ দ্রুত ওর একটা হাত চেপে ধরে, এক মিনিট, সত্যি বলছি, আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে, যা আপনার পক্ষেই যাবে। আমার বাস ছেড়ে যাচ্ছে। পরে আরও বাস আপনি পাবেন, পেতে পারেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে কথা হওয়াটা অনেক বেশি জরুরী। জুলিয়া বাসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই কি যেন ভাবে বেশ খানিকটা সময় নিয়ে। তারপর, যেন একটা সিদ্ধান্ত নেয়। সোলানের দিকে ফিরে বলে, আমার সুটকেস বাসের ভেতরে রয়েছে। সোলানে তাড়াতাড়ি সুটকেসটা নামিয়ে আনে। ওরা দুজন বাস টার্মিনাসের বাইরের দরজার দিকে হাঁটতে থাকে। ওরা একটা রেস্তোরাঁয় এসে বসে। জুলিয়ার অভিব্যক্তি ভঙ্গীতে এখনো তীব্র রাগের প্রকাশ। উলটো দিকের চেয়ারে সোলানের মুখোমুখি বসে। স্টিভ প্রাতরাশের অর্ডার দেয় বেয়ারাকে। তারপর জুলিয়ার দিকে ফিরে বলে, একটা অঙ্ক বা ধাঁধার উত্তর আমার কাছে কিছুতেই মিলছে না। আপনি কেন, কিভাবে, কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই নিজেকে জুলিয়া হিসেবে দাবী করে এত দূর চলে এলেন? আপনি কি করে, কিভাবে ভাবলেন কয়েকশো বিলিয়ন ডলারের মালিকানার উত্তরাধিকার, আপনার পরিচয়ের কোন প্রমাণপত্র ছাড়াই মেনে নিতে রাজী হবে স্ট্যানফোর্ড পরিবার? জুলিয়া সোজা স্পষ্ট চোখে তাকায়, দেখুন, একটা ব্যাপার আপনারা সবাই গোড়া থেকেই ভুল করছেন। আমি কোন দাবী প্রতিষ্ঠা করতে, সম্পত্তির মালিকানার দাবী নিয়ে আসিনি। বহু বছর পর, জীবনে প্রথমবার নিজের ভাইবোনদের দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। শুধুমাত্র ওদের দেখবার তীব্র বাসনা নিয়েই এতটা পথ ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু ওরা কেউ তো আমার সঙ্গে দেখাই করতে চাইল না। স্টিভ স্থির

চোখে ওর প্রতিটি কথা তীব্র মনোযোগ দিয়ে, শুনছিল। এবার সে প্রশ্ন করে, আপনার কাছে কোন তথ্য সূত্র কিছু নেই, যাকে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা যেতে পারে? না, কিছু নয়। মাথা নাড়ে সে। যাই হোক, একজন আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বিশেষভাবে আগ্রহী।

ইনি হলেন সাইমন ফিৎজেরা...আর ইনি, ইয়ে... পরিচয় পর্বের মাঝপথেই হোঁচট খায় স্টিভ। জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড, পরিচয় পর্বটা জুলিয়াই শেষ করে। বলুন ম্যাডাম, সাইমন বললেন। একটা সোফার কোণের দিকে জুলিয়া এমনভাবে বসে যেন যে কোন মুহূর্তে উঠে দাঁড়াতে এবং বেরিয়ে যেতে পারে। ফিৎজেরা যেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ফেলে পরীক্ষা করছে এমন দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখছিল। সেই মার্কামারা ধূসর তারাওয়ালা স্ট্যানফোর্ড চোখ। কিন্তু তাতে কি? ওরকম চোখ তো লাখ লাখ মানুষের আছে। আপনি দাবী করছেন, আপনি রোজমেরী নেলসনের মেয়ে? আমি কিছুই দাবী করছি না, করতে চাই না, আমি রোজমেরীর মেয়েই। আপনার মা এখন কোথায়? বেশ কয়েক বছর হয় তিনি মারা গেছেন। সাইমন দুঃখের ভঙ্গীতে মাথা নাড়েন, ওহ, আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনি কি ওর ব্যাপারে আরো কিছু কথা জানাতে পারেন? নাহ, আমার নতুন করে কিছুই জানানোর প্রয়োজন নেই। আমি কি যেতে পারি? দ্রুত উঠে পড়ে দরজার দিকে এগিয়ে চলে সে। দেখুন মহোদয়া, আমরা কিন্তু আপনাকে সাহায্যই করতে চাই। নিমেষে ঘুরে দাঁড়ায় সে, তার মুখে ফুটে উঠে রাগের আগুন ছটা। তাই? সত্যি? আমার ভাইবোনেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না। আপনারা আমায় পুলিশে দিতে চেয়েছিলেন। আমার ওরকম সাহায্যের প্রয়োজন নেই। নমস্কার। দাঁড়ান। আপনি যা বলছেন, আপনি যদি সত্যি তাই হন তাহলে আপনার কাছে কিছু অদ্ভুত, যা হোক কিছু প্রমাণ তো থাকবেই, থাকা উচিত। আমি আপনাদের আগেই বলেছি। সেরকম কিছু আমি

দেবো না। আমি আর আমার মা যারী স্ট্যানফোর্ডকে আমাদের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। ঠিক আছে ঠিক আছে। আপনার মা দেখতে ঠিক কেমন ছিলেন? সুন্দর। অসাধারণ সুন্দরী। জুলিয়ার গলার স্বর নরম হয়ে ওঠে, ঝকঝকে উত্তেজনার আঁচ লাগা চোখে হঠাৎ সে বলে ওঠে–আমার কাছে মায়ের একটা ছবি আছে।

নিজের গলার সোনার হারের সরু চেন থেকে ঝুলন্ত লকেটটায় দু আঙ্গুলের চাপ দিতেই সেটা মাঝখান থেকে ফাঁক হয়ে যায়। দুভাগে বিভক্ত লকেটটার একদিকে এক ছোট্ট ছবিতে অসাধারণ সুন্দরী এক মহিলা, ঠিক উল্টো দিকটার ছবিটা হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের। লকেটটার পেছনে সোনার খোদাই করা আর এন কে, ভালবাসা সহ, হ্যারী ১৯৬৯। সাইমন। ফিজেরাল্ড বিস্ফারিত চোখে অনেকক্ষণ দীর্ঘ সময় ধরে লকেটটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর আবার যখন তিনি জুলিয়ার দিকে ফিরে তাকান তখন তার মুখের চেহারা বদলে গেছে, গলার স্বরে আত্মবিশ্বাসের গাম্ভীর্য্য। আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তারপর স্টিভের দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি গম্ভীর গলায় বলেন, আসল, সত্যি জুলিয়া স্ট্যান ফোর্ডকে আমরা পেয়ে গেছি।

.

২৬.

বেনডাল পেগির সঙ্গে তার কথোপকথনটা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। পেগির থেতলানো, কালশিটে দাগ লাগা মুখ। বাথরুমের পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। মিথ্যাচার, পরিস্থিতির সঙ্গে আপোষ করার, মেনে নেবার পেগির প্রাণান্তকর চেষ্টা। সব মিলে মিশে

বেনডালের মনে এক তীব্র অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছিল। ওর সাহায্যের প্রয়োজন। প্রচুর সাহায্যের এবং ওর জন্য কিছু করতে হলে, প্রথমেই উডির সঙ্গে কথা বলা দরকার। মূল সমস্যা তো উডিই, এবং হয়ত, হয়ত কেন? নিশ্চিত ভাবেই সাহায্যের প্রয়োজন আসলে উডিরই। যতই হোক, ও আমার ভাই। আমি তো ওর সঙ্গে কথা বলতেই পারি। উডির ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে কেনডাল ডাকল, উডি। কোন সাড়া নেই। আরো দুবার ডাকার পরও কোন উত্তর না পেয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ে সে। কটু মিষ্টি এবং আমন্ড বাদাম পোড়ানো একটা ইষৎ ঝাঝালো গন্ধে ঘরটা ভরা। এবং ঘরে উড়ি নেই। বেনডাল বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। বাথরুমের দরজাটা খোলা হাট করে। উড়ি একটা অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েলেতে হেরোইন গুড়ো গরম করতে ব্যস্ত। বেনডাল এসে দাঁড়ায়। উডি চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে বেনডালকে দেখে মাদকাচ্ছন্ন হাসে, হাই বেনডাল, কেমন আছো বোন? মাদক ছড়ানো পাতটার ওপর ঝুঁকে পড়ে গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে তপ্ত মাদক গুঁড়ো ঘ্রাণসহ নাক দিয়ে টেনে নেয়, উডিবেনডালের বিস্ময় মিশ্রিত চিৎকার অগ্রাহ্য করে মাদক পাতে আরো একটি গভীর শ্বাস টানে। ভগবানের দোহাই উডি, বন্ধ করো এসব। বেনডালের ক্ষিপ্ত উত্তেজিত চিৎকারে সে ফিরে তাকায়, ঘুরে দাঁড়ায়। ওর চোখের পাতায় তীব্রতর মাদকের ঘনিয়ে ওঠা ভয়ঙ্কর ছায়া ছায়া নেশা ঘোর। কি ব্যাপার, কেন? তোমায় এত হতাশ দেখাচ্ছে কেন? আহ, আজকের দিনটা কি সুন্দর। ঝকঝকে, উজ্জ্বল রোদে ভরা এমন সুন্দর একটা দিনে তুমি এত মনমরা কেন বোন? উডি দয়া করে একটু চুপ করে বসবে? আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। উডি মাদকগ্রস্ততায় অপ্রকৃতিস্থ প্রায়। হাসে, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই বোন। বলল, কি তোমার সমস্যা? জান লড়িয়ে দেবে তোমার এই ভাই। তবে টাকা পয়সার কোন সমস্যা নিশ্চয়ই নয়? যতই হোক আমরা এখন স বাই কোটিপতি। তাই না? হা-হা-হা। বেনডাল

তীব্র চোখে তাকিয়ে থাকে। সহানুভূতি, আবেগে ওর মন ভরে ওঠে। উডি, পেগির সাথে আমার কথা হয়েছে। ও আমায় বলেছে কিভাবে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকবার সময় এই সর্বনেশে মাদকের নেশা তোমাকে গ্রাস করেছিল। সর্ব্বনাশ! ও কথা কেন বলছ? আমার জীবনে সবচেয়ে সেরা ঘটনা, সবচেয়ে বড় পাওয়া এটা। না হ হ না, তীব্র গলায় ধমকে ওঠে বেনডাল। তোমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ, ক্ষতি ওটা, তুমি তোমার নিজের জীবনকে এর ফলে কি করছ? তোমার কোন ধারণা আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। জীবনকে উপভোগ করছি আমি। বোন, বেঁচে থাকা তো একেই বলে। হতাশায় চোখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর যাবতীয় উত্তেজনা ঝেড়ে ফেলে নিজেকে শান্ত করে। দৃঢ় গলায় নিশ্চিত ভঙ্গীতে বিচারকের রায় ঘোষণার মত প্রত্যয়ী গলায় বলে, তোমার সাহায্যের প্রয়োজন। খুব তাড়তাড়ি। না, আমি ভাল আছি, খুব ভাল। কোন সাহায্যেরই দরকার নেই আমার। উডি জেদী গলায় বলে। না, তুমি ভাল নেই। উডি, আমার কথা মন দিয়ে শোন। অন্য কিছু নয়, আমরা তোমার জীবন নিয়ে আলোচনা করছি, তোমার জীবন, আর শুধু তোমার একার জীবনই বা বলছি কেন? পেগি, তার কথা কেন ভাবছ না–ভাববে না তুমি? পেগির জীবনটাকে নরকতুল্য বানিয়ে তুলেছ তুমি, শুধুমাত্র মন প্রাণ দিয়ে তোমায় অন্ধভাবে, ভালবাসে বলে এখনো এই নরকযন্ত্রণা সহ্য করে মেনে নিয়েও তোমার সঙ্গে থাকছে সে। এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে একটু থামে। দম নেবার ফাঁকে উডির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। তারপরই আবার বলতে শুরু করে, তুমি শুধু তোমার নিজের জীবনটাকেই নষ্ট, ধ্বংস করছ না, সঙ্গে সঙ্গে পেগির জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছো। উডি, এখনো সময় আছে উডি। খুব বেশি দেরী হয়ে যায়নি। এই ঘাতক সর্বনেশে মাদকের ফাঁদ থেকে বের হয়ে এসো। উডির মুখে ঝুলে থাকা মাদক প্রভাবিত হাসিটা এবার মুছে মিলিয়ে যেতে থাকে। হঠাৎ ওর

মুখটাকে খুব করুণ, বিষণ্ন হতাশ দেখায়। বেনডালের চোখের দিকে চোখ রেখে প্রায় স্বগতোক্তির মত বিড় বিড় করতে শুরু করে, বেনডাল...আমি জানি তুমি ঠিক বলছ...সত্যি, সব সত্যি বলছ... আমিও চাই বিশ্বাস করো, সত্যি বলছি আমিও চাই বন্ধ করতে..অনেক চেষ্টাও করেছি, ভগবানের দিব্যি সত্যি বলছি বিশ্বাস করো...চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। নিশ্চয়ই পারবে তুমি। বেনডাল জোরের সঙ্গে, প্রত্যয় মেশা গলায় বলে, তোমাকে পারতেই হবে। আমি আর পেগি এ লড়াইয়ে তোমার পাশে আছি। এখন বলো তো, তোমায় নিয়মিত এই সর্ব্বনেশে মাদক কোন শয়তান সরবরাহ করে? উডির চোখ এ প্রশ্নে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, হে ভগবান! তুমি তা জানো না? বেনডাল মাথা নাড়ে, না তো। আমি কি করে জানব? উডি ধীর গলায় বলে,

.

২৭.

জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে সাইমন বলেন,–তোমার এখনকার মানসিক অবস্থানটা আমি বুঝতে পারছি। জুলিয়া জিজ্ঞাসু চোখে সাইমন ফিৎজেরাল্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে। সত্যিই পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে ধাঁধার মত লাগছে। আমার ভাইবোনেরা কেন আমার সঙ্গে দেখা করতেই রাজী নয়? এবার সাইমন এবং স্টিভ নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর সাইমন মাথা নেড়ে বললেন,–আমি তোমাকে গোটা পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলছি। সে থামে, একটু ইতস্তত করে, সময় নিয়ে শব্দ বাছে, তারপর বলে–আসলে কিছু দিন আগে স্ট্যানফোর্ড পরিবারে নিজেকে জুলিয়া পরিচয় দিয়ে এক মহিলা হাজির হয়েছিলেন। তিনি নিজের দাবীর স্বপক্ষে বেশ কিছু প্রমাণও

দিয়েছিলেন, এমনকি আসল জুলিয়ার সঙ্গে তার আঙুলের ছাপও নাকি হুবহু মিলে গেছে। জুলিয়া বিস্মিত গলায় প্রায় আর্ত চিৎকার করে ওঠে, সে কি? তা কি করে সম্ভব? আমিই... স্টিভ মাথা নাড়ে, জানি, এখন আমরা তা জানি। কিন্তু তখন আমাদের সামনে যে সত্যটা হাজির করা হয়েছিল, সেটাকেই সত্য বলে মেনে নেওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল, তাই নয় কি? সাইমন যোগ করে, স্ট্যানফোর্ড পরিবারের তরফ থেকে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে রাখা হয়েছিল। সে বিস্তারিত তদন্ত করে নাকি জানায় ঐ মেয়েটিই আসল জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড। এরপর স্টিভ তাকে বিস্তারিত ভাবে জানায় পুরনো জুলিয়ার স্বপক্ষে কি কি প্রমাণ দেওয়া হয়েছিল। গাড়ী চালানোর লাইসেন্স প্রসঙ্গ উঠতেই জুলিয়া আঁতকে ওঠে। ক্যালিফোর্নিয়াতে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স? আমি জীবনে ক্যালিফোর্নিয়াতে কখনো যাইনি।

সাইমন ফিৎজেরাল্ড চিন্তিত মুখে মাথা নাড়েন। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে স্ট্যানফোর্ড পরিবারকে ঘিরে একটা চক্রান্তের জাল, সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এবং যে এই ষড়যন্ত্রটার পেছনে থাকুক না কেন, দুজন জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড তার পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক, হয়ত বিপদজনক। এবার সোলানে মুখ খোলে এবং সেই দোটানা সংশয় থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়, তোমায় সরিয়ে দেওয়া পথ থেকে। হে ভগবান, এখন বুঝতে পারছি। দুহাতে মুখ চাপা দেয় সে। সারা মুখে ভেসে ওঠে আতঙ্কের স্পষ্ট ছায়া। কি হয়েছে? ফিজেরাল্ড জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকেন। দুদিন আগে আমি কানসাসে আমার রুমমেটকে ফোন করেছিলাম। সে বলল, কে একজন, সেখানে আমার খোঁজে গিয়েছিল। স্যালি মানে আমার রুমমেটকে আমি ভেবে খুন করতে যায়। পরে অবশ্য, স্যালির পরিচয় জেনে সে পালায়, তার হাতে ঝকঝকে ছুরি দেখতে পেয়ে স্যালি চেঁচিয়ে উঠেছিল। কথা শেষ করে জুলিয়া আতঙ্কগ্রস্থ মুখে সাইমন ও স্টিভের দিকে তাকিয়ে

থাকে। তারপর যোগ করে, কে? এসব কে করছে? সোলানে বলে, আমায় অনুমান করতে বললে। আমি বাজী ধরতে রাজী আছি। নিশ্চিত ভাবেই পরিবারের কেউ। কিন্তু কেন? জুলিয়ার স্বরে আতঙ্ক স্পষ্ট। বিরাট অঙ্কের সম্পত্তির উত্তরাধিকার...মোটা টাকার লেনদেন...আর কে না জানে, অর্থই যত অনর্থের মূলে। কিন্তু এখন? আমি এখন কি করব? অপেক্ষা, তুমি এবং আমরা এখন শুধু অপেক্ষা করব তোমার যথার্থতা প্রমাণের। কেউ একজন, উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার প্রাপ্য অংশটা হাতাবার জন্য গোটা চক্রান্তটা করছে। আমাদের কাজ হবে সেই ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে, তোমার অংশের প্রাপ্য এক বিলিয়ন ডলার তোমার হাতে তুলে দেওয়া। চোখ কপালে তুলে থতমত খাওয়া গলায় জুলিয়া বলে, এক বিলিয়ন ডলার? আমার?

জুলিয়া চিন্তিত মুখে বলে, কিন্তু এখন আমি কি করব? স্টিভ সোলানে ধমকের গলায় বলে, বলছি না, তুমি কিছুই করবে না। যা করার আমরা করব। ফিৎজেরাল্ড চিন্তিত মুখে বলে, কিন্তু স্টিভ, ওর থাকার একটা জায়গা চাই। এমন একটা জায়গা সেখানে প্রেস, মিডিয়া এবং ওর শত্রুদের থেকে নিজেকে স্বচ্ছন্দে আড়াল করে, গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে। ওকে লুকিয়ে রাখবার এরকম একটা জায়গা চটপট খুঁজে বের করতে হবে। উনি আমার বাড়ীতে থাকতে পারেন। কেউ ভাবতেই পারবে না উনি আমার বাড়ীতে যে রয়েছেন বা থাকতে পারেন, স্টিভ পরামর্শ দেয়। পুরুষ দুজন জুলিয়ার দিকে তাকায়, আমার কোন আপত্তি নেই। এ ব্যাপারটার শেষ দেখতে চাই আমিও। জুলিয়া বলে।

স্টিভের বাড়ীটা নিউ বুরি স্ট্রীটে। সুন্দর করে সাজানো একটা দোতলা বাড়ী, বেশ পছন্দ। হয় জায়গাটা জুলিয়ার বাঃ, সুন্দর! স্টিভের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে। কেন

জানি সদ্য আলাপ পরিচয়েই মানুষটিকে তার ভাল লাগতে শুরু করেছে। স্টিভ বলে, টি ভি সি ডি, ভিসিডি প্লেয়ার সবরকম আছে। স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন। যখন যা ভাল লাগবে করতে পারেন। শুধু যতদিন না আমরা ঠিক বলে মনে করছি এ বাড়ীর বাইরে এক পাও দিতে পারবেন না। সেটা আপনার পক্ষে নিরাপদ হবে না। জুলিয়া ঘুরে ঘুরে বাড়ীটা দেখছিল। আপনি এখানে একা থাকেন। হ্যাঁ। কথাটা বলে স্টিভ একটু থামে, জুলিয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। তারপর বলে, তাহলে আপনি একটু বিশ্রাম নিন। একটু বাজার করে আনি। ঘরে কিছু নেই। মানে আসলে, আমি খাওয়াটা সাধারণত বাইরেই সেরে নিই তো। স্টিভ বেরিয়ে যাবার মুখে জুলিয়া ডাকে, স্টিভ, আমি কি কানসাসে আমার রুমমেটকে একটা ফোন করতে পারি? স্টিভ দ্রুত বাধা দিয়ে, অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে, না। একদম না। এক দিনও আপনি এ বাড়ীর বাইরে বের হবেন না, এখান থেকে কোন ফোন করবেন না। আমার কোন ফোন এলে নিজে ধরবেন না। মনে রাখবেন আপনার বেঁচে থাকার জীবনের প্রশ্নে, এই ব্যাপারগুলো অত্যন্ত জরুরী।

.

২৮.

মনে রাখবেন আমাদের এই কথাবার্তা কিন্তু টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখা হচ্ছে। ডাঃ ওয়েস্টিনের কথায় মার্গো মাথা নেড়ে সায় দেয়, হা ডাক্তারবাবু। আপনার মন শান্ত, মেজাজ ঠান্ডা হয়েছে? আমি শান্তই আছি। কিন্তু ভীষণ রেগে আছি। আপনার এই রাগের কারণ? টাইলার স্ট্যানফোর্ড। এবার ডাঃ ওয়েস্টিনের কপালে ভাঁজ পড়ে। চোখ কুঁচকে

তিনি তাকান, মানে, জজ টাইলার স্ট্যানফোর্ড? আপনি তার কথা বলছেন? হ্যাঁ, অবিশ্বাসের স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে ডাঃ ওয়েস্টিন বলেন, জজ টাইলার কেন আপনার সঙ্গে এরকম করছেন? টাকা, প্রচুর টাকার জন্যে আপনার অনেক টাকা আছে, বলছেন? না...ইয়ে মানে...। আমার নাম মার্গো পসনার... এরপর সে ডাঃ ওয়েস্টিনকে বিস্তারিত ভাবে সব খুলে বলে। মার্গো থেকে জুলিয়া সাজা। টাইলারের প্রতিশ্রুতি, অথচ প্রতারণা, এয়ারপোর্টে নামার পর ওকে পাগল সাজানো, সবই বিস্তারিতভাবে গুছিয়ে বলে। সব শুনে ডাঃ ওয়েস্টিন বলেন, অথচ, এতক্ষণ এতদিন আপনি নিজেকে জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড বলে দাবী করছিলেন। আর এখন যা বলছেন তার অর্থ বুঝতে পারছেন? জজ টাইলারের মত একজন মানুষের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনছেন। এর জল কোথায় গড়াবে বুঝতে পারছেন? জানি জানি, কিন্তু একজন বিচারক বলেই উনি যা খুশি করবেন আর আপনারা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন, তা হয় না। ডাঃ ওয়েস্টিন চিন্তিত মুখে বলেন, আপনি কী চান? মার্গো ঠান্ডা মাথায়, ধীর চোখে, উত্তেজনাহীন গলায় বলে, চাই কাটা দিয়ে কাটা তুলতে। আমি চাই বেজন্মটাকে হাজাতে ঢোকাতে। আর আমি নিজে এই নরক থেকে বের হতে চাই। ঠিক আছে, আমি দেখছি, আপনার অভিযোগ যতই গুরুতর হোক, তার তদন্তের ব্যবস্থা করছি। তবে, তার আগে আপনার মানসিক সুস্থতার, আপনি যে পাগল নন তার প্রমাণ প্রয়োজন।

মার্গো অপেক্ষা করছিল ডাঃ গিফোর্ড-এর জন্য। ওর মানসিক সুস্থতার পরীক্ষা নেবেন তিনি। সমস্ত কিছু সব কিছু ওদের জানাতে হবে। জানাবে সে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু জানাবে। তারপর, ওরা শয়তানটাকে হাজতে পুরবে আর তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। মুক্ত জীবনে ফিরে যেতে দেওয়া হবে। তারপর? তারপর কী হবে মার্গো পসনার? মুক্ত জীবন নিয়ে কি সোনার ফসল ফলাবে তুমি? আবার সেই জোচ্চরের জালিয়াতের

জীবন? ফিরে যাবে সেই নরকে? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো তার চেয়েও যে ভয়ঙ্কর। স্ট্যানফোর্ড এর বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ করা হয়, তাহলে প্রতিশোধ নিতে যদি মার্গোর বিরুদ্ধে প্যারোল তুলে নেয়? সেক্ষেত্রে ওকে ফিরে যেতে হবে জেলে। ড্যাম, শয়তানের ছকে পা দিয়ে বসে আছে সে। এগোবার পথ নেই। পিছনেও অন্ধগলি। রাগ আর হতাশায় খাবার থালাটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারে। কাল পর্যন্ত সে ছিলো বিলিয়ন ডলারের মালকিন...আর আজ? ঠিক তখনি...দাঁড়াও, দাঁড়াও, চকিতে একটা চিন্তা ঝলসে ওঠে তার মস্তিষ্কে। উত্তেজনার তীব্র অথচ প্রচণ্ড ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে ওর সারা শরীরে শীতল একটা স্রোত বয়ে যায়। হে যীশু, এ সে কি করতে যাচ্ছে? নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারতে যাচ্ছিল? আমি জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড এটা তো ইতিমধ্যে প্রমাণিত। সারা পরিবারের সামনেই ডিটেকটিভ ফ্রাঙ্ক টিমমনস তাকে সত্যি আসল জুলিয়া বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিল। পরিবারের সবাই তা শুনেছিল, মেনেও নিয়েছিল, এমন কী ওর আঙুলের ছাপও মিলে গিয়েছিল। এর চেয়ে বড় প্রমাণ কি হতে পারে?

আহ, জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড হতে পারলে কেন আমি মার্গো পসনার হতে চাইছি? ওরা যে আমায় এখানে আটকে রেখেছে তাতে আশ্চর্যের কী আছে? আমার মন বোধ হয় মনের মধ্যে ছিল না। মার্গো দ্রুত হাতে বেল বাজায়। মেট্রন ছুটে আসে। আমি ডাঃ গিফোর্ড-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই। মেট্রন কড়া চোখে তাকায়, জানি। সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করা আছে। না, না, এখনি। আমি এখনি ডাঃ গিফোর্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাই। এখনি। অসহিষ্ণু গলায় চিৎকার করে ওঠে মার্গো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি বলছি। মেট্রন চলে যায়। মিনিট দশেক পরই, ডাঃ ওয়েস্টিনের সঙ্গে একটু মজা করেছিলাম। মানে? ডাঃ গিফোর্ড বিস্ফারিত চোখে বলেন। খুব লজ্জা করছে এখন। আসলে টাইলারের ওপর ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। প্রচণ্ড রাগ থেকেই ওসব কথা বলে টাইলারের ওপর

শোধ নিতে ওকে ফাসাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন রাগ পড়ে গেছে আমি বুঝতে পারছি কী ছেলেমানুষের মত কাজ করেছি। যাইহোক ডাক্তার, আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। আমার রাগও কমে গেছে। আপনি আমার রোজ হিলের বাড়ীতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করুন। ডাক্তার গিফোর্ড বড় বড় চোখে চরম বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে বলেন, তার মানে আপনি বলতে চান আপনি জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড? মার্গো মাথা নাড়ে, বলতে চাই না, আমিই নিশ্চিত ভাবে জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড। ডাঃ গিফোর্ড চোখ কুঁচকে বলেন, কিন্তু সকালে আপনার সঙ্গে ডাঃ ওয়েস্টিনের কথোপকথনের ক্যাসেটটা আমি শুনলাম। সেখানে তো আপনি নিজেকে জনৈকা মার্গো পসনার বলে দাবী করেছেন।

মার্গো এবার অসহিষ্ণু গলায় বলে,–ওফ ডাক্তার, একটু আগেই আপনাকে বললাম না, দাদার ওপর রাগ করে ওকে ফাঁসিয়ে রাগ মেটানোর জন্যই ওসব বলেছিলাম। মার্গো বলে কেউ নেই। আমি জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড। এবার কথা বলেন ডাঃ ওয়েস্টিন, আপনি এটা প্রমাণ করতে পারবেন। মার্গো চতুর ভঙ্গীতে হাসে, নিশ্চয়ই। প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফ্রাঙ্ক টিমমনস-এর নাম শুনেছেন? তিনিই সাক্ষ্য দিতে পারেন এর স্বপক্ষে। তিনি জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড-এর গাড়ী চালকের অনুমতি পত্রের আঙুলের ছাপের সঙ্গে, এমনকি আমার আঙুলের ছাপও মিলিয়ে দেখেছেন। নিশ্চিত ভাবেই তিনি আপনাদের বলতে পারবেন, আমি জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড।

.

পরের দিন, সকাল দশটা। ডাঃ গিফোর্ড আবার মার্গোর ঘরে এলেন। সঙ্গে একজন চাপা রঙের পাতলা চেহারার দীর্ঘকায় মাঝবয়সী পুরুষ। সুপ্রভাত মার্গো হাসে। সুপ্রভাত

ডাক্তার। আপনি কি ফ্রাঙ্ক টিমমনস-এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন? হ্যাঁ, সেই ব্যাপারেই কথা বলার জন্য আমি এসেছি। আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে চাই। আপনি বলছেন আপনি জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড? আপনার দাদা বিচারক স্ট্যানফোর্ডের প্রতি রাগ করে আপনি ওসব কথা বলেছিলেন? আপনি যে আসল জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড তার প্রমাণ সাক্ষ্য দেবেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফ্রাঙ্ক টিমমনস? ঠিক তো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এবার ডাঃ গিফোর্ড তার পাশের পুরুষটির দিকে তাকালেন। তিনি কয়েক পা এগিয়ে এলেন, হ্যালো, আমি ফ্রাঙ্ক টিমমনস।

মার্গো চমকে ওঠে। ফ্যাল ফ্যাল চোখে অপরিচিত মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

.

২৯.

ফ্যাশান শো-টা দারুণ চলছিল। প্রতিটি মডেল যে পোশাকগুলোই পরে মঞ্চে এসেছিলেন দর্শকেরা উচ্ছ্বাসভরা স্বতঃস্ফূর্ত হাততালিতে সেগুলোর প্রশংসায় প্রেক্ষাগৃহ ভরিয়ে তুলছিলেন। বেনডাল ব্যাকস্টেজে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা করছিলো। দর্শক সমালোচকদের প্রশংসার আনন্দে ওর বুকটা ফুলে উঠছিলো। এমন সময়ে দুজন পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেখে ওর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। মুখ ভয়ে ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। আপনি বেনডাল স্ট্যানফোর্ড রেনর? একজন পুলিশ ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়ে সায় দেয়। উর্দিধারীদের একজন বলে, মার্থা রায়ানকে খুন করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। না, না, দোহাই

আপনাদের। আমায় ছেড়ে দিন, আমি খুন করিনি। বিশ্বাস করুন...প্লিজ...আমায় ছেড়ে দিন...।

ঘুমটা ভেঙে যায়। আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে গোটা শরীর, ঘামে ভিজে গেছে, দুঃস্বপ্নই। কিন্তু একেবারে যেন নির্মম বাস্তবের মত। আমার পরিণতি কি তাহলে এরকমই হতে চলেছে? বেনডাল ভাবে, না, কিছুতেই না। কিছু করতেই হবে। আমায় কিছু একটা করতেই হবে। মরীয়া হয়ে সে মার্কের সঙ্গে কথা বলতে চায়। সে নিউইয়র্কে ফিরে গেছে। অফিস থেকে ছুটি পাওয়া আর সম্ভব হচ্ছিল না তার পক্ষে। বেনডাল তাকে বাধা দেয় নি। কারণ একটা ফ্যাশান শোয়ের জন্য ওকেও কয়েক দিন পরই নিউইয়র্কে ফিরতে হবে। বেনডাল ঠিক করে পরের দিন বিকেলেই রওনা হবে নিউইয়র্কে। কিন্তু তার আগে...কিছু একটা করে যেতে হবে। সেদিন উডির সাথে কথা বলার পর থেকেই বেনডাল খুবই বিপর্যস্ত হয়ে রয়েছে মানসিক ভাবে। উডি সব কিছুর জন্য পেগিকে দায়ী করছে, পেগি?

পেগিকে পরের দিন সকালে বাইরের বারান্দাতে পেয়ে গেল বেনডাল। সুপ্রভাত। পেগিও মিষ্টি হাসে, সুপ্রভাত বেনডাল। বেনডাল ওর পাশে এসে দাঁড়ায়, আমার তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে পেগি। হা নিশ্চয়ই, বলল। বেনডাল একটু ইতস্তত বোধ করে। এ কথাটা কিভাবে বলবে? সময় নিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নেয়। তারপর শব্দ সাজায়, আমি উডরোর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ও আমায় বলল, তুমি..ইয়ে...মানে। ওকে হেরোইন নিয়মিত জোগান নাকি তুমি দাও? ও তোমায় একথা বলেছে? হ্যাঁ, একটা দীর্ঘ নীরবতার পর পেগি লম্বা শ্বাস ছাড়ে, কথাটা সত্যি। বেনডাল অবিশ্বাসের তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কি বলছ কি...তুমি...তুমি...। কথা খুঁজে পায় না সে। পেগি কোন কথা বলে না।

বেনডাল আবার বলে–তুমি উডিকে নেশাগ্রস্ত করে রাখতে চাও? কেন পেগি, কেন?–বুঝতে পারছ না তুমি? তাই না? পেগি তেতো গলায় বলে। কি করে পারবে? তুমি তোমার নিজস্ব পরিমন্ডলে থাকো। তোমায় কয়েকটা কথা বলি শ্রীমতি বিখ্যাত ফ্যাশান ডিজাইনার মহোদয়া। যখন তোমার ভাই আমায় গর্ভবতী বানায় তখন আমি ছিলাম নিতান্তই মামুলি এক রেস্তোরাঁর পরিচারিকা। কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি উডরোও স্ট্যানফোর্ডের ঘরণী হতে পারব। আমি একটা অতি সাধারণ নগণ্য মেয়ে। তুমি জানো বেনডাল, কেন তোমার ভাই আমায় বিয়ে করেছিলো? সবাইকে দেখাতে বোঝাতে, প্রমাণ করতে, যে সে তার বাবার তুলনায় এক মহৎ মানুষ। উডি সেই মহত্ত্বের দেখুনবাজি হিসাবে আমার বিয়ে করল বটে। কিন্তু তোমাদের সভ্যতর–অভিজাত সমাজ আমাকে পুরোপুরি বহিরাগত হিসেবে নিলো। আমায় কেউ পাত্তা দিতো না। নোংরা কোন বস্তু বলে ভাবত, ঘৃণ্য চোখে দেখত।

একনাগাড়ে কথা বলে, পেগি থামে। বেনডাল ওর কাঁধে হাত রাখে। সহানুভূতির গলায় বলে, পেগি! আবার বলতে শুরু করে পেগি, একটা সত্যি কথা বলি তোমায়। আমি একেবারে হতবাক হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম, যখন তোমার ভাই আমায় বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল। আমি বিয়ের পর মন-প্রাণ দিয়ে একজন আদর্শ স্ত্রী, উডির ভাল বৌ হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের ঐ সমাজ আমায় সেই সুযোগটাই দিতে চাইল না, রাজী হলো না। ওদের চোখে তখনো আমি এক রেস্তোরাঁ পরিচারিকাই ছিলাম। কিন্তু শিশুটা আমি পেলাম না। গর্ভপাতের পর আমি ভেবেছিলাম উডি বোধহয় এবার বিবাহ বিচ্ছেদ করবে আমায়। কিন্তু তা করল না সে। আমি হয়ে উঠলাম ওর মহত্ব প্রদর্শনীর, লোককে মহৎ হিসেবে নিজেকে দেখানোর–এক চলমান জীবন্ত উদাহরণ। সহানুভূতির প্রতীক। অথচ আমার কিন্তু ওসব কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমিও অন্য দশটা

মেয়েরই মত ছিলাম। ভাল, সৎ,। প্রতিটি শব্দই যেন বেনডালের কাছে বিরাশি সিক্কার এক একটা চড় হয়ে আছড়ে পড়ছিলো। তুমি কখনো কি উডিকে ভালবাসোনি? পেগি কাঁধ ঝাঁকায়, ও সুন্দর দেখতে, আমুদে চরিত্রের। বিয়ের প্রথম কয়েক মাস ওর এই চরিত্রটা ছিলোও। তারপরই ঘটল পোলো মাঠে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটা। সব কিছু সব বদলে গেল তারপরই। হাসপাতালে থাকার সময়ে ওরাই বেদনানাশক হিসেবে ওকে অল্প মাত্রায় মাদক দিতো, নিয়মিত। বাড়ীতে আসার পরই যখন বেদনা উঠত ও মাদকের জন্য ছটফট করতো। রীতিমত দাবী জানাতো ওকে মাদক দেবার জন্য। একদিন ওর অবস্থা দেখে ওকে বলতে বাধ্য হলাম, ঠিক আছে, আজ সামান্য। অল্প একটা শট দিচ্ছি। কিন্তু আজই আর কোনদিন নয় কিন্তু।

পেগি উদাস চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। গম্ভীর হয়ে ওঠে শ্বাস-প্রশ্বাস। যেন কোন এক ঘোরের মধ্যে পৌঁছে যায়। তারপর ঘোর ভেঙে জেগে ওঠা গলায় বলে, সেই শুরু। এরপর থেকে উডি প্রায়ই মাদকের জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু করে। জেদ করতে, জবরদস্ত করতে শুরু করে। এবং আমাকে বাধ্য হয়েই হেরোইন সরবরাহ করতে হতো। এমন অবস্থা হয়ে উঠল পরে সে ব্যথা না থাকলেও, মাদক দিতে আমায় বাধ্য করত। নেশা, অভ্যাস, মাদক নেওয়ার ব্যাপারটা ওর শরীরে জাঁকিয়ে বসল। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার কি জানো? যেহেতু এই নেশার বস্তুটি আমার কাছ থেকে পায়, ঘোর ঐ মাদক প্রয়োজনের তীব্রতম মুহূর্তটার জন্যই ওর জীবনে আমার গুরুত্ব অপরিসীম প্রয়োজন ছিলো। ঐ ঘোরের মুহূর্তগুলোয় ও আমার পায়ে পায়ে ঘুরত, আমার করুণা ভিক্ষা করতো। এবং আমি বুঝে গেলাম আমার শক্তি। উডিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পেয়ে গেলাম আমি। জেনে গেলাম, ঐ বস্তুটি যতক্ষণ আমার হাতে থাকবে আমি উডির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকব। উডিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার আমার চাবিকাঠি হয়ে ওঠে

হেরোইন। ওর ঐ মাদক নেশা সেই ক্ষমতা, যা আমি ব্যবহার করেছি মাত্র। বেনডাল আতঙ্কিত, অবিশ্বাস মেশানো বিস্ফারিত চোখে কয়েক মুহূর্ত পেগির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর রাগ ঘৃণা মেশানো তীব্র গলায় বলে, তুমি একটা নিষ্ঠুর শয়তান। আমার পরিবার তোমাকে বাড়ী, আমাদের পরিবার থেকে, উডির জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে, সোজা কথায় তাড়িয়ে দিতে চাইব, চাইছি। স্বচ্ছন্দে, আমিও চাই না মোটেই তোমাদের এই মেকি জীবন, দমবন্ধ করা পরিবেশে থাকতে। চলে যেতেই চাই। তবে একথা কিন্তু মোটেই ভেবো না, তোমরা বললেই পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়ব। সেটা খুব সহজ, মসৃণ হবে যদি উপযুক্ত দাম পাই। কত পাবো আমি তোমার ভাইকে বিবাহ বিচ্ছেদ দেবার জন্য? তুমি যা দাবী করবে, তা যত বেশিই হোক দেওয়া হবে। এখন, যত তাড়াতাড়ি পারো, যত তাড়াতাড়ি পারো এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। ঠিক আছে। তাই হবে। পেগির গলায় প্রতিক্রিয়াজনিত উষ্ণতার ঝাঁঝ। আমার আইনজীবিই তাহলে তোমাদের আইনজীবির সঙ্গে দাবী, রফা বিষয়ে কথা বলবেন।

পেগি সত্যিই চলে গেছে? হ্যাঁ। তার মানে... বেনডাল শান্ত গলায় বলে, তার মানে কি, আমি জানি। উডি, আমার ভাই, তুমি কি তা সামলাতে পারবে না? উডি পলকহীন ধীর চোখে কিছুক্ষণ বেনডালের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর একটা লম্বা শ্বাস ছাড়ে, হাসে, পারব, মনে হয় পারব। বেনডালও হাসে মনে হওয়া নয়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তুমি পারবে। উডি চওড়া হাসে, ধন্যবাদ বেনডাল, আমার বোধ হয় ওর খপ্পর থেকে বের হয়ে আসার এই সাহসটা কোনদিন হতো না। পারতাম না। বেনডাল খুশির ভঙ্গীতে হাসে বোন তাহলে কী করতে আছে?

সেই সন্ধ্যেতেই নিউইয়র্ক রওনা হয় বেনডাল। ফ্যাশান শোয়ের আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। এবং নিউইয়র্কে পা দেওয়া মাত্র সে ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়ল। নাওয়া খাওয়ার দম ফেলার ফুরসত রইল না বলতে গেলে। শোয়ের ঠিক তিনদিন আগে, ৫৫০ সেভেনথ এভিনিউতে নিজের অফিসে বেনডাল ঢুকতেই, তার ব্যক্তিগত সচিব নাদিন বলল, বেনডাল, ভাল খবর আছে। শোয়ের সব আসন পুরো বুকড হয়ে গেছে। বেনডাল অন্যমনস্কভাবে বলে, ধন্যবাদ। সে অন্য কয়েকটা জরুরী বিষয় নিয়ে ভাবছিল তখন। নিজের চেম্বারের দিকে সে যখন এগিয়ে যাচ্ছে, পেছন থেকে নাদিন বলে, তোমার একটা চিঠি এসেছে, জরুরী ছাপ মারা। একজন লোক এসে দিয়ে গেল। তোমার টেবিলে রেখেছি চিঠিটা। বেনডালের শরীর বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। দ্রুত নিজের ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা তুলে নেয়। খামের দিকে তাকাতেই প্রেরকের নামের জায়গায় দেখতে পায়–বন্য পশু ক্লেশ নিবারণ সংরক্ষণ সমিতি। ৩০০০ পার্ক এভিনিউ। ঠিকানাটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে বেনডাল। ও জানে ৩০০০ পার্ক এভিনিউ, আদৌ কোন ঠিকানাই নেই। কাঁপা কাঁপা আঙুলে চিঠিটা খোলে সে।

প্রিয় শ্রীমতি রেনর,
আমাদের সুইস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন আপনাকে যে এক মিলিয়ন ডলার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল এখনো জমা পড়েনি, আপনার এই অসহযোগিতা আমাদের ক্ষতি করেছে। যাই হোক, আপনাকে জানাই আমাদের আর্থিক প্রয়োজনটা এই মুহূর্তে খুবই বেড়ে গেছে। পাঁচ মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন। এই টাকাটা আপনি এককালীন দান হিসেবে দিয়ে দিলে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ভবিষ্যতে আর আপনাকে বিরক্ত করা হবে না, আর যদি টাকাটা দিতে অসমর্থ বা অমনোযোগী হন সে ক্ষেত্রে যথাযোগ্য জায়গায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধ্য হবো আমরা।

চিঠির নিচে কোন নাম সই নেই, যথারীতি।

বেনডাল তীব্র আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে থাকে চিঠি পড়া শেষ হলে। বার বার করে চিঠিটা পড়তে থাকে। পাঁচ মিলিয়ন ডলার? এটা তার পক্ষে এ মুহূর্তে অসম্ভব। এত বিশাল অঙ্কের টাকা, এত তাড়াতাড়ি যোগাড় করা কোনভাবেই সম্ভব নয় তার পক্ষে। সে রাতে মার্ক বাড়ী ফিরে এলে বেনডাল চিঠিটা ওকে দেখালো। পাঁচ মিলিয়ন ডলার? ইয়ার্কি নাকি? রাগে বিস্ফারিত হয় সে। ওরা তোমায় কিভাবে? বেনডাল অসহায় চোখে তাকায়, এখানেই তো মুশকিল। আমি কে তা জেনে ফেলেছে ওরা। খুব তাড়াতাড়ি আমাকে কিছু টাকা, যোগাড় করতে হবে। কিন্তু কি ভাবে? আমি জানি না...হয়ত। তোমায় উত্তরাধিকার সূত্রের বিনিময়ে ব্যাঙ্ক তোমাকে ধার দেবে, দিতে পারে। কিন্তু যদিও...ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করছি না। মার্ক, এটা আমার জীবন মরণের প্রশ্ন, আমাদের গোটা জীবনের প্রশ্ন, যে করেই হোক আমাকে ধার পাবার চেষ্টা করতে হবেই।

জর্জ মেরিওয়েদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট, নিউইয়র্ক ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। তিনি একজন উচ্চাকাঙ্খী, মধ্য চল্লিশ পুরুষ। জুনিয়র ক্লার্ক থেকে ধাপে ধাপে এত দূর এসে পৌঁছেছেন। একদিন আমি বোর্ড অফ ডাইরেকটরে জায়গা পাবো। তারপর...যদি ভাগ্য সহায় থাকে... তার দিবাস্বপ্নে বিস্ময় ঘটে হঠাৎ তার সেক্রেটারীর ডাকে, স্যার, মিস বেনডাল স্ট্যানফোর্ড এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। একটা সুখের আনন্দের ছোট্ট তরঙ্গ জর্জ মেরিওয়েদারের শরীরে খেলে যায়। একজন সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের মহিলা, সফল ফ্যাশান ব্যবসায়ী হিসেবে, মিস বেনডাল ব্যাঙ্কের একজন অতি উঁচু দরের গুরুত্বপূর্ণ কাস্টমার হতে পারেন। উনি বিশ্বের একজন অন্যতম ধনী মহিলা,

বছরের পর বছর ধরে হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের অ্যাকাউন্ট তার ব্যাঙ্কে খোলবার ব্যর্থ সাফল্যহীন চেষ্টা করে গেছেন তিনি। এবং এখন.... বেনডাল ঘরে ঢুকতেই সাদর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মেরিওয়েদার। করমর্দনের পর, তার পিতার মৃত্যুতে সান্ত্বনা প্রকাশের, সহানুভূতি প্রকাশের পর তিনি বলেন, বলুন মিস বেনডাল, আপনার জন্য কি করতে পারি? হা-হ্যাঁ, তিনি জানেন স্ট্যানফোর্ড কন্যা কি বলবেন। উনি নিজের বিলিয়ন ডলার তার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখতে, অ্যাকাউন্ট খুলতে চান। আমি আপনার ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা ধার নিতে চাই। মেরিওয়েদার খাবি খেলেন। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না তিনি। কি বললেন? আপনার ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার ধার চাই? মেরিওয়েদার দ্রুত চিন্তা করতে থাকেন। খবরের কাগজের রিপোর্ট, লেখালেখি অনুযায়ী স্ট্যানফোর্ড এস্টেটে ওর নিজস্ব অংশ প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের বেশিই হবে। সুতরাং...মনে মনে হাসেন তিনি।

আমার মনে হয় না তাতে কোন অসুবিধা হবে। মেরিওয়েদার জবাব দেন। আমি আমার বাবার উইলের অংশীদার। উত্তরাধিকারী হ্যাঁ, তা জানি। কাগজে পড়েছি। আমি টাকাটা নেবো আমার বাবার উইলের বিনিময়ে। জর্জ মেরিওয়েদার কিছুক্ষণ ভেবে নেন, তারপর বলেন, ব্যাঙ্কের নিয়ম কানুন খুবই কড়া, বোঝেনই তো। আচ্ছা আপনার নিজের সম্পত্তির অংশের মোট পরিমাণ কত হবে? বেনডাল অনিশ্চিত গলায় বলে, সে ব্যাপারে সত্যি বলতে কি আমার কোন ধারণাই নেই। তবে যা শুনছি তা এক বিলিয়নেরও অনেকটা বেশিই হবে। ঠিক আছে। আপনার বাবার উইল তো এখনো প্রবেট হয়নি। প্রবেটের পর উইলের একটা কপি নিয়ে ব্যাঙ্কে চলে আসবেন। প্রবেট? থমকে যাওয়া চোখে জর্জের দিকে তাকায় বেনডাল। এক নিঃশ্বাসে সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে, কিন্তু আমার তো টাকাটা এখনি চাই। খুব তাড়াতাড়ি। মরীয়া ভাব ফুটে ওঠে ওর বলার ভঙ্গীতে।

চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে ওর। মাপ করবেন ম্যাডাম, ব্যাঙ্কের নিয়মের কাছে আমার হাত-পা বাঁধা। বেনডাল উঠে দাঁড়ায়, বুঝলাম। ধন্যবাদ। মেরিওয়েদার স্মিত মুখে বলে,–উইলটা হয়ে গেলেই...।

বেনডাল ততক্ষণে ঘর ছেড়ে বের হয়ে চলে গেছে।

বেনডাল অফিসে ফিরতেই নাদিন উত্তেজিত গলায় বলে, বেনডাল, তোমার সঙ্গে কথা বলার আছে। নাদিনের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর মত মানসিক অবস্থা তখন বেনডালের ছিল না। অনুত্তেজিত প্রাণহীন গলায় সে বলে, কি ব্যাপার? আমার স্বামী ফোন করেছিল। ওর, অফিস থেকে ওকে প্যারিসে বদলি করে দিয়েছে। আমাকেও যেতে হচ্ছে। বেনডাল সারা শরীরে একটা বিদ্যুতের প্রবাহ টের পায় যেন। তুমি...তুমি চলে যাচ্ছো..প্যারিস... প্যরিসে চলে যাচ্ছো? নাদিন উচ্ছ্বাসের গলায় ঝুঁকে পড়ে, হ্যাঁ, দারুণ খবর তাই না? প্যারিস...আহ স্বপ্নের শহর। বেনডাল স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। নাদিন, তাহলে নাদিনই? কিন্তু প্রমাণ করার কোন উপায়ই নেই। প্রথমে মিঙ্ক কোট। তারপর প্যারিস। সঙ্গে পাঁচ মিলিয়ন ডলার থাকলে পৃথিবীর যে কোথাও গিয়ে থাকতেই পারে। যত দামী জায়গায়ই হোক। কিন্তু এখন? ব্যাপারটা সামলাবো কি করে? ওকে যদি বলি সব জানি, ও অস্বীকার করবে করবেই। হয়ত আরো বেশি দাবী করবে। মার্কের সঙ্গে কথা বলে পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে।

বেনডাল যখন অ্যাপার্টমেন্টে ফেরে, সেটা খালি। মার্ক অনেক রাত পর্যন্ত কাজকর্ম করে। ফিরতে রাত হয়। ঘরের, সারা ফ্ল্যাট জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মূল্যবান এবং সুদৃশ্য নানা জিনিসের দিকে তাকিয়ে এক তীব্রতর বিষণ্ণতাবোধ ওকে তাড়িত করে। এসব কিছুই

থাকবে না। একটা একটা করে সব কিছু কেড়ে না নেওয়া পর্যন্ত ওরা থামবে না। রক্ত চুষে চুষে ছিবড়ে না করে দেওয়া পর্যন্ত। হয়ত মার্ক ঠিকই বলেছিল। সে রাতে আমার পুলিশের কাছে যাওয়াই উচিত ছিলো। তাহলে আজকের এই পরিস্থিতি, দীর্ঘ গত কয়েক মাসের চাপা উদ্বেগ দুঃশ্চিন্তা, এসবের মধ্য দিয়ে যেতে হতো না আমাকে। এখন আমি একজন অপরাধী। তখন আমার স্বীকারোক্তি দিতে হবে। যদি কিছু বলতে চাই, যদি সেরকম কিছু করলে, তারপর কি ঘটতে পারে, তার মার্কের তার পরিবারের সঙ্গে? দীর্ঘ এক মামলা, আইনের কচকচি। কাগজে কাগজে শিরোনাম, টিভি চ্যানেলে ছবিসহ খবর। এবং তারপর? সম্ভবত জেল। তার ক্যারিয়ারে শেষ পেরেক, নাহ, কিছুতেই নয়। নিজের শেষ দৃশ্যটা এরকম হতে দিতে পারি না আমি। প্রায় এক ঘোরাচ্ছন্ন অবস্থায় মার্কের ঘরে প্রবেশ করে সে। তার মস্তিষ্কে একটা সিদ্ধান্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়ে শিকড় ছড়ায়, ছড়িয়েই চলে।

মার্কের ঘরের একটা ড্রয়ারে ছোট্ট বহনযোগ্য একটা টাইপরাইটার দেখেছিল সে। অল্প খুঁজতে সেটাকে পেয়েও গেল। ড্রয়ার থেকে টেনে বের করে টাইপরাইটারের মধ্যে একটা কাগজ ভরে, নিজেকে গুছিয়ে কথা শব্দ অক্ষরগুলোকে যাবতীয় আমোঘতাসহ সাজিয়ে নেয়। তারপর খুব শান্ত ভঙ্গীতে টাইপ করতে বসে–একটা চিঠি।

–To Whom May it Concern

আমার নাম বেনডাল স্ট্যানফোর্ড...

বেনডাল থেমে যায়, বিস্ফারিত চোখে নিজের টাইপ করা অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সবকটা ই অক্ষর ভাঙ্গা।

.

৩০.

কেন, মার্ক কেন? বেনডালের গলায়, বলার ভঙ্গীতে তীব্র আশাহত বিষণ্ণতা, ক্ষোভ। এটার জন্য তুমিই দায়ী? না। আমি তো বলেছিলাম তোমায়, এটা নিতান্তই একট দুর্ঘটনা ছিলো। না, ওটার কথা বলছি না আমি। তোমার কথা বলছি আমি। সফল এক নারী, যে ভুলে যায় নিজের ব্যস্ত জীবনে, যে কারো একজনের স্ত্রীও সে। কথাটা নিছক যেন শব্দ নয়। সজোরে এক থাপ্পর হয়ে আছড়ে পরে যেন তা বেনডালের গালে। আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করে, সে কথা মোটেই সত্যি নয়, আমি... হ্যাঁ, তুমি। সব সময় তুমি যা নিয়ে ভাবো, মশগুল থাকো তা নিজেকে নিয়ে বেনডাল। নিজের পেশাদারী জীবন নিয়ে। দুজনে এক সাথে কোথাও গেলেও সব জায়গায় তুমি একজন সফল নারী তারকা। তুমি যেন আমার পেছনেও একটা ট্যাগ লেবেল সেঁটে দাও, যেন আমি কোন গৃহপালিত পোষ্য। এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না মার্ক। তাই? সত্যিই তাই? তুমি তোমার ফ্যাশানের প্রদর্শনী নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াও। কাগজে টিভিতে তোমায় দেখি, আর এই অন্ধকার ঘরে বসে তোমার ফেরার জন্য হা পিত্যেশ অপেক্ষা করি। তুমি কি কখনো ভেবেছ, এই বেঁচে থাকাটা আমি পছন্দ করছি কিনা? কি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা এটা? আমি

তো একজন স্ত্রী চেয়েছিলাম, বেশি কিছু নয়। বেনডালের মুখ তখন বিবর্ণ ছাইয়ের মত হয়ে উঠেছে। তুমি চিন্তা করো না, তুমি যখন থাকবে না, চলে যাবে, আমি অন্য নারীতে সুখ খুঁজে নেবো। তবে, নিশ্চিত ভাবেই সে হবে রক্ত-মাংসের কোন নারী। যার থাকবে আমাকে দেখার মত সময়, কোন ফাঁকা অন্তসারশূন্য ঝিনুকের খালি খোলা নয়। কঠিন, ধারালো গলায় বলে কথাগুলো, কাটা কাটা। চুপ করো, চুপ করো, বেনডাল প্রায় ডুকরে কেঁদে ওঠে। প্রথম যখন তুমি দুর্ঘটনার কথাটা বললে, আমি তোমার হাত থেকে ছাড়া পাবার একটা পথ দেখতে পেলাম। চিঠিগুলো পড়ে তোমার উন্মাদনা, আতঙ্কগ্রস্ততার তীব্র তাড়নাময় চেহারা আমি উপভোগ করতাম। নিজের তীব্র মানসিক অস্থিরতা, হতাশা, বিষণ্ণতা যাবতীয় অপমান, অসম্মান যেন আমি ঐ ভাবে তোমাকে ফেরত দিতাম বলে মনে হতো আমার। এক আনন্দ তীব্র সুখবোধ হতো। যথেষ্ট হয়েছে। না আর নয়। এবার নিজের ব্যাগ ব্যাগেজ গুছিয়ে নাও। আমি তোমার আর মুখ দর্শন করতেও চাই না। মার্ক হাসে, বিষণ্ণতা মেশা ধূসর হাসি। সেরকম কোন ইচ্ছে আমারও নেই। আমার শখ মিটে গেছে। যথেষ্ট হয়েছে, আমি প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি।

এক ঘণ্টা পর মার্ক চলে যায়। সারাজীবনের জন্য।

সকাল নটা, বেনডাল বোস্টনে স্টিভ সোলানেকে ফোন করে, আজ বিকেলের উড়ানে বোস্টন ফিরছি। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আমার একটা স্বীকারোক্তি করার আছে।

সেই, সন্ধ্যেতে সোলানের উল্টো দিকে বসেছিল বেনডাল। প্রথম থেকে আগা গোড়া ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে সব বলে। আধঘণ্টা পর সোলানে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে

তাকিয়ে এতক্ষণ যা শুনল, সেসব কথা মনের ভেতর নাড়াচাড়া করছিল। আপনি তাহলে পুলিশে যেতে চান? হা, প্রথমেই এটা করা উচিত ছিলো। যাই হোক, ওরা এখন আমায় কি করবে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। যা হবার হবে। স্টিভ চিন্তামগ্ন গলায় বলে,–নাহ, যেহেতু আপনি স্ব-ইচ্ছেতে সব স্বীকার করছেন এবং ব্যাপারটা নিছক এক মামুলি দুর্ঘটনা, তাই বিচারক আপনাকে কোন কড়া শাস্তি দেবেন বলে মনে হয় না। সে যাই হোক, মোট কথা ব্যাপারটা থেকে আমি মুক্ত হতে চাই। ছাড়া পেতে চাই। আর আপনার স্বামী? ব্ল্যাকমেইলের অপরাধে ওনার কড়া সাজা হবেই। বেনডাল হাত তোলে, নাহ, ওকে আমি ওর মত ছেড়ে দিতে চাই। ও এবার নিজের মত করে বাঁচুক। স্টিভ মাথা নাড়ে, ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন। আমি আপনাকে পুলিশ সদর দফতরে নিয়ে যাচ্ছি, হয়ত আজ রাতটা আপনাকে হাজতে কাটাতে হবে। কিন্তু কাল সকালেই আপনাকে জামিনে ছাড়িয়ে নেবো, আপনি নিশিন্ত থাকুন।

সোলানে যখন বাড়ীতে ফিরল, সব কথা জুলিয়াকে বলল। শুনে সে চোখ কপালে তুলে বলল, কি কাণ্ড? নিজের স্বামী ওকে ব্ল্যাকমেইল করত? ওর গলায় আতঙ্কের সুর। তারপর স্টিভের দিকে তাকিয়ে বলে, সারাটা দিন তুমি মানুষের সমস্যা দূর করে বেড়াচ্ছ, শুনে আমার খুব ভাল লাগছে। ওর দিকে তাকিয়ে স্টিভ নিজের মনেই ভাবে, সমস্যা? আমি নিজেই তো এখন গভীরতর সমস্যায়।

.

স্টিভের চট্‌কা ঘুমটা ভেঙ্গে যায় তাজা কফির সুবাসে। সঙ্গে মাংস সেঁকার সুস্বাদু গন্ধ। বিছানায় উঠে বসে চট করে, রান্নার লোকটা কি আজ এসেছে? কিন্তু ওকে তো আর

আসতেই না করেছিল। তাহলে? কিন্তু রান্নাঘরে এসে স্টিভ অবাক হয়ে যায়। জুলিয়া, রান্নায় ব্যস্ত। রাতের খাবার তৈরি হচ্ছে। স্টিভ হাসে, কি ব্যাপার? তোমার তো রান্না বান্না করার দরকারই নেই। একটা গোটা হোটেল কিনে নিতে অথবা পাঁচ তারা হোটলের বাছাই করা একশো রাধুনীকে ভাড়া করতে পারো। জুলিয়া অবিশ্বাসের গলায় বলে, স্টিভ, সত্যিই কি টাকাটার অংশ, সম্পত্তি আমি পাবো? অতগুলো টাকা?–নিশ্চয়ই পাবে, এক বিলিয়ানেরও অনেক বেশি টাকা। খাবারগুলো নিয়ে এক সময় ওরা টেবিলে এসে বসে, খেতে খেতে আচমকা জুলিয়া বলে, তোমার জন্য রান্না করার কেউ নেই? স্টিভ হাসে, মানে তুমি জানতে চাইছ, আমি কোন মেয়ের সঙ্গে... জুলিয়ার গাল লাল হয়ে ওঠে ইয়ে, মানে সেরকমই। নাহ, বছর দুয়েক একটা সম্পর্ক ছিল, তবে সেটা ফলপ্রসু হয়নি। জুলিয়া মাথা নাড়ে, দুঃখিত। সোলানে চোখ বড় করে তাকায় আর তোমার নিজের কথা তো কিছু বলছ না? জুলিয়ার মনে পড়ে হেনরি ওয়েসসন এবং অন্যদের কথা, ও হাসে, মাথা নাড়ে, নাহ, তেমন কিছু নয়। তোমার গলাটাও কিন্তু জোরালো অথবা আত্মবিশ্বাসী শোনালো না। জুলিয়া হাসে, সত্যিই ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করা মুশকিল। বলা যায় একটা মরীয়া চেষ্টা, জোর করে সম্পর্ক তৈরির বোকা বোকা চেষ্টা।

–ওরা ওখানে বসে প্রায় ঘন্টা খানেকের বেশি সময় ধরে কথা বলে। স্টিভ ওকে গোটা ঘটনাটার সবটা ক্রমানুযায়ী পর পর শোনায়। আগে যা ঘটেছে-ঘটেছিল, প্রথম নকল জুলিয়ার আবির্ভাব, খালি কবর, দিমিত্রি কামিনস্কির উধাও হয়ে যাওয়া। সব শুনে জুলিয়া হতবাক গলায় বলে, অবিশ্বাস্য, কে করতে পারে এসব? আমি জানি না, সেটাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। স্টিভ আশ্বস্ত হবার গলায় বলে, তবে তোমার কোন চিন্তা নেই, এখানে তুমি একেবারে নিরাপদ। জুলিয়া হাসে, আমি এখানে যথেষ্ট নিরাপদ বোধ করি। ধন্যবাদ।

.

স্টিভ ফিৎজেরাল্ডের মুখোমুখি বসেছিল, কোন পথ পেয়েছ এগোনোর। ফিৎজেরাল্ডের প্রশ্নে মাথা নাড়ে স্টিভ, নাহ, এখনো পুরোটাই ধোঁয়াশা আমার কাছে। তবে গোটা রহস্যাটা যার মাথা থেকেই বের হোক, সেই পরিকল্পনাকারীকে একজন জিনিয়াস মানতেই হবে। দিমিত্রি কামিনস্কির ব্যাপারে সিডনি পুলিশ-এর সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা তো কামিনস্কি ও দেশে রয়েছে শুনে অবাক। ইন্টারপোলের সার্কুলার অনুযায়ী সে একজন ওয়ান্টেড ওরা জানে। যাই হোক ওরা আমাকে আশ্বস্ত করেছে। ওরা দিমিত্রির খোঁজ করবে, এবং সে ব্যাপারে কিছু জানতে পারলেই আমায় জানাবে। একটু থেমে কি যেন ভেবে নিয়ে সে আবার যোগ করে, আমার মনে হয় কি জানোর হ্যারী স্ট্যানফোর্ড উইল পান্টানোর কথা, চিন্তা প্রকাশ করে নিজের মৃত্যুর পরোয়ানা নিজেই সই করে ছিলেন। কেউ একজন ওনাকে থামাতে চেয়েছিল। থামাবার প্রয়োজন বোধ করেছিল এবং পুরো খেলাটাই সেই ব্যক্তিই খেলে চলেছে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সাইমন মাথা নাড়ে, ঠিকই বলেছ। আমাদের হাতে এখন যা আছে সবই পারিপার্শ্বিক তথ্য, প্রমাণ। যাইহোক, সেই ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের কি হলো স্ট্যানফোর্ডরা যাকে ভাড়া করেছিল, এবং যিনি আঙুলের ছাপ পর্যন্ত মিলিয়ে দিয়ে নকল এক জনকে সত্যি জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন? হ্যাঁ ফ্রাঙ্ক টিমমনস, ওনার সঙ্গেও আমি যোগাযোগ করেছি। আজ সন্ধ্যের মধ্যে আশা করি ভদ্রলোকের থেকে খবর পাবো কিছু। আর উনি যদি নিজে থেকে যোগাযোগ না করেন, আমি চলে যাবো শিকাগো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভদ্রলোক এই ঘটনায় বেশ ভাল রকম জড়িত। অনেক কিছু জানেন। তোমার কি মনে হয়? এস্টেটের কোম্পানীর শেয়ারগুলোর দখল নেবার জন্যই জালিয়াতটি,

প্রতারকটি এসব করেছে? সোলানে মাথা নেড়ে সায় দেয়, অঙ্কের হিসাব তো তাই বলছে। কেউ একজন পুরো দখলটা, কর্তৃত্ব নিজের হাতে নেবার জন্যই এতসব করছে, ঘটাচ্ছে।

সাইমন গভীর চিন্তার ভাজ পড়া কপাল নিয়ে তাকায়, তুমি কাউকে সন্দেহ করো? সোলানে চিন্তা করে করে শব্দ বাছাই করে যেন বলে, আমার সন্দেহ নিশ্চিত ভাবেই স্ট্যানফোর্ড পরিবারের ওপর। নাহ, বেনডালকে বোধহয় ব্যাপারটা থেকে বাদ রাখা যেতে পারে। কেনডালকে সন্দেহের উর্ধে রাখার কারণ হিসেবে গত সন্ধ্যের ঘটনাটা ফিৎজেরাল্ডকে জানায় সে। ও যদি এত সব করত, তাহলে নিশ্চয়ই এরকম একটা সময়ে ষড়যন্ত্র চালাবার মাঝপথে নিজের দুর্ঘটনা ঘটানোর কথাটা পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দেবার কথা ভাবত না, চিন্তাই করত না, তাই নয় কি? আর ওর স্বামী মার্ক? ওর ব্যাপারে আমার যত দূর ধারণা গড়ে উঠেছে, ওর দ্বারা ছোটখাটো কোন ব্ল্যাকমেলিং হতে পারে। এত নিখুঁত ভাবে এত ব্যাপক কোন ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা করে সেটাকে ছবির মত স্পষ্টভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা আর যারই হোক, মার্ক-এর আছে বলে আমার মনে হয় না।

আর অন্যরা? তাদের ব্যাপারে তোমার কি মত? সাইমন চিন্তিত মুখেই প্রশ্নটা করে। জজ স্ট্যানফোর্ড-এর এক বন্ধু যে শিকাগো বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত, তার সঙ্গে কথা বলেছি আমি। সেই বন্ধুটি বলেছে, সবাই তার সম্পর্কে উচ্চ ধারণাই পোষণ করে। আর সম্প্রতি সে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হতে চলেছে। আরো একটা জিনিষ, ব্যাপার ওর পক্ষে যাচ্ছে, বিচারক স্ট্যানফোর্ডই প্রথম জুলিয়ার আবির্ভাব ঘটার পর, এক মাত্র তিনিই ডি এন এ পরীক্ষা করানোর দাবী তুলে ছিলেন। তিনি এরকম কিছুর সঙ্গে যুক্ত

থাকবেন, করতে পারেন সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। উডি! আমার ওকে আকর্ষণীয় চরিত্র মনে হয়েছে। এবং আমি নিশ্চিত মাদকের নেশা করে উডি। এবং কে না জানে, সেটা খরচা বহুল অভ্যাস। প্রশ্ন হলো খরচটা আসে কোথা থেকে। ওর স্ত্রী পেগি, খোঁজ নিয়ে এবং মেয়েটির চরিত্র স্বভাব বিশ্লেষণ করে যা মনে হয়েছে এত বড় জটিল, পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চালনা করার সাধ্য ওর হবে না। তবে আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি পেগির এক ভাই আছে। যে অসৎ সঙ্গে জড়িত, বদ পেশায় পরিচালিত। এই খটকার জায়গাটা সম্পর্কেই আরো ভালো করে খোঁজ নিচ্ছি।

পরের দিন সকালে অফিসে পৌঁছেই স্টিভ প্রথমে বস্টনে পুলিশের মাইকেল কেনেডীকে ফোন করে, সুপ্রভাত লেফটেন্যান্ট। আমি রেনকুইস্ট রেনকুইস্ট ফিৎজেরাল্ড থেকে সিনিয়ার অ্যাটর্নীস্টিভ সোলানে বলছি। হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের কেসটার ব্যাপারে একজনের সম্পর্কে কিছু তথ্য, খোঁজ খবর চাই। শ্যা নিশ্চয়ই। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হব। বলুন কার সম্পর্কে খোঁজ খবর দরকার আপনার? শ্রীমতি উডরোও স্ট্যানফোর্ডের ভাই-এর সম্পর্কে, হোপ মালকোভিচ লোকটির নাম। বনস্ক-এর বেকারিতে কাজ করে কোন সমস্যা হবে না। আমি খোঁজ নিচ্ছি। কিছু জানতে পারা মাত্র আপনাকে জানাব। ফোন রাখতে না রাখতেই, ঘরে ঢোকে সাইমন, কি হলো? তদন্ত এগোল? তেমন কিছু নয়। যেই ষড়যন্ত্রটা পরিচালনা করে চলুক, প্রায় নিখুঁতভাবে সমস্ত প্রমাণগুলো মুছে দিচ্ছে সে। কোন তথ্য, সূত্র ছেড়ে যাচ্ছে না। সাইমন মাথা নাড়ে, দেখো, কি করতে পারো। তারপর জুলিয়া কেমন আছে? স্টিভ হাসে, দারুণ। কথাটা বলার ভঙ্গীতে কি যেন ছিল, যা ফিজেরাল্ডকে বাধ্য করল খুঁটিয়ে দেখা দৃষ্টিতে স্টিভের দিকে তাকাতে। উনি একজন আকর্ষণীয়া যুবতী মহিলা। তাই নয় কি? সাইমনের কথায় সোলানে মাথা নাড়ে, নিঃসন্দেহে। সত্যি কথা। উৎসাহী গলায় জবাব দেয়।

বিকেলেই ফোনটা এলো। শ্রী সোলানে? যা বলছি। সিডনি থেকে চিফ ইন্সপেক্টর ম্যাকফারসন বলছি। হ্যাঁ বলুন চিফ? আপনার লোকটিকে খুঁজে পেয়েছি। স্টিভের হৃৎপিন্ডটা যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এলো। দারুণ খবর ইন্সপেক্টর। যত দ্রুত সম্ভব ওকে এখানে নিয়ে আসার... দিমিত্রি কামিনস্কি মারা গেছে। এবার নিজের হৃৎস্পন্দন যেন ওর নিজের কানেই ধরা পড়ে না। কি? একটু আগেই, ছোট্ট একটা দুর গ্রামের পথের পাশে ওর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। কামিনস্কির দুহাতের আঙুলগুলো কেটে নেওয়া হয়েছে এবং একাধিকবার গুলি করে খুন করা হয়েছে। স্টিভ নিজের মনে মাথা নাড়ে, রাশিয়ান মাফিয়াদের মধ্যে প্রতিশোধ নেবার একটা আশ্চর্য্য অদ্ভুত প্রথা আছে। ওরা হাতের আঙুলগুলো কেটে নেয়। রক্তক্ষরণ হতে দেয়। তারপর রক্তক্ষরণে অবসন্ন হতভাগাটিকে গুলি করে খুন করে। ওর জানা ছিল।

অন্ধগলি, স্টিভ একা বসে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। ফাঁকা মন, এগোবার প্রত্যেকটা পথের দরজাগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দিমিত্রি কামিনস্কির সাক্ষ্যর ওপর অনেকটা নির্ভর করেছিল। স্টিভের চিন্তার ঘন আচ্ছন্নভাব ওর সেক্রেটারীর ডাকে ভাঙ্গে। ফ্রাঞ্চ টিমমনস নামের এক ভদ্রলোক ফোন করেছেন। স্টিভ ফোনটা তোলে, যা বলুন শ্রী টিমমনস? আমি শহরের বাইরে গিয়েছিলাম, বাড়ী ফিরে ফোনের উত্তর দেওয়া যন্ত্রে আপনার বক্তব্য সংরক্ষিত পেলাম। তারপরই আপনাকে ফোন করছি। বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্য? অনেক, অনেক কিছু। একটা প্রতারকের আঙুলের ছাপ কি করে আসলটির সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন?জালিয়াতটা কিভাবে, কেন করলেন জানাতে পারেন? মনে মনে ভাবতে ভাবতে স্টিভ বলে, খুব সতর্ক বিবেচনা করে শব্দ বাছে–আমি জুলিয়া স্ট্যানফোর্ডের প্রসঙ্গে বলছি, আপনি যখন বস্টনে ওর আঙুলের ছাপ...

সোলানে..., মাঝপথেই স্টিভের কথা থামিয়ে দিয়ে টিমমনস বলে ওঠে। বাধা পেয়ে স্টিভ বলে, হ্যাঁ বলুন, জীবনে কখনো আমি বস্টনে যাইনি। স্টিভ গভীর শ্বাস নেয়। শ্রী টিমমনস, হলিডে ইন-এর রেজিস্টার অনুসারে, আপনি সেখানে ছিলেন গত... শ্রী সোলানে, কেউ আমার নাম ব্যবহার করেছে। স্টিভ শোনে, চমকিত, হতবাক। তদন্তের কফিনে শেষ পেরেক। তবু যেন ক্ষীণ আশার কোন আলোর খোঁজে যে ভাবে ডুবন্ত মানুষ খোঁজে কাঠকুটো, সে ভঙ্গীতে বলে, কে এরকম করতে পারে বলে মনে হয়, আপনার?

টিমমনস কাশে, সে যদি বলেন, বড় আশ্চর্যের ব্যাপার। এক মহিলা দাবী করছেন যে আমি নাকি বস্টনে তাকে জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি, প্রমাণ দিয়েছি। কিন্তু চরম আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ঐ মহিলাকে আমি জীবনে কখনো দেখিইনি। সহসা এক বিদ্যুতের ঝিলিক বয়ে যায় স্টিভের শরীরে। নতুন আশার ঝলক। সেই মহিলা কে জানতে পেরেছেন? তার আসল পরিচয় কি? হ্যাঁ, তার আসল নাম পসনার। মার্গো পসনার। স্টিভ দ্রুত হাতে কাগজ কলম গুছিয়ে নেয়, উনি কোথায় থাকেন? মহিলা রিড মানসিক হাসপাতাল শিকাগোতে ভর্তি আছেন। ধন্যবাদ, শ্রী টিমমনস। আপনি আমায় অনেক সাহায্য করলেন। ঠিক আছে। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। কি ঘটছে জানতে চাই আমি, কেউ অন্যায় ভাবে আমার নাম ব্যবহার করবে নিজের কার্যসিদ্ধিতে তা মোটেই পছন্দ করছি না আমি। ঠিকই। স্টিভ রিসিভার নামিয়ে রাখে। মার্গো পসনার।

সে সন্ধ্যোতে স্টিভ যখন বাড়ী ফিরল জুলিয়া অপেক্ষা করছিল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে পোষাক পাল্টে নাও। আমি খাবার দিচ্ছি টেবিলে। তৈরি হয়ে খাবার টেবিলে পৌঁছে

স্টিভ একই সাথে অবাক ও মুগ্ধ হয়ে গেল। ফুল, মোমবাতিতে সাজানো টেবিল। লোভনীয় চিনে খাবারের একাধিক পদ। এক খুশির ঢেউ ওর মনকে সপ্তম আনন্দে তুলে ধরে। এভাবে খাবার বেড়ে, টেবিলে সাজিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করেনি কখনো কোন নারী। জুলিয়া বলে, কোন নতুন খবর আছে আজ? স্টিভ ওকে মার্গোর কথা, অন্যসব বিস্তারিত বলে। জুলিয়া মাথা নাড়ে, ব্যাপারটা মিটে গেলে বাঁচা যায়। আমি যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা মিটবে, ততো বেশি খুশি হবো। হ্যাঁ আমিও। স্টিভ বলে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? স্টিভ ভাবে, মেয়েটি একজন সত্যি স্ট্যানফোর্ড পরিবার সদস্য–স্টিভের ধরা ছোঁয়া নাগালের অনেক বাইরে।

রাতের খাওয়া সারতে সারতে দুঘণ্টা কেটে গেল। ওরা গল্প করছিল। কথা বলছিল। সব কিছু নিয়ে কথা বলছিলো। আবার হয়ত কোন কিছুই বলছিলো না। যেন যুগ যুগান্ত ধরে ওদের পরিচয়, চেনাজানা, ওরা অতীত নিয়ে কথা বলছিলো, বর্তমান নিয়ে আলোচনা করছিল। কিন্তু সতর্কভাবে দুজনেই এড়িয়ে যাচ্ছিল ভবিষ্যত বিষয়ে কথাবার্তা। আমাদের এ রাতের কোনই ভবিষ্যত নেই। চিন্তাটা স্টিভকে অসুখী করে তুলেছিল। এক সময় সে বলে,–চলো, এবার বিছানায় শুতে যাওয়া যাক। জুলিয়া ভুরু তুলে চোখ পাকিয়ে তাকায়। কৃত্রিম রাগের ভঙ্গী করে। না, মানে আমি বলতে চেয়েছি..তুমি কি বলতে চেয়েছ আমি ভালই বুঝতে পেরেছি। দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ে।

.

৩১.

পরের দিন ভোরের উড়ান ধরেই শিকাগো পৌঁছায় স্টিভ। বিমান বন্দর থেকে ট্যাক্সী ধরে সোজা মানসিক হাসপাতালে পৌঁছায় সে। কিন্তু অভ্যর্থনা টেবিলের কর্মীটি ওকে প্রথমেই নিরাশ করে। মার্গো পসনার? হাসপাতাল কর্মী? স্টিভ মাথা নাড়ে, তা বলতে পারব না? লোকটি ড্রয়ার থেকে একটি খাতা বের করে, তাতে চোখ বুলিয়ে মাথা নাড়ে, নাহ, ঐ নামে এখানে কেউ চাকরি করে না। তাহলে রোগী, সে হয়ত রোগী হতে পারে। লোকটি ভুরু কুঁচকে কিছুটা বিস্ময় মেশা দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর একটা কমপিউটার প্রিন্ট আউটের একটা শিট বের করে তাতে চোখ বুলোত বুলোতে মাঝপথে থেমে যায়, পসনার। হা মার্গো পসনার, রোগী। আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি কি ওনার আত্মীয়? নাহ। দুঃখিত। আত্মীয় না হলে, এখানকার রোগীদের সঙ্গে বাইরের লোকেরা দেখা করতে পারে না। এটা খুবই জরুরী গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখিত, আমার কিছু করার নেই। নিয়ম ভাঙতে পারার ক্ষমতা আমার নেই। বিরক্ত মুখে সোলানে বলে, এখানকার পূর্ণ দায়িত্বে কে আছেন? ডাঃ কিংসলে। আমি ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ডাঃ কিংসলের মুখোমুখি হলে স্টিভ বলে, নমস্কার। আমার নাম স্টিভ সোলানে। আমি একজন অ্যাটর্নি। আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন শ্রী সোলানে। আমি মার্গো পসনার এর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ডাঃ কিংসলে একটা গভীর শ্বাস ছাড়ে, আহ, কৌতূহল উদ্দীপক কেস বটে। আপনি কি ওর কোন আত্মীয়? না। আমি একটা খুনের তদন্ত করছি, এবং সেই বিষয়েই শ্রীমতি পসনারের সঙ্গে দেখা করাটা অত্যন্ত দরকারী, গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শ্রী সোলানে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। সাহায্য করতে আপনাকে হবেই। ডাঃ কিংসলে মাথা নাড়েন, ইচ্ছে থাকলেও আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। স্টিভ বিস্ময় মিশ্রিত চোখে তাকায়, কেন? উনি অত্যন্ত হিংস্র হয়ে উঠেছেন, যে সামনে যাচ্ছে তাকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে দিচ্ছেন। তাই একটা

নির্জন সেলে ওকে হাত পা বেঁধে রাখা হয়েছে। আজ সকালেই এক নার্সকে প্রায় খুন করে ফেলেছিলেন। সে কি? বারবার নিজের পরিচয় বদল করছেন উনি। একবার মার্গো পসনার বলে হাঁক ডাক করছেন। আবার কিছুক্ষণ টাইলার, প্রমোদতরণী–এসব বলে চিৎকার করে উঠেছেন। তাকে শান্ত করার একমাত্র উপায় হিসেবে ঘুমের ওষুধ, ইনজেকশন দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হচ্ছে। হতাশ ভঙ্গীতে সোলানে বলে, কবে এই অসুখ থেকে সুস্থ হয়ে উঠবে মার্গো? ডাঃ কিংসলে মাথা নাড়ে, সেভাবে কিছু বলা যায় না। ওনাকে তীক্ষ্ণ নজরে রাখা হচ্ছে...।

.

৩২.

ভোর ছটা। জলপুলিশের একটা টহলদার নৌকো চার্লস নদীর জলে নিয়ম মাফিক টহলদারী পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিল। পুলিশ কর্মীদের একজন জলে কিছু ভাসতে লক্ষ্য করে। কাছাকাছি নৌকোটা এগিয়ে নিয়ে যেতেই দেখা যায়, সেটা একটা মানুষের দেহ। জলে ভাসমান দেহটাকে নৌকোয় তুলে আনার পর বুঝতে পারা যায় সেটা একটা মৃতদেহ।

লেফটেন্যান্ট মাইকেল কেনেডি বিস্ময় চমকিত গলায় বলেন, আপনি যা বলছেন নিশ্চিত, পুরোপুরি রকম নিশ্চিত হয়েই বলেছেন তো? করোনার দৃঢ় গলায় বলে, দুশো শতাংশ, এটা হ্যারী স্ট্যানফোর্ড এরই মৃতদেহ। আমি নিজে আগের বার মৃতদেহের ময়না তদন্ত করেছিলাম।

শিকাগো থেকে ফিরে স্টিভ সোজা অফিসে এসে হাজির হলো, তোমাকে হতোদ্যম নিরাশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সাইমন ফিৎজেরাল্ড বলে স্টিভের দিকে তাকিয়ে। স্টিভ একটা হতাশাচ্ছন্ন দীর্ঘতর খাস ছাড়ে, পুরো ব্যাপারটাই তছনছ হয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, ভেঙ্গে পড়ছে, সাইমন। এগোবার তিনটে দরজা খোলা ছিল। দিমিত্রি কামিনস্কি, ফ্রাঙ্ক টিমমনস, মার্গো পসনার। কামিনস্কি মারা গেছে। টিমমনস তো ভুল ব্যক্তি। আর মার্গো পসনার? উন্মাদ, পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় মানসিক হাসপাতালের নির্জন অন্ধকার ঘরে হাত পা বাঁধা হয়ে, সিডেটিভাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমোচ্ছে। আমরা একটা অন্ধগলির শেষ মাথায় এসে পৌঁছেছি সাইমন। ঠিক এমন সময়েই ফিজেরাল্ডের সেক্রেটারী ঘরে ঢোকে, লেফটেন্যান্ট কেনেডি দেখা করতে চান স্যার। সাইমন আর স্টিড অবাক চোখে দুজনে দুজনের দিকে তাকায়। শিকাগো পুলিশ কর্তা? কেন? পাঠিয়ে দাও, ফিৎজেরাল্ড বলেন। ঘরে ঢোকেন আক্ষরিক পরিভাষায় যাকে বলা যেতে পারে র্যাগেড লুকিং এক মধ্য চল্লিশের পুরুষ। ঘরে ঢুকে ঠিকঠাক, অব্যর্থভাবে সাইমনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি বলেন,–শ্রী ফিজেরাল্ড? করমর্দনের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাইমন বলেন, হ্যাঁ। কি ব্যাপার, লেফটেন্যান্ট? কোনরকম ভনিতা না করে সোফায় বসতে বসতে এক ঝলকে স্টিভ আর সাইমনের মুখটা দেখে নিয়ে তিনি বললেন, হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের দেহ পাওয়া গেছে। কি-ঈ-ঈ? প্রায় একই সঙ্গে চরম বিস্ময় মিশ্রিত প্রশ্নটা প্রায় আচমকা আর্তনাদের মত ছিটকে বের হয়ে আসে ওদের মুখ দিয়ে। তারপর আবার দুজনে প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন করে, কোথায় পাওয়া গেল শ্রী স্ট্যানফোর্ডের মৃত দেহটাকে? চার্লস নদীর জলে সাঁতার কাটছিলেন প্রয়াত হ্যারী স্ট্যানফোর্ড। কি করে, জানতে চাইবেন না। কারণ সে প্রশ্নের কোন উত্তর আমার কাছে নেই। কোথায় আছে ওনার দেহটা এখন? মর্গে, যদি না এর মধ্যেই আবার উধাও হয়ে গিয়ে থাকে।

লেফটেন্যান্ট মাইকেল কেনেডি চলে যাবার পর গভীর দুশ্চিন্তার ভাঁজে ভরা কপালে আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে সাইমন ফিৎজেরাল্ড চিন্তাগ্রস্ত গম্ভীর গলায় বললেন, কেসটা ক্রমেই উদঘট রকমের জটিলতর অথচ কৌতূহল উদ্দীপনার হয়ে উঠেছে। একটু চুপ করে থেকে তারপর স্টিভের দিকে তাকিয়ে আবার বলেন, জাল গোয়েন্দা টিমমনস কে সেজেছিল তার কোন পাত্তা লাগাতে পারলে? স্টিভ হতাশ ভঙ্গীতে বলে, নাহ, সে ব্যাপারে এখনো কিছুই জানতে পারি নি। সাইমন একটা শ্বাস ছাড়ে, একটাই ভাল খবর। স্ট্যানফোর্ড এর মৃতদেহ যখন পাওয়া গেছে জুলিয়ার দাবী প্রমাণ করা সহজ হবে। পেরী উইজারকে খবর দাও। ডি এন এ টেস্টের ব্যবস্থা করতে বলল।

স্টিভ যখন টাইলারকে ফোন করে তার বাবার মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার খবরটা দিলো, ওকে বিহ্বল চমকিত শোনালো, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড তো? কে এরকম করতে পারে? আমরা সেটার খোঁজ করছি। মনে মনে রাগের ভিসুভিয়াস ফুটতে থাকে। হতভাগ্য অপদার্থ বেকার, ওকে এই ব্যর্থতার চরম দাম চোকাতে হবে। এমন দাম, যা কল্পনাও করতে পারছে না। অকস্মার ঢেঁকিটা স্টিভ-এর কথা শুনে...। টাইলার নির্বিকার শান্ত গলায় মনের ফুটন্ত ক্ষোভ, উত্তেজনাটাকে প্রাণপণে চেপে গোপন রাখার চেষ্টা করতে করতে বলে, দেখুন শ্রী সোলানে, আমি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছি। প্রচুর মামলা জমে উঠছে। এভাবে আর বেশিদিন ছুটি নিয়ে কাজকর্ম ফেলে রেখে অপেক্ষা করা, বসে থাকা সম্ভব হবে না, হচ্ছে না। আপনার প্রবেটের ব্যাপারটা যদি একটু তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে পারেন তবে আমার খুবই উপকার হয়। স্টিভ সমর্থনের গলায় বলে, আপনার সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি স্ট্যানফোর্ড। চিন্তা করবেন না। আজ সকালেই আমি খোঁজ নিয়েছি। আর দিন তিনেক সময় লাগবে। তার মধ্যে ব্যাপারটা মিটে যাবে আশা করছি। টাইলার উৎসাহী গলায় বলে, বেশ।

ফাঁকা অফিস ঘরে একা বসে স্টিভ সোলানে আবার সমস্ত ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রম। অনুসারে সাজিয়ে সাজিয়ে কাটা ছেঁড়া করছিল। ওর মনে পড়ে চিফ ইন্সপেক্টর ম্যাকফারসন। কি বলেছিলেন–একটু আগে আমরা দিমিত্রি কামিনস্কির মৃতদেহ–এক মিনিট। এক মিনিট। নিমেষে একটা চিন্তা বিদ্যুত চমকের মত ওর মনের মধ্যে ঝলসে ওঠে। কি যেন একটা, পুরোটা যেন বলেননি চিফ ইন্সপেক্টর ম্যাকফারসন। দ্রুত ফোনটা তুলে নিয়ে নম্বর ডায়াল করে সে, হালো, ইন্সপেক্টর ম্যাকফারসন? একটা প্রশ্ন হঠাৎ মনে পড়ল, তাই ফোন করছি। আচ্ছা চিফ ইন্সপেক্টর, দিমিত্রি কামিনস্কির মৃতদেহের মধ্যে, সঙ্গে কি কোন কাগজ পত্র ছিলো। পাওয়া গিয়েছিল? ও আচ্ছা..বুঝেছি...ঠিক আছে, ধন্যবাদ চিফ। অনেক ধন্যবাদ। ফোনটার লাইন কেটে রিসিভারটা ক্রেডালে রাখতে না রাখতেই, সেটা আবার সশব্দে মুখর হয়ে ওঠে। ফোনটা তুলতেই অন্য প্রান্তে লেফটেন্যান্ট কেনেডির গলা, হোপ মালকোভিচের সম্পর্কে কিছু তথ্য আমার হাতে এসেছে। যথেষ্ট পিচ্ছিল চরিত্রের মানুষ মালকোভিচ। ও যে বেকারিটিতে কাজ করে সেটা আসলে চোখে ধুলো দেবার ছল। ওটা আসলে একটা মাদক চক্রের ডেরা, তবে ওরা এত চতুর ভাবে কাজ করে যে পুলিশের পক্ষে কখনন ওদের ছোঁয়া সম্ভব হয়নি। বুঝেছি, আর কিছু? পুলিশ জানতে পেরেছে ওদের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ মাফিয়াদের যোগাযোগ আছে।

বাড়ী ফিরে স্টিভ জুলিয়াকে কোথাও দেখতে পেলো না। জুলিয়া জুলিয়া ডেকে ও কোন সাড়া না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। আতঙ্কের স্রোত হয়ে যায়। ওকে কি অপহরণ করা হয়েছে, নাকি খুন? এসব যখন ভাবছে ঠিক তখন, ছাদের চিলে কোঠার ঘর থেকে জুলিয়াকে নামতে দেখে ওর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। জুলিয়া ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি

হাসে, সব খবর ভাল তো। আমার ধারণা বোধহয় না। যাই হোক, ওসব কথা ছাড়ো। আগামী পরশুদিন আমি উইলটা খুলব। স্ট্যানফোর্ড পরিবারের সদস্যদের সামনে পড়ব। এসবের পেছনে যে আছে সে পরশুর পর তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। করে লাভ হবে না। এই দুটো দিন তোমায় একটু সাবধানে থাকতে হবে। ঠিক এই সময়ে ফোনটা বেজে ওঠে। হালো, স্টিভ সোলানে কথা বলছি। ডাঃ টিকনার বলছি, ফ্লোরিডা থেকে। ডাঃ টিকনারের সঙ্গে কথা বলে ফোনটা ছেড়ে দিয়ে স্টিভ ধপ করে সোফায় বসে পড়ে। হে ভগবান, অবিশ্বাস্য কাণ্ড। জুলিয়া সপ্রশ্ন কৌতূহলী চোখে তাকায়, কি ব্যাপার? কি হয়েছে? উডরোও স্ট্যানফোর্ড? দীর্ঘদিনের মাদক অভ্যাসে নেশাগ্রস্ত ছিলো। তারপর জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে, বলছি বসো।

তিরিশ মিনিট পর, নিজের গাড়ীতে স্ট্যানফোর্ডদের রোজ হিলের বাড়ীর দিকে যেতে যেতে স্টিভ ভাবছিলো, ছেঁড়া টুকরোগুলো সব ঠিক ঠাক জোড়া লেগেছে এতদিনে। লোকটা সত্যি অসাধারণ। চতুরের শিরোমণি। দুরন্ত পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। প্রায় সফলভাবে তা রূপায়ণও করে ফেলেছিল। প্রায় বলছি কেন? এখনো কিছুই শেষ হয়ে যায়নি। লোকটা তার পরিকল্পনা সফল ভাবেই রূপায়িত করতে পারবে। শুধু, শুধু জুলিয়াকে রাস্তা থেকে হটিয়ে দিতে পারলেই, এখনো, অনায়াসে কেল্লা ফতে করতে পারবে সে।

রোজ হিলে পৌঁছে দরজার সামনে পরিচারক ক্লার্ককে দেখতে পেলো স্টিভ। ক্লার্ক মাথা ঝুঁকিয়ে বিনীত ভঙ্গীতে বলল, আসুন স্যার। বিচারপতি টাইলার আপনার জন্য পড়বার ঘরে অপেক্ষা করছেন। ধন্যবাদ ক্লার্ক, স্টিভ সোজা পড়বার ঘরে এসে হাজির হলো। একমনে একটা দাবার বোর্ড সামনে পেতে মনসংযোগ করছিলেন। চাল ভাবছিলেন।

স্টিভ ঘরে ঢুকতেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন, বলুন, কি বলবেন শ্রী সোলানে? দেখুন বিচারপতি স্ট্যানফোর্ড, আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি। আমরা জানতে পেরেছি, প্রমাণও পেয়েছি, দ্বিতীয় যে মেয়েটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, নিজেকে জুলিয়া বলে পরিচয় দিয়েছিল, তিনিই সত্যিকারের আসল জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড, আপনার সৎবোন। আর প্রথম যিনি, যাকে আমরা সবাই আসল বলে ভেবেছিলাম তিনিই নকল। জাল ঠক প্রতারক। ওর মুখের দিকে বিস্ময় জর্জরিত চোখে তাকিয়ে টাইলার বলেন, তা কি করে সম্ভব? কিন্তু হয়েছে তাই, এবং এসব চক্রান্তের পেছনে কে রয়েছেন তাও আমরা জানতে পেরে গেছি। সন্দেহ কৌতূহল মেশানো চোখে স্টিভের দিকে তাকিয়ে টাইলার বলে, কে? কে সে? আপনি হয়ত শুনে অত্যন্ত আঘাত পাবেন। আপনার ভাই, উডরোও স্ট্যানফোর্ড। কয়েক মিনিট পিন পতন স্তব্ধতা। চরম বিস্ময়ের গলায় টাইলার বলে, তার মানে? আপনি বলছেন, এতদিন এতসব যা কিছু রহস্যময় ঘটনাগুলো যা যা ঘটেছে, সব কিছুর পেছনে ছিল উডি? ঠিক তাই। মাথায় হাত দেবার মত করে টাইলার বলে, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

সোলানে মাথা নাড়ে, প্রথমে আমারও এরকম অবস্থাই হয়েছিল। আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু, উনি মাদক নেশায় অভ্যস্ত, আর কে না জানে মাদকের নেশা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। তার ওপর উডির কোন চাকরী বাকরিও বর্তমানে নেই। নিশ্চিত ভাবেই টাকা রোজগারের জন্য তিনি এরকম কিছু একটা করার চিন্তা করতে পারেনই। নিজের শেয়ার ছাড়াও অন্যের শেয়ারের অঙ্ক যদি দখলে নেওয়া যায়, এ চেষ্টা, বর্তমান যে আর্থিক অবস্থা, তাতে উনি ভাবতেই পারেন। উনিই নকল জুলিয়াকে সে জন্য ভাড়া করেছিলেন, কিন্তু আপনি ডি এন এ টেস্ট করানোর দাবী তোলায় উনি হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে কবর খুঁড়ে আপনার বাবার মৃত দেহটাকে উধাও করে দিলেন। যে মৃতদেহ সম্প্রতি

চার্লস নদীর জলে পাওয়া গেছে, সে কথা তো আপনাকে ফোনেই জানিয়েছি। এমন কি শুনে । অবাক হয়ে যাবেন, জুলিয়া অর্থাৎ নকল জুলিয়াকে আসল জুলিয়া প্রমাণ করতে উনি ফ্রাঙ্ক টিমমনস নামে যে গোয়েন্দাকে লাগিয়েছিলেন, আপনারা যাকে ফ্রাঞ্চ টিমমনস বলে জেনেছেন তিনিও নকল, জাল। কানসাস সিটিতে আসল জুলিয়াকে খুন করতে এমনকি তিনি ভাড়াটে খুনীও পাঠিয়েছিলেন। স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জজ টাইলার হিমশীতল গলায় বললেন, এসব সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত? পুরোপুরি, এবং সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন? আপনার বাবা ইয়ট থেকে পড়ে গিয়ে মারা যাননি। তাকেও ভাড়াটে খুনী লাগিয়ে উডি খুন করিয়েছিল।

টাইলার মনোযোগ দিয়ে শুনছিল সোলানের কথা। ঐ খুনটা সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্যই আজ রাতে ইটালি যাচ্ছি আমি। বৃহস্পতিবারের মধ্যে ফিরব। তারপরই আপনার বাবার উইলটা খোলা হবে আপনাদের সামনে। টাইলার শান্ত উদাসীন গলায় বলে, আর আসল মেয়েটি? মানে জুলিয়া, সে কোথায় আছে?...আপনি নিশ্চিত তো সে যেখানে আছে, সেটা ওর পক্ষে যথেষ্ট নিরাপদ? স্টিভ হাসে, ও নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না, ও যেখানে আছে কেউ খুঁজে পাবে না। ও আমার বাড়ীতে আছে।

.

৩৩.

ভগবান আমার সহায়। নিজের সেই ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। অবিশ্বাস্য ভাবে ভাগ্য সহায়তা করল তাকে। গত রাতে স্টিভ সোলানে নিজের হাতে জুলিয়াকে তার

হাতে তুলে দিয়ে গেছে। হ্যাল বেকার, একটা অকম্মা, অপদার্থের ঢেঁকি। নাহ, আর কোন সুযোগ নেওয়া যাবে না। এবার সে নিজেই জুলিয়ার ব্যবস্থা করবে। ঠিক এমন সময় ক্লার্ক ঘরে এলো। স্যার আপনার একটা ফোন এসেছে। টাইলার ফোন তোলে। অন্য প্রান্তে কিথ পার্সি। হ্যালো, কি বলো? টাইলার, আমি তোমায় মার্গো পসনারের ব্যাপারে জানানোর জন্য ফোন করলাম। মেয়েটা একেবারে উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। যে কারণে ওকে হাত পা বেঁধে নির্জন সেলে বন্ধ করে আটকে রাখতে হচ্ছে। খবরটা শুনে একটা স্বস্তির ঢেউ বয়ে যায় ওর শরীর জুড়ে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আহা। বেচারা মেয়েটার কথা ভেবে খুব খারাপ লাগছে। যাইহোক তুমি চিন্তা করো না। মেয়েটার দিক থেকে তোমার পরিবারের বদনাম হবার আর কোন সম্ভবনা নেই। ধন্যবাদ পার্সি।

নিজের ঘরে এসে টাইলার লিকে ফোন করে। দীর্ঘ সময় কেটে যাবার পর, লি ফোন তোলে। হালো? টাইলার ভেসে আসা প্রচুর কথার আওয়াজ, নানা মানুষের গলা শুনতে পায়। লি বলে, কে বলছেন? আমি টাইলার লি।

ওহ, তুমি। তোমার ফ্ল্যাটে কি পার্টি চলছে? লি হাসে তুমি কি পাটিতে যোগ দিতে চাও? যদি পারতাম সত্যি, যাই হোক যা বলার জন্য তোমায় ফোন করেছি। জিনিষপত্র গুছিয়ে ইয়টের সফর যাবার জন্য তৈরি হয়ে থাকো। যে কোন দিন আমরা রওনা হয়ে পড়ব। লি আবার হাসে, তুমি সেই সাদা বিশাল প্রমোদ তরণীতে, সেন্ট ট্রপেজ দ্বীপে বেড়াতে যাবার কথা বলছ তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি তৈরি হয়ে থাকব, অবশ্যই। লি কৌতুকের গলায় বলে, বিদ্রূপ মেশানোও থাকে যেন ভঙ্গীতে, লি আমি কিন্ত সিরিয়াস। হ্যাঁ, হা, নিশ্চয়ই। টাইলার এবার আমায় যেতে হবে, পার্টির অতিথিরা অপেক্ষা করছে। আর বোর করো

না, কোন বিচারপতি ইয়টের মালিক হয় না, হতে পারে না। টাইলার শোনে লি এবার ফোন ছেড়ে দিতে যাচ্ছে। মরীয়া হয়ে বলে, এক মিনিট, এক মিনিট দাঁড়াও। লি, তুমি কি জানো, আমি কে? হা নিশ্চয়ই। তুমি... আমি টাইলার স্ট্যানফোর্ড। বিজনেস টাইফুন সদস্য প্রয়াত স্যারী স্ট্যানফোর্ডের বড় ছেলে। নিমেষে ফোনের অন্য প্রান্তে নীরবতা নেমে আসে, কয়েক মুহূর্ত সময় নেয় যেন লি খবরটাকে হজম করতে। হে ভগবান। তুমিই সেই স্ট্যানফোর্ড। আমি জানতাম না, ইয়ে, আমি দুঃখিত টাইলার। কাগজপত্রে দেখছিলাম বটে। মনোযোগ দিয়ে পড়িনি। তুমিই যে সেই কল্পনাই করতে পারিনি আমি। কিছু মনে করো না প্লিজ। –ঠিক আছে। আমি এখন এস্টেট সম্পত্তির উইল অনুযায়ী উত্তরাধিকার দখল নেবার জন্য বস্টনে রয়েছি।

তুমি সত্যিই আমায় সেন্ট ট্রপেজ দ্বীপে ভ্রমণে নিয়ে যেতে চাও? লি আগ্রহী গলায় প্রশ্ন করে। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে। এখন থেকে আমরা এক সাথে অনেক কিছু করব। অনেক কিছু করার আছে। একটু থেমে সে আবার যোগ করে, অবশ্য, যদি তুমি চাও। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ওহ, ভাবতেই আমার শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। কাটা দিচ্ছে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব টাইলার। লি-এর গলায় আগ্রহ। উত্তেজনা হঠাৎ যেন চমক দিয়ে ওঠে। ফোন রাখতে রাখতে টাইলার মনে মনে হেসে ওঠে। লির ব্যবস্থা করা শেষ। ও এখন পোষা বিড়ালী। এবার, এবার তার ছোট্ট মিষ্টি সৎ বোন জুলিয়ার ব্যবস্থা করার পালা।

টাইলার টেলিফোন ডাইরেক্টরীটা বের করে। স্টিভ সোলানে, খুঁজতে খুঁজতে সঠিক নামটা পেয়েও যায়। নামের পাশেই লেখা ঠিকানা–২৮০, নিউবুরি স্ট্রীট।

গাড়ী চালিয়ে স্টিভ সোলানের বাড়ীর দিকে যেতে যেতে টাইলার মনে মনে ভাবছিল, সে যা করতে চলেছে, সে ব্যাপারে। সে নিজে কখনো সরাসরি খুনের সঙ্গে জড়িত থাকেনি। খুন করেনি। কিন্তু এ মুহূর্তে এ ছাড়া কোন অন্য পছন্দের সুবিধা সুযোগ তার সামনে নেই। জুলিয়া, তার এবং লক্ষ্যপূরণের মাঝখানে শেষ প্রতিবন্ধক। ওকে সরিয়ে দিতে পারলেই ওর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সমস্যাও দূর হয়ে যাবে টাইলারের, চিরতরে।

স্টিভ সোলানের বাড়ীটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। ফুটপাথে বেশ কয়েকটা গাড়ী। দাঁড় করানো আছে। কিন্তু পথচারী লোকজন বিশেষ নেই। ওকে স্টিভের বাড়ীতে ঢুকতে কেউ দেখল না। ডোর বেল বাজাতে জুলিয়া সাড়া দিলো বাড়ীর ভেতর থেকে, কে?– জজ স্ট্যানফোর্ড। জুলিয়া দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়, আসুন, ভেতরে আসুন। টাইলার ঘরের ভেতর ঢুকে আসে। চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলে, তুমি কি বাড়ীতে একা, কেউ নেই আর? একাই আছি। বলুন, আপনি কি কথা বলতে এসেছেন। টাইলার মাথা নাড়ে, বেশ, বলছি। জুলিয়া আমি বলতে এসেছি যে তুমি আমায় ভীষণ হতাশ করেছ। জুলিয়া হতবাক চোখে তাকায়, হতাশ করেছি? নিশ্চয়ই, তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি। যা তোমার নয়, যার দাবীদার তুমি কখনোই ছিলে না, কেন তার দাবী নিয়ে এসে হাজির হলে জুলিয়া? জুলিয়া, এতগুলো দীর্ঘবছর, প্রতিনিয়ত আমরা যখন আমাদের স্বর্গতঃ পিতার হাতে নির্যাতিত লাঞ্ছিত, নিগৃহীত হতাম তুমি তখন কোথায় ছিলে? চরম হতাশার ঐ সব দিনগুলো, মরমে মরে যাবার দিনগুলো, গুমরে গুমরে মরার দিনগুলো। প্রতিটি পলে পলে চরম অপমান নিগ্রহের নরক যন্ত্রণার দিনগুলো যখন আমাদের সঙ্গে তুমি ভাগ করে নাওনি, সম্পত্তির অংশও আমরা, হ্যাঁনী স্ট্যানফোর্ডের সম্পত্তির যথার্থ উত্তরাধিকারী ভাইবোনেরা কেন তোমার সঙ্গে আমাদের পাওনা, যথার্থ প্রাপ্য তোমার সঙ্গে ভাগ করে নেবো? নিতে চাইব?

–জুলিয়া স্থির পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। যা শুনছে, নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। অবশেষে ধীর গলায় বলে, তাহলে আমায় এখন কি করতে চান? কি করতে চাই? টাইলার হাসে, খুব সহজ ব্যাপার। পকেট থেকে গুলি ভরা রিভলবারটা বের করে সে। আতঙ্কিত চোখে বন্দুকটার দিকে তাকায় জুলিয়া। টাইলার হাসে,–তুমি উধাও হয়ে যাবে। নিছক হারিয়ে যাবে। জুলিয়া আতঙ্কের চোখে তাকায়, মানে? আমি বুঝতে পারছি না আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন? চুপ, কোন কথা নয়। টাইলার ধমকের সুরে বলে, তুমি আমার পাকা ঘুটি প্রায় কেঁচিয়ে দিতে বসেছিলে। আমার সমস্ত পরিকল্পনা প্রায় ব্যর্থ করে দিতে বসেছিলে, আর আমার চাল নষ্ট করো না। চলো, আমরা এখন একটু বেড়াতে যাবো। জুলিয়া শক্ত কাঠ কাঠ গলায় বলে, যদি না যাই? যেতে তোমায় হবেই। তবে জীবন্ত অবস্থায় যাবে, না মৃত অবস্থায় যাবে সেটা তোমার পছন্দ। এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপরই টাইলার শুনতে পায়, বিকট প্রতিধ্বনি তুলে জোরালো শব্দ তুলে ছড়িয়ে পড়ছে কয়েকটা শব্দ, যেতে তোমায়...হবেই...তবে..জীবন্ত... ওরই বলা কথাগুলো। চার দেওয়ালে, বাড়ীটায় শোনা গেল প্রতিধ্বনি? খুবই সঙ্গীন। টাইলার স্ট্যানফোর্ড কি বলে গেলেন মনে রেখো। আমরা যেসব অভিযোগ তুলেছি ওনার বিরুদ্ধে, যদি সেসব প্রমাণ করতে না পারি, উনি মানহানির মামলায় ফেলবেন আমাদের। সুতরাং আমাদের যা কিছু করার খুবই তাড়াতাড়ি করতে হবে।

.

সে রাতে জুলিয়া নিজের বিছানায় শুয়ে স্টিভের কথাই ভাবছিল। টাইলার স্ট্যানফোর্ড একটা শয়তান। তার হাত থেকে স্টিভের ধ্বংস হওয়াকে কিভাবে আটকাবে সে। আহ,

সব কিছুর জন্য দায়ী আমি, আমিই। আমি যদি না আসতাম, স্টিভ এই বিপদে, ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়তই না। তার পরই, ওর মনে একটা বিচিত্র অনুভূতি ভেসে ওঠে। কিন্তু যদি এখানে না আসতাম, স্টিভের সঙ্গে তো কোনদিন দেখাই হতো না।

পাশের ঘরে, নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্টিভও ভাবছিল জুলিয়ার কথা। জুলিয়া আর তার মাঝখানে মাত্র একটা পাতলা দেওয়াল। ব্যাপারটা তার মনে এক চাপা হতাশার সৃষ্টি করছিল। ঐ দেওয়ালটা শুধু তাদের মাঝে। তারপরই তার মনে হয়, এসব কি ভাবছে সে? পাতলা দেওয়াল? এক বিলিয়ন ডলারের পুরু দেওয়াল বলে কথা।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে টাইলার যেন আনন্দে ভাসছিল, একটু আগে যা ঘটল সেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল। সে কিভাবে ওদের সব কজনকে বুদ্ধ বানালো সেকথা ভেবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল। ওরা বামনের দল, লড়তে এসেছিল দৈত্যের সঙ্গে। ও জানলও না, ঐ একই চিন্তা ভাবনাটা ছিল তার বাবারও। হুবহু ঐ ভাবনাই। রোজ হিলে পৌঁছনোর পর ক্লার্ক তাকে অভিবাদন জানালো, আশা করি সন্ধ্যেটা ভাল কেটেছে স্যার? চমৎকার ক্লার্ক, চমৎকার! এত সুন্দর সন্ধ্যা বহুদিন কাটাইনি। আপনার জন্য কিছু কি আনব স্যার? এক পাত্র শ্যাম্পেন। সেটাই চমৎকার হবে। ঘরের দিকে যেতে যেতে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে তার জয়ের উৎসব পালনের কথা ভাবছিল। আগামী কাল, আগামী কাল সে দুই বিলিয়ন ডলারের মালিক হবে, তারপর ক্রমে ক্রমে পুরো স্ট্যানফোর্ড এস্টেট হবে তার, একা তার দখল নেবেই সে। দু বিলিয়ন...দু বিলিয়ন... যেন কোন গোপন মন্ত্র, এভাবে বিড় বিড় করতে করতে সে নিজের ঘরে এসে পৌঁছায়। তখনি লিকে একটা ফোন করার ইচ্ছে তার মথায় আসে। এবার, এখন লি তাকে একেবারে চিনে নেয়। উষ্ণ সাদর গলায় বলে, বলল টাইলার, কেমন আছো তুমি? ভাল, খুব ভাল।

আমি তোমার ফোনের অপেক্ষাতেই ছিলাম। লির কথাটা টাইলারের মনে একটা খুশির ঢেউ তোলে। তাই বুঝি? শোনো তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো বস্টনে চলে আসতে পারবে? হ্যাঁ অবশ্যই। কিন্তু কেন টাইলার? আগামীকাল, আমাদের বাবার উইল পড়া হবে, উত্তরাধিকার সূত্রে দু বিলিয়ন ডলার পাবো আমি। দু.দুর্দান্ত খবর টাইলার। আমি ভাবতে পারছি না। লি এর গলায় অভাবনীয় চমকের শ্বাসরুদ্ধতা। তারপর আমরা দুজনে কোন ইয়টটা কিনব, পছন্দ করতে যাবো। দারুণ, দারুণ ব্যাপার টাইলার। তুমি তাহলে আসছ তো? অবশ্যই, নিশ্চয়ই। ফোনটা রেখে দিয়েও আদর-প্রেম মাখা গলায় বারবার সে বিড়বিড় করে চলে, দু বিলিয়ন...দু বিলিয়ন..দু..।

.

৩৪.

বেনডাল আর উডি স্টিভ সোলানের অফিসে বসেছিল। কি ব্যাপার বলুন তো? আমাদের কেন ডেকে আনলেন? আর উইল খোলার, পড়বার তারিখ একদিন পিছিয়েই বা কেন দেওয়া হলো? উডি অসহিষ্ণু গলায় প্রশ্ন করে। আমি আপনাদের সঙ্গে একজনের দেখা করাতে চাই। স্টিভ বলে। কে? অবাক গলায় বেনডাল প্রশ্ন করে। আপনাদের বোন। স্টিভের কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুই-ভাই বোন প্রায় একই সঙ্গে আর্তচিৎকারের মত বলে, কি-ঈ-ঈ? এক ঝলক ওর দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বেড়াল বলে, আমরা কি ইতিমধ্যে তার সঙ্গে মিলিত হইনি? স্টিভ ইনটারকমের বোম টিপল। বেনডাল আর উডি দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকায় ধাঁধাগ্রস্তের মত। কয়েক মুহূর্ত পরই দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে জুলিয়া। স্টিভ দাঁড়ায়, আপনাদের সৎ বোন জুলিয়ার

সঙ্গে পরিচিত হন। উডি আর বেনডাল প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, কি বলছেন কি আপনি? উডির গলায় স্পষ্ট বিরক্তি ও উত্মা। দয়া করে আমায় বলতে দিন, পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে দিন। এরপর পনের মিনিট স্টিভ সোলানে কথা বলে। নিশূপ স্তব্ধ হয়ে ওরা দু ভাইবোন শুনে যায়। স্টিভ কথা শেষ করে, পেরী উইঙ্গার জানাচ্ছেন, আপনার বাবার সঙ্গে এই মেয়েটির ডি এন এ পুরোপুরি ম্যাচ করে গেছে। এখন নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, নিঃসন্দেহে ইনিই আসল অকৃত্রিম জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড। স্টিভের কথা বলা শেষ হলে উডি মাথায় হাত রাখে, টাইলার শেষ পর্যন্ত! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণকে অবিশ্বাস করব কি করে? স্টিভ বলে। উডি তবু অবিশ্বাসীর গলায় বলে, আশ্চর্য, অন্য মেয়েটির আঙুলের ছাপ প্রমাণ করেছিল, সেই জুলিয়া? আঙুলের ছাপের কার্ডটা পর্যন্ত এখনো আমার কাছে রয়েছে। কথাটা শোনা মাত্র স্টিভের বুকটা উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল। শব্দটা স্টিভ যেন নিজের কানেই শুনতে পেলো। ওটা আপনি রেখে দিয়েছেন? হ্যাঁ, কেন, কি ভেবে তা আমি নিজেও জানি না। আপনাকে তাহলে আমার একটা উপকার করতে হবে।

.

পরদিন, সকাল দশটা, রেনকুইস্ট রেনকুইস্ট অ্যান্ড ফিৎজেরাল্ড-এর অফিসের কনফারেন্স রুমে সবাই জড়ো হয়েছিল। টেবিলের একদম শেষ প্রান্তে সাইমন ফিৎজেরাল্ড। এছাড়া ঘরে হাজির আছেন টাইলার, উডরোও, বেনডাল, জুলিয়া এবং স্টিভ। এছাড়া আরো কয়েক জন অচেনা মুখকে এ ঘরে হাজির দেখা গেল। টাইলার অধৈর্য ভঙ্গীতে বলল, এবার কাজের কথায় আসা যাক। অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে একটু ঘুরে বসেছিল। মনে মনে বলেন, আমি শুধু দুবিলিয়ন ডলারেই মালিক হতে যাচ্ছি

না। বেজন্মার বাচ্চারা, তোদের সবকটাকে আমি ধ্বংস করব। সবকিছু একা আমার হবে। সাইমন মাথা নেড়ে সায় দেয়, অবশ্যই। তার আগে এই দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি, উইলিয়াম পার্কার আর উনি প্যাট্রিক ইভান্স। এনারাই স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের কাগজপত্র দেখা শোনা করেন। আমি শুরুটা করছি তারপর এঁরা দায়িত্ব নেবেন। ফিৎজেরাল্ডের সামনেই একটা ষাঁড়ের রক্তের মত ঘন রক্তবর্ণ ফাইল টেবিলে রাখা, যার ওপরে সোনালী রঙ দিয়ে লেখা, হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের শেষ ইচ্ছাপত্র। আমি আপনাদের সবাইকে উইলের একটা করে কপি দিচ্ছি। এতে উইলের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় বিস্তারিত ভাবে পড়তে জানাতে হবে না। আপনারা নিজেরাই প্রয়োজন মত যা দেখবার দেখে নিতে পারবেন। আর মূল কথাটা তো আপনারা সবাই জানেনই। প্রয়াত হ্যারী স্ট্যানফোর্ড-এর পুরো সম্পত্তির সমান ভাগীদার আপনারা চার ভাই-বোন।

জুলিয়া স্টিভের দিকে তাকায়। স্টিভ জুলিয়ার মুখে অত্যাশ্চর্য আনন্দের ঝলক লক্ষ্য করে। স্টিভকে ব্যাপারটা ভীষণই আনন্দ দেয়, যদিও জানে এই ব্যাপারটা জুলিয়াকে তার ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। টাইলার ভেবে চলেছে লি আজ সন্ধ্যোতে এসে পড়বে। আমি চাই বিমান বন্দরে ওকে আনতে যেতে। ফিৎজেরাল্ড বলে চলে, উইলে ছোটখাটো যেসব শর্ত আছে সে সব বলছি না। স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের মোট সম্পত্তির পরিমাণ মোটামুটিভাবে ছয় বিলিয়ন ডলার-এর মত। কথা শেষ করে তিনি পার্কারের দিকে তাকান। এবার, এখন থেকে শ্রীপার্কার শুরু করবেন। উইলিয়াম পার্কার এগিয়ে আসেন, ফিজেরাল্ডের পাশে এসে দাঁড়ান। নিজের হাতের ছোট্ট ব্রিফকেসটা খুলে এক তাড়া কাগজপত্র বের করে লম্বা টেবিলটায় রাখেন। তার পর একটু কেশে গলা সাফ করার ছলে কিছুটা সময় বের করে নেন নিজের বক্তব্যকে শুরু করার জন্য গুছিয়ে

সাজিয়ে নিতে। তারপর বলতে শুরু করেন, হ্যাঁ সাইমন যা বললেন...স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছয় বিলিয়ন ডলার। তারপর দীর্ঘ সময় জুড়ে...এক গভীর নীরবতা, এবং তারপর স্ট্যানফোর্ড পরিবারের সদস্যদের মুখগুলোর দিকে এক ব্যঞ্জনাবাহী দৃষ্টি হেনে পার্কার বলেন, উলটো দিকে বাজারে স্ট্যানফোর্ড এন্টারপ্রাইজের ধার দেনার অঙ্কের পরিমাণ এ মুহূর্তে পনেরো বিলিয়ন ডলারের বেশি। ঘরে যেন একটা বোমা পড়ল। কয়েক মুহূর্ত শব্দহীন, ওরা যেন সবকজন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। যা শুনল বলে। ওদের মনে হচ্ছে, ঠিক তাই শুনল তো? তারপরই, বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে ধমকে ওঠে, কি আজেবাজে বকছেন? টাইলার দাঁতে দাঁত পিষে গর্জে ওঠে, এটা কি কোন বিশেষ ধরনের রসিকতা? পার্কার মাথা নাড়েন, নাহ, নাহ, একদম বাস্তব রূঢ় কিন্তু সত্যি। একটু থেমে হাতের কাগজের তাড়াগুলো তুলে ধরেন তিনি। এগুলো সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের রিপোর্ট। এগুলোতে চোখ বুলোলেই আপনারা সব বুঝতে পারবেন। আসলে গত কয়েক বছর ধরেই কেন জানি প্রয়াত হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে সুদের লভ্যাংশের হার কমে যাবে। তাই তিনি লগ্নী করতে লোকসান খেলেও, নিজের দৃঢ় বিশ্বাস থেকে সরে আসেননি। নিজস্ব পুঁজি শেষ হয়ে যাবার পরও তিনি ব্যাঙ্ক থেকে সমানে টাকা ধার নিয়ে গেছেন।

ঘরের সব কজন স্তব্ধ নির্বাক বাকরুদ্ধ হয়ে উইলিয়াম পার্কার-এর কথা শুনছিল। এবার পার্কার থামতেই কথা বলেন প্যাট্রিক ইভান্স। এখন যা পরিস্থিতি তাতে ব্যাঙ্কগুলো নিজেদের দেনা আদায় করতে স্ট্যানফোর্ড এস্টেটের সব কিছুর দখল নেবে, যে যে ব্যাঙ্ক থেকে উনি বিশাল বিশাল অঙ্কের টাকা ধার করেছিলেন, তাদের দেনাপত্রে এরকম শর্তই দেওয়া আছে। দেনা শোধ না করা গেলে ওরা দখল নেবে স্ট্যানফোর্ড এস্টেটের

অফিসগুলো, কোম্পানীগুলো, ঘর-বাড়ী, গাড়ী, হেলিকপ্টার, ইয়ট, ভিলাগুলো সব–সব কিছু। সত্যি বলতে কি ঐ উইল অনুযায়ী যারা প্রত্যেকে এক বিলিয়ন ডলার পাবার কথা, আসলে তারা কেউ একটা আধলা ইটও পাচ্ছেন না। ঘরের মানুষগুলো, বসে থাকে নির্বাক, চোখে ভাষা নেই যেন বজ্রাহত।

দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেলে টাইলার জড়ানো মাতাল পায়ে উঠে দাঁড়ায়, সে আর মাল্টি বিলিয়নিয়ার নয়। নিছক এক বিচারপতি ছিল, আছে, থাকবে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিমান বন্দরে পৌঁছতে হবে, লিকে সব বুঝিয়ে বলতে হবে। কিন্তু, কিন্তু লি কি বুঝবে, আদৌ বুঝতে চাইবে? সারা শরীরে জ্বরের কাপুনি, টাইলার উঠে দাঁড়ায়। তেতো গলায় বলে, এরপর আর তো কিছু... বলার কিছু নেই...থাকতে পারে না। যাই হোক, আমায় যেতে হবে। এক অথর্ব বৃদ্ধের ভঙ্গীতে দরজার দিকে এগোতে থাকে। স্টিভ বাধা দেয়, আরো একটা কথা ছিলো বিচারক টাইলার। হ্যাঁ, বলুন। টাইলার প্রাণহীন ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ায়। স্টিভ দরজার পাশে তাকায়, ইঙ্গিত করে, দরজা খুলে যায়, ঘরে ঢোকে হ্যাল বেকার। ঘটনার মোড় ঘুরে যায় উডির কাছে পাওয়া আঙুলের ছাপের কার্ডটাতে। স্টিভের অনুমানই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। কার্ডটায় মার্গো পসনারের আঙুলের ছাপের সঙ্গে পাওয়া যায় নকল গোয়েন্দা ফ্রাঙ্ক টিমমনসের প্রচুর আঙুলের ছাপও। পুলিশ বিভাগের কমপিউটার থেকে, আঙুলের ছাপের রেকর্ড থেকে, হ্যাল বেকারের পরিচয় বেরুতে তিরিশ মিনিট সময় লাগেনি। তারপর ওয়ারেন্ট বের করা, আর শিকাগোর বাড়ী থেকে বেকারকে গ্রেপ্তার করা। পুলিশ দফতরে ধরে আনার পর বেকার প্রথমে সবকিছুই অস্বীকার করছিল। আপনি বিচারক টাইলার স্ট্যানফোর্ডের হয়ে কাজ করছিলেন। কই ঐ নামে কাউকে চিনি বলে মনে করতে পারছি না তো? গোয়েন্দা অফিসার হাসেন, বেশ, আপনার স্মৃতিকে একটু উসকে দিই তাহলে? এই টাইলার স্ট্যানফোর্ড আপনাকে

প্যারোলে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার সেই উপকারের বিনিময়ে আপনি তার হয়ে কাজ করেছিলেন। নকল গোয়েন্দা ফ্রাঙ্ক টিমমনস সেজেছিলেন, মার্গো পসনারকে...। তারপর জুলিয়া স্ট্যানফোর্ডকে খুন করতে গিয়েছিলেন আপনি? বেকার অবাক চোখে তাকায় যেন রাজ্যের বিস্ময় তার দুচোখে। এসব আপনি কি বলছেন বলুন তো? কি বলছি? গোয়েন্দা অফিসার হাসেন আবার। কত বছরের জেলবাস পছন্দ আপনার বেকার? দশ না কুড়ি? আমি কিন্তু কেসটা এমনভাবে সাজাতে পারি, সাজাচ্ছি যে আপনার কুড়ি বছর জেলবাস কেউ ঠেকাতে পারবে না। না আপনি এরকম করতে পারেন না। আমার স্ত্রী...ছোট্ট ছোট্ট দুটো বাচ্চা...।

গোয়েন্দাটি মাথা নাড়েন, কেসটা আমি খুব হালকা ভাবে সাজাতে পারি। যাতে আপনার বিশেষ কোন সাজাই হবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে...। গোয়েন্দা অফিসার প্রখর চোখে তাকান। বেকার বলে, কি করতে...আমায় কি করতে হবে? কথা, আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে। গোয়েন্দা অফিসারের কথায় নাচার উঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকায় হ্যাল বেকার।

এই মুহূর্তে রেনকুইস্ট, রেনকুইস্ট অ্যান্ড ফিৎজেরাল্ডের অফিসের কনফারেন্স ঘরে মুখোমুখি বেকার এবং টাইলার। হ্যালোে বিচারপতি? কেমন আছেন? উডি প্রায় লাফিয়ে ওঠে, এই তো ফ্রাঙ্ক টিমমনস। স্টিভ মাথা নাড়ে, না উডরাও ইনি হচ্ছেন দাগী অপরাধী শ্রীযুক্ত হ্যাল বেকার। তারপর স্টিভ ফিরে তাকায় টাইলারের দিকে। এই হচ্ছে সেই লোক যাকে আপনি ব্যবহার করেছিলেন। আমাদের অফিসের তালা ভেঙ্গে আপনার বাবার উইলের ফটোকপি চুরি করেছিল। আপনার বাবার মৃতদেহ কবর খুঁড়ে চুরি করেছে ইনিই। নকল ফ্রাঙ্ক টিমমনস সাজিয়ে ছিলেন একে, জুলিয়াকে খুন করতেও একেই পাঠিয়েছিলেন আপনি। টাইলার ছিটকে ওঠে। ক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে বলে, আপনারা

পাগল হয়েছেন? একটা দাগী আসামী প্রতারক, ওর কথা বিশ্বাস করছেন? আমার বিরুদ্ধে ওর কথার কেউ দাম দেবে, কান দেবে? কাউকে কিছু শুনতে, কান দিতে হবে না। কথা বলবে বাস্তব। সত্যি। স্টিভ প্রত্যয়ী গলায় বলে। মানে? টাইলার যেন সময় নেয়। স্টিভ বলে, এই নোকটাকে আপনি আগে কখনো দেখেছেন? নিশ্চয়ই। আমার কোর্টে ওর বিচার হয়েছিল। ওর নাম কি? এ প্রশ্নে টাইলার থমকে যায়। বিছিয়ে রাখা ফাঁদটার গন্ধ টের পায়। নিজেকে সতর্ক করে, নাম? কত অপরাধী আসে আমার কোর্টে। সবার নাম কি মনে রাখা সম্ভব? তাছাড়া ঐ লোকটার অনেক নকল ছদ্মনাম আছে। স্টিভ সহানুভূতির মত মাথা নাড়ে, বেশ বিচারপতি, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। আপনার কোর্টে বিচারের সময় ওর নাম ছিলো বেকার। হ্যাল বেকার। টাইলার কপালে হাত দেয়, চুলকায়, চিন্তা করার ভঙ্গী করে। তারপর স্টিভের দিকে তাকিয়ে কিছুটা যেন অনন্যোপায় হয়েই (কারণ, অনেক সাক্ষী রয়েছে ওর কোর্টে। বিচার চলার সময় বহুবার অপরাধীকে নাম ধরে ডেকেছে। নাম জানে না একেবারেই, বলা অস্বীকার করার উপায় নেই) বলে, ইয়ে...মানে, হ্যাঁ মনে পড়েছে।

স্টিভ হাসে, মনে পড়েছে? বেশ, কিন্তু বেকার যখন বস্টনে আপনাদের বাড়ীতে এলো আপনি ওকে ফ্রাঙ্ক টিমমনস বলে কিভাবে, কেন, সবার সঙ্গে পরিচয় করালেন? টাইলার থতমত খেয়ে যায়, উত্তর খুঁজে পায় না এ প্রশ্নের। ইয়ে...মানে...আমি...ইয়ে...। স্টিভ মাথা নাড়ে, বেশ থাক। আপনি একে মুক্তি দিয়েছিলেন প্রমাণাভাবে বিতর্কিত সিদ্ধান্তে। তারপর একে আপনি ব্যবহার করলেন। মার্গো পসনারকে আসল জুলিয়া বলে প্রমাণিত করার কাজে। না, সেই ব্যাপারে আমি কিছু জানতামই না। মেয়েটি এখানে এসে পৌঁছবার আগে, কখনো কোনদিন দেখিইনি তাকে। স্টিভ ঘুরে তাকায় লেফটেন্যান্ট কেনেডির দিকে, লেফটেন্যান্ট আপনি শুনলেন তো? কেনেডি সায় দেবার ভঙ্গীতে মাথা

নাড়েন, হ্যাঁ শুনলাম। স্টিভ আবার ফিরে তাকায় টাইলারের দিকে হা, যা বলছিলাম। আপনি তাহলে মার্গো পসনারকে কোনদিন দেখেনইনি, সে বস্টনে এসে হাজির হওয়ার আগে। তাই তো বিচারপতি টাইলার? টাইলার মাথা হেলিয়ে সায় দেয়, হা। স্টিভ ঘরে হাজির সবার মুখের ওপর দিয়ে এক ঝলক নজর বুলোয়। তারপর টাইলারের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখে, অথচ আমরা খতিয়ে দেখেছি, প্রমাণ পেয়েছি যে আপনার কোর্টেই বিচার হয়েছিল মার্গো পসনারের। আপনি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ওকে প্যারোলে ছাড়িয়ে নিয়ে ছিলেন। অথচ আপনি বলছেন...। আরো একটা ব্যাপার, জেলা আদালতের অনুমতি নিয়ে শিকাগো পুলিশ একটা ওয়ারেন্ট বের করেছে, তল্লাসীর ওয়ারেন্ট। আপনার বাড়ী এবং ব্যাঙ্কের লকার, সব তল্লাসী করা হয়েছে। শিকাগোর একটা ব্যাঙ্কে, আপনার লকার থেকে পাওয়া গেছে। একটা কোর্ট পেপার। যাতে জুলিয়া স্ট্যানফোর্ড আপনাকে তার শেয়ার, সম্পত্তির অংশ হস্তান্তর করেছেন। আশ্চর্যের, ঐ কাগজে জুলিয়া যে তারিখে সই করেছেন, দেখা যাচ্ছে, সেটা তার বস্টনে পৌঁছাবার, যে তারিখে তিনি বস্টনে পৌঁছেছিলেন, তার পাঁচ দিন আগের তারিখ দিয়ে ঐ হস্তান্তর পত্রটি সই করা হয়েছে। এর কি ব্যাখ্যা আপনি দেবেন বিচারপতি স্ট্যানফোর্ড?

টাইলার কিছু বলার চেষ্টা করে। তারপর যেন কথা খুঁজে না পেয়ে নির্বাক চোখে তাকিয়ে থাকে স্টিভের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর দুহাতে মাথা চেপে ধরে। ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছের মত বসে পড়ে পাশের চেয়ারটায়। লেফটেন্যান্ট কেনেডি এগিয়ে আসেন, আইনের নামে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি বিচারপতি টাইলার। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। হতাশায় চূর্ণ-বিচুর্ণ এক ভেঙে পড়া মানুষ। তারই মধ্যে টাইলারের ঠোঁটের কোণায় ফুটে উঠল এক রহস্যময় হাসি। কেউ তা খেয়াল করল না। কি করে এদের হারিয়ে দিতে হয় তা সে জানে। শেষ হাসিটা সেই হাসবে। আমি কি একবার রোজ

হিলের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারি? জিনিসপত্র নিতে হবে কিছু। কেনেডি সায় দেন, হা নিশ্চয়ই। তবে আপনার সঙ্গে আমার দুজন অফিসার যাবেন। টাইলার শান্ত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ায়, দরজার দিকে হেঁটে চলে। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে আচমকা ঘুরে দাঁড়ায়, ঘৃণাঝরা আগুন বর্ষিত চোখে কয়েক পলক তাকায় জুলিয়ার দিকে। সেই দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে যায়, কেঁপে ওঠে জুলিয়া।

আধঘন্টা পর, দুজন পুলিশকর্মীকে নিয়ে রোজ হিলের বাড়ীতে ফিরে আসে। বাইরের একতলার বসবার ঘরে ঢুকে পুলিশকর্মী দুজনকে টাইলার বলে,–আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। আমি দোতলার ঘর থেকে সব নিয়ে আসছি। পুলিশকর্মী দুজনের একজন বলে, তাড়াতাড়ি করবেন, দেরী না হয়। টাইলার রহস্যময় হাসে। দু মিনিটের বেশি লাগবে না। পুলিশ দুজন তাকিয়ে দেখে টাইলার তার ঘরে ঢুকে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে টাইলার আলমারির দিকে এগিয়ে যায়। দেরাজ টেনে বার করে একটা গুলি ভরা রিভলবার। গুলির শব্দটা সারা বাড়ী কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনি তুলল, যার অনুরণন প্রতিধ্বনিত হয়েই চলল।

.

৩৫.

উডি আর বেনডাল ড্রয়িং রুমে বসেছিল। একদল সাদা পোশাকের লোক বাড়ীর সব জিনিসপত্র খুলে বার করে নিয়ে বিশাল বিশাল ট্রাকে তুলছে। বাড়ী থেকে এসব যাচ্ছে নিলামে বিক্রি হতে। একে একে সব, স্ট্যানফোর্ড নামের মোহর লাগা সব কিছুই দখল

হয়ে যাবে। বিক্রি হয়ে যাবে। একটা যুগের অবসান ঘটল। বেনডাল আনমনা গলায় বলে। অথবা, হয়ত শুরু, অন্য কিছুর। উডি হাসিমুখে বলে। তারপর যোগ্য করে, আমার এই ভাগ্য বদলের কথা জেনে, শুনতে পেয়ে, তার ভাগের অঙ্কটা জেনে, পেগির মুখের অবস্থাটা কেমন হবে? তারপর সে বোনের হাতটা নিজের মুঠোয় তুলে নেয়, তোমার কি খবর? মার্কের ব্যাপারে বলছি। সে মাথা নাড়ে, আঘাতটা কাটিয়ে ফোন করতে হবে। সে উঠে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলে। মিমিকে সব কিছু জানাতে হবে এখানকার খবর, সব কথা।

ফোনের অন্য প্রান্তে মিমির সাড়া পাওয়া মাত্র, কিছুটা ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে বলতে থাকে, মিমি, আমার মনে হয় আমাকে আবার পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যেতে হবে। আমি যে রকম ভেবেছিলাম, আশা করেছিলাম, এখানকার ব্যাপারটা সেরকম ঘটল না। পাশার দান সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। মিমি অন্য প্রান্ত থেকে বলে, উডি, উডি, তুমি ঠিক আছে তো? ভালো আছে তো? না, মিমি, এখানে অনেক-অনেক কিছু ঘটে গেছে। আমি শেষ হয়ে গেছি। একটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ওঠা নীরবতার পর মিমি বলে, উডি, তুমি কি হোব সাউন্ডে ফিরে আসছ? উডির নিরাশা জড়ানো হতাশ গলা ভেসে আসে, সত্যি বলতে কি, আমি নিজেই জানি না কি করব।– উডি? হ্যাঁ বলল। মিমির গলা নরম শোনায়, উডি, ফিরে এসো, প্লিজ, ফিরে এসো।

জুলিয়া আর স্টিভ বারান্দায় হাঁটছিলো, আমি দুঃখিত। ঘটনাটা এভাবে হঠাৎ ঘুরে যাবে, পট পরিবর্তন হবে কেউ ভাবেনি। তোমার টাকার কথাটা মানে না পাওয়ার...। জুলিয়া হাসে। ছাড়ো ওসব কথা। আমার একশো জন পাঁচতারা হোটেলের রাঁধুনীর প্রয়োজন নেই। আমি যা, আমার যতটুকু আছে, তাতেই আমার চলে যাবে বেশ। তোমার হতাশ

লাগছে না, তোমার এই বস্টনে আসা? এই সফরটা পুরো অনর্থক, বেকার সময় নষ্ট হলো অকাজে। জুলিয়া বড় বড় চোখে তাকায়। স্টিভের চোখে চোখ রেখে বলে, সত্যিই কি অনর্থ অকাজে সময় নষ্ট হলো সবটা, স্টিভ? ওরা কেউ বুঝল না, জানলা না, কে প্রথম এগিয়ে ছিল। পা বাড়ালো। কিন্তু একসময় দেখা গেল জুলিয়া স্টিভের বুকে মাথা রেখেছে, স্টিভ দুহাতে ওকে জড়িয়ে আছে। জুলিয়া প্রথমবার, প্রথম দিন যেদিন তোমায় দেখেছিলাম, আমার মনে তীব্র বাসনা ইচ্ছে হয়েছিল। প্রথম যেদিন দেখেছিলে, তুমি আমায় এ শহর ছেড়ে চলে যেতে বলে ভীষণ চাপ দিয়েছিলে। ওরা দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে। স্টিভ জুলিয়াকে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে ধরে, বিশ্বাস করো, কখনো আমি চাইনি। একবারের জন্যও চাইনি আমার চোখের সামনে থেকে তুমি চলে যাও, দূরে সরে যাও। ঠিক তখনি জুলিয়ার মনে পড়ে স্যালির প্রশ্নটি–পুরুষ কি করে প্রস্তাব দেয় তুমি জানোনা না? বুঝতে পারো না?: সে ফিস ফিস করে বলে, এটা কি প্রস্তাব? স্টিভ ওকে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে ধরে, বাজী রাখতে পারো। তুমি কি আমায় বিয়ে করবে?

উডি, বেনডাল, জুলিয়া আর স্টিভ বাইরের বসবার ঘরে বসেছিল। ওদের ঘিরে ব্যস্ততা। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চেয়ার, টেবিল, আলমারি, আয়না, সোফা, বিছানা। সব বরাবরের জন্য এ বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই কাজেই ব্যস্ত পরিবহন সংস্থার কর্মীরা। স্টিভ উডির দিকে তাকায়, আপনি তাহলে কি করবেন ঠিক করলেন? উডি মাথা নাড়ে, আমি আবার হোব সাউন্ডে ফিরে যাচ্ছি। ওখানে হারিয়ে ফেলা দিনগুলো আবার খুঁজব। পোলো খেলোয়াড় হিসাবে নতুন করে ভবিষ্যত তৈরি করার চেষ্টা করব। বেনডাল জুলিয়ার দিকে তাকায়, তুমি তাহলে কানসাস সিটিতে ফিরে যাচ্ছো? যখন আমি এক বালিকা ছিলাম, জুলিয়া ভাবে, আমি স্বপ্ন দেখতাম, এক স্বপ্নের রাজকুমার

আসবে, যে আমাকে কানসাস সিটির বাইরে বের করে নিয়ে যাবে। ও বেনডালের দিকে তাকিয়ে হাসে, না, আমি আর কানসাসে ফিরে যাচ্ছি না।

ওরা তাকিয়ে দেখে, পরিবহন সংস্থার কর্মীরা, হ্যারী স্ট্যানফোর্ডের বিশাল একটা প্রতিকৃতি, তৈলচিত্র খুলে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি কখনো ঐ ছবিটাকে পছন্দ করিনি। উডি বলে।